শ্রীগোপাল বসু মল্লিক-

ফেলোশিপ-প্রবন্ধ।

দ্বিতীয় খণ্ড

(হিন্দুদর্শন)

প্রথমাংশ।

মহামহোপাধ্যায়—

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-

বেদান্তবারিধি-

প্রণীত।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

৭৯।১, পদ্মপুকুর রোড্, ভবানীপুর,

কলিকাতা।

সন ১৩৩১—ফাল্গুন।

মূল্য—১।০ আনা মাত্র।

কলিকাতা ;

ডায়ানা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,

৬৮।৬, রসা রোড নর্থ, ভবানীপুর হইতে

শ্রীতারক চন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

প্রস্তাবনা।

স্বর্গীয় শ্রীগোপাল বসু মল্লিক মহোদয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে যে, বেদান্ত ফেলোশিপের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন; সেই কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া, আমি দ্বিতীয় বর্ষে হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে যে সমুদয় প্রবন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিলাম। অদ্য সেই সমুদয় প্রবন্ধ একত্র করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম। আশা করি, তৃতীয় বর্ষের প্রবন্ধ সকলও শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

এই খণ্ডের বিষয় হিন্দুদর্শন। হিন্দুদর্শন সাধারণতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত— ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা। তন্মধ্যে বিষয়গত সৌসাদৃশ্যানুসারে এই খণ্ডে কেবল ন্যায় ও বৈশেষিক, এই দুইখানিমাত্র দর্শনের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কেন না, দার্শনিক বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করিয়া গণনা করিলে উক্ত ছয়খানি দর্শনকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যেমন, ন্যায়—এক, গোতমকৃত ও কণাদকৃত। সাংখ্য—এক, কপিলকৃত ও পতঞ্জলিকৃত। মীমাংসা—এক, জৈমিনিকৃত ও বেদব্যাসকৃত।

এরূপ শ্রেণীবিভাগে শাস্ত্রার্থের কোন প্রকার ক্ষতি বা অসামঞ্জস্য ত হয়ই না, বরং সমধিক সামঞ্জস্যই পরিরক্ষিত হয়। কেন না, তিন ভাগে বিভক্ত দুই দুইটী দর্শনের মধ্যে প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রভেদ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, ন্যায় ও বৈশেষিক, উভয়েই পরমাণু-কারণবাদী, জীব, জগৎ ও পরমেশ্বর সম্বন্ধেও এক মতাবলম্বী; এবং পদার্থ-সংকলনেও উভয়েই প্রায় এক পথের পথিক; সুতরাং ঐ দুইটী দর্শনকে একজাতীয় দর্শন বলিলে দোষের কোনই কারণ দেখা

যায় না, সাংখ্য পাতঞ্জলের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ। উহারা উভয়েই প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ ও সত্যতাবাদী এবং অন্যান্য বিষয়েও প্রায় একমতাবলম্বী, কাজেই ঐ দুই শাস্ত্রকে একজাতীয় শাস্ত্র বলিতে কিছুমাত্র আপত্তি হইতে পারে না। তাহার পর দুইটী মীমাংসা দর্শন যে, একই জাতীয় শাস্ত্র, তাহা উহাদের 'মীমাংসা' নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা এই জাতীয় বিভাগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই খণ্ডমধ্যে কেবল ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের আলোচনা করিয়াছি। তৃতীয় খণ্ডে সাংখ্য, পাতঞ্জল ও মীমাংসা দর্শনের আলোচনা করিব।

আলোচ্য ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন, সাধারণতঃ তর্কপ্রধান শাস্ত্র। মীমাংসা দর্শন যেরূপ শ্রুতিবাক্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, ন্যায়-বৈশেষিক-দর্শন ঠিক সেরূপ নহে; উহারা উভয়েই প্রধানতঃ তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহাদের অভিমত পদার্থসমূহ পরিমার্জ্জিত তর্কের সাহায্যেই সংকলিত ও সমর্থিত হইয়াছে; আবশ্যকমতে স্থানবিশেষে শ্রুতিরও সহায়তামাত্র গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু কোথাও সম্পূর্ণভাবে শ্রুতির উপর নির্ভর করা হয় নাই; বরং তর্কের মর্য্যাদারক্ষার অনুরোধে স্থলবিশেষে শ্রুতির স্বাভাবিক অর্থও পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং কষ্ট-কল্পনার সাহায্যে অর্থান্তরও পরিকল্পিত হইয়াছে। তর্কপ্রধান শাস্ত্রের ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই এইরূপ।

তর্কপ্রধান শাস্ত্র স্বভাবতই জটিল হইয়া থাকে। জটিলতার কারণ দ্বিবিধ; এক—বিষয়ের গুরুত্ব; দ্বিতীয়—তর্কের দুর্ব্বলতা বা অপ্রতিষ্ঠিতত্ব। তন্মধ্যে বিষয়গত জটিলতার হেতু এই যে, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন যদিও জাগতিক সুপ্রসিদ্ধ পদার্থনিচয়ের খণ্ডন-মণ্ডন ব্যাপারেই সমধিক ব্যাপৃত হউক, তথাপি সেই সমুদয় পদার্থরাশির সংস্থাপন, বিশ্লেষণ বা নিরসন বিষয়ে যেরূপ অভিনব তর্কপ্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, বস্তুতই তাহা অন্যত্র দুর্লভ। নবোদ্ভাবিত সেই তর্কপ্রণালী আয়ত্ত করা অতি বড় তীক্ষ্ণধী ব্যক্তির

পক্ষেও আয়াসসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। এই নবোদ্ভাবিত তর্কপ্রণালীই উক্ত দর্শনদ্বয়কে সাধারণের নিকট চিরকাল অপরিচিত করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিবে।

সমাজে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার অভাবও উক্ত দর্শনদ্বয়ের জটিলতা সমধিক বৃদ্ধি করিয়াছে। নব্য ন্যায়ের প্রাদুর্ভাবে প্রাচীন ন্যায়ের পঠন-পাঠনা-পদ্ধতি একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহার ফলে, অনেকস্থলে মূলসূত্র ও প্রাচীন ব্যাখ্যার অনেক স্থানে অসামঞ্জস্য রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, এবং সূত্র ও ভাষ্যের পাঠও সকল স্থানে সহজে সংলগ্ন হয় না। এ দুরবস্থা বৈশেষিক দর্শনের সম্বন্ধে বড়ই শোচনীয় দশায় উপনীত হইয়াছে। পদে পদে উহার অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হয়। তাহার ফলে দুর্ব্বোধ্যতা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

জটিলতার দ্বিতীয় কারণ তর্কের দুর্ব্বলতা। তর্ক যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, সে কখনও কোন বিষয় সম্পূর্ণরূপে সংশয়-বিপর্য্যয়রহিত করিয়া লোক-সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে পারে না। কেন না, তর্কের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সম্পূর্ণ নির্ভর করে তৎপ্রয়োক্তা তার্কিকের যোগ্যতার উপরে। যে তার্কিক স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা যে পরিমাণে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন, তাঁহার উদ্ভাবিত তর্কও সেই পরিমাণেই গভীর, সুদৃঢ় ও অনুপেক্ষণীয় হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান তার্কিকগণের বুদ্ধিভাণ্ডার মাপ করিয়া যোগ্যতার তারতম্য নির্দ্ধারণ করিবার মানযন্ত্র অদ্যাপি কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই—সুদূর ভবিষ্যতেও হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং তর্কেরও অবসান হইবার আশা নাই। এইজন্যই অভিজ্ঞ লোকেরা বলিয়াছেন—

"যত্নেনাপাদিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে॥"

অর্থাৎ একজন অনুমানকুশল তার্কিক দৃঢ়যুক্তিদ্বারা যে বিষয় যেরূপ বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন, তদপেক্ষা অধিকতর তর্কনিপুণ ব্যক্তি আবার তর্কের সাহায্যেই সেই নির্দ্ধারিত বিষয়টী অন্যরূপ বলিয়া প্রমাণিত করেন। দিন দিন যতই নূতন নূতন তার্কিকের আবির্ভাব হইবে, তর্কের আকৃতি প্রকৃতিও ততই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুরাতন সিদ্ধান্তরাশিকে সুদূরে নিক্ষেপ করিবে। অথচ জগতের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমস্ত তার্কিকগণকে একই সময়ে এক স্থানে সংগ্রহ করিয়া যে, কোন তর্কের শেষ মীমাংসা করা, তাহা কল্পনারাজ্যেও সম্ভবপর হইবে না; সুতরাং তর্কেরও শেষ বা পরিসমাপ্তি কোন কালেই হইবে না। এই জন্যই তর্কপ্রধান শাস্ত্রগুলি কোন মতেই জটিলতার গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে না।

উল্লিখিত ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন তর্কপ্রধান হইলেও, তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের পক্ষে অনুপযোগী বা অনাদরের শাস্ত্র নহে; বরং সমধিক উপযোগী ও আদরের বস্তু। কারণ, কোনও দুর্ব্বিজ্ঞেয় তত্ত্বের মীমাংসায় উপস্থিত হইতে হইলে, পদে পদে তর্কেরই সহায়তা লইতে হয়। এই জন্য ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন মুনি ন্যায়দর্শনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা॥"

এখানে তর্কবিদ্যাকে সমস্ত ধর্ম্ম ও কর্ম্মবিজ্ঞানের পরম সহায় এবং সমস্ত শাস্ত্রার্থ-বোধের উপায়ভূত প্রদীপ বলিয়া যে যশোগান করিয়াছেন, এতদপেক্ষা অার অধিক প্রশংসা হইতে পারে কি? বাস্তবিকই, কোনও অবিজ্ঞাত তত্ত্বপথে অগ্রসর হইতে হইলে এই তর্কবিদ্যাই আলোক প্রদান করিয়া থাকে।

এখানে বলা আবশ্যক যে, তর্কপ্রধান এই দুইটী দর্শন কখনও অসার

শুষ্কতর্কের বা শুদ্ধ জড়তত্ত্ব-নির্দ্ধারণের জন্য সৃষ্ট হয় নাই; পরন্তু যে আত্ম-জ্ঞানের অভাবে বিশ্বমানবগণ নিরন্তর দুঃখধারা ভোগ করিয়া কাতরচিত্তে তদুচ্ছেদের উপায়বোধে যে-সে পথ অবলম্বন করিতেছে, সেই আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব বিজ্ঞাপিত করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। এই কারণেই পণ্ডিতগণ দর্শনশাস্ত্রকে মননশাস্ত্র নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেন না, দর্শন শাস্ত্রই প্রকৃত পক্ষে মননের উপযুক্ত উপকরণসমূহ প্রদান করিয়া থাকে। মনন অর্থ বিচার। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন—

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ॥"

একথার তাৎপর্য্য এই যে, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো-নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই শ্রুতিতে প্রথমে আত্মদর্শনের আদেশ করা হইয়াছে; পরে তদুপায়রূপে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ শ্রুতিবাক্য হইতে শ্রবণ, পরে তদ্বিষয়ে মনন অর্থাৎ শ্রুত বিষয়ে সম্ভাবিত শঙ্কা নিরাসার্থ বিচার করিবে; তাহার পর নিঃসংশয়চিত্তে সেই শ্রুতবিষয়ে নিদিধ্যাসন বা সমাধি করিবে; তবে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। এই যে, আত্মদর্শনের উপযোগী মনন, সেই মনন-প্রণালী বিজ্ঞাপিত করে বলিয়াই—কেবল ন্যায় ও বৈশেষিকই নহে, প্রচলিত ছয়খানি দর্শনই মনন শাস্ত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে; সুতরাং আত্ম-জ্ঞানোপযোগী তর্কই ষড়্দর্শনের মুখ্য লক্ষ্য; অসার শুষ্কতর্ক নহে। একথা আমরা প্রবন্ধের অপরাপর খণ্ডে বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

এই খণ্ডের প্রথমে ষড়্দর্শনের স্থূল মর্ম্মার্থ সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, এবং সেই প্রসঙ্গে ষড়্দর্শনের পৌর্ব্বাপর্য্য বা রচনাক্রমও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অধিকন্তু, আপাতজ্ঞানে ষড়্দর্শনের মধ্যে যে বিষম বিরোধ বা অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়, তাহারও সমাধানোপযোগী একটী

প্রকৃষ্ট পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশ্বাস যে, সেই পদ্ধতির অনুসরণ করিলে সহজেই দর্শন শাস্ত্রগুলির অবিরোধ বা একবাক্যতা সংস্থাপন করা যাইতে পারিবে। ভূমিকার পরেই প্রথমে ন্যায় দর্শনের, পরে বৈশেষিক দর্শনের বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে।

আলোচনার মধ্যে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের কেবল তাৎপর্য্যমাত্র সংগৃহীত হয় নাই; উভয় দর্শনেরই প্রতিপাদ্য প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রয়োজন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই যথাক্রমে সংকলিত হইয়াছে; এবং তৎসম্পর্কিত প্রায় সমস্ত সূত্রই যথাস্থানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে; অধিকন্তু বাঙ্গালাতে ব্যাখ্যা করায় সূত্রগুলি বুঝিবার পক্ষেও সুবিধা করা হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য উদ্ধৃত সূত্রগুলির সঙ্গে সঙ্গে অধ্যায়, আহ্নিক ও ক্রমিক সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। জিজ্ঞাসু পাঠকগণ ইচ্ছা করিলেই উহার সাহায্যে মূল গ্রন্থ দেখিবার ও প্রকৃত রহস্য বুঝিবার সুবিধা পাইবেন।

ইহা দ্বারা তাহাদের কিঞ্চিৎমাত্র উপকার ও তৃপ্তি হইলেই আমার পরিশ্রম সফল মনে করিব। কিমধিকমিতি।

ভবানীপুর;
ভাগবত চতুষ্পাঠী,
৭৯।১, পদ্মপুকুর রোড,
কলিকাতা।

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা।

বিষয়-সূচী।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।

বৈশেষিকদর্শন।

আলোচনা।

স্থূল জগতের উৎপত্তিক্রম।

	বিষয়।	পৃষ্ঠা।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

উপসংহার।

ফেলোশিপ প্রবন্ধ।

হিন্দুদর্শন।

অনন্ত রত্ননিলয় বিশাল বারিধিবক্ষে যেমন নিরন্তর অসংখ্য তরঙ্গমালা খেলিয়া বেড়ায়,—একটীর পর আর একটী আসিয়া দেখা দেয়, আবার মুহূর্ত্তমধ্যে কোথায় বিলীন হইয়া যায়, মানবের মানস মধ্যেও তেমনই নিরন্তর উত্থান-পতনশীল কত শত চিন্তার তরঙ্গ একবার উঠিতেছে, আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা বা পরিগণনা করা সম্ভব হয় না। যদিও, সেই চিন্তারাশি এতই আশুবিনাশী যে, একের সহিত অপরের সাক্ষাৎ বা সহাবস্থান কখনও ঘটে না; তথাপি—পর্ব্বতীয় নদীর ক্ষীণ পয়ঃ-প্রবাহ যেরূপ শত শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও, আপনার অভিমত পথে অব্যাহতগতিতে চলিতে থাকে, এবং ক্রমশঃ আপনার পথটী সমধিক সরল, সুগম ও প্রশস্ততর করিয়া তোলে, তদ্রূপ চিত্তগত চিন্তাপ্রবাহও, প্রথমে যতই ক্ষীণ হউক না কেন, সে যে পথ অবলম্বন করে, কিংবা আপনার প্রয়োজন-সিদ্ধির অনুকূল বলিয়া জানিতে পারে, ক্রমে সেই পথেই অগ্রসর হইতে থাকে, এবং সর্ব্বপ্রকার অন্তরায় অপনয়নপূর্ব্বক তাহারই বিস্তৃতি-বিধানে যত্ন করে। ইহাই বিশ্ববিধাতার সনাতন নিয়ম, এবং ইহাই জগতের অপরিবর্ত্তনশীল সার্ব্বজনীন পদ্ধতি। অধিকন্তু ইহাই দার্শনিক চিন্তা ও দর্শনশাস্ত্রাবির্ভাবের মূল ভিত্তি।

অন্য-দেশের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু এদেশের পুরাতত্ত্ব

পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে একদা এমনই মধুরতাময় একটী পবিত্র সময় আসিয়াছিল, যে সময় ভারতীয় মনীষিমণ্ডলের মানসাকাশ বৈদিক-ধর্ম্মময় শারদীয় শশধরের স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভায় নিত্য প্রকাশমান ছিল; কখনও তাহার বিপর্য্যয় বা অভাব উপস্থিত হইত না। সে সময় সংশয়-কুজ্ঝটিকার কালুষ্য ছিল না, বিতর্কবাত্যার বিষম আবর্ত্তে সৎপথ কলুষিত হইত না, বিতণ্ডাবাদরূপ মহামেঘের গভীর গর্জ্জনে শান্তশীল সাধুহৃদয় বিকম্পিত হইত না, ধর্ম্মবিপ্লবরূপ ভীষণ অশনি-সম্পাতেরও কোন আশঙ্কা ছিল না। পরম রমণীয় শান্তিপূর্ণ সেই স্মরণীয় যুগে ভারতের নর-নারী সকলেই, ধর্ম্মের আকর ও অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার বেদরূপ কল্পতরুর শীতল ছায়ায় আশ্রয় লইয়া শ্রান্তি দূর করিত, এবং নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া অভিমত ফললাভে পরিতুষ্ট ও কৃতার্থ হইত। তখন কাহারো প্রতি তর্কের কশাঘাতের প্রয়োজন হইত না; সুতরাং সে সময়ে জটিল দর্শনশাস্ত্র প্রণয়নেরও কিছুমাত্র আবশ্যক বা উপযোগিতা ছিল না। কিন্তু, দুর্নিবার কাল কাহারো মুখাপেক্ষা রাখে না, বা কাহারো সুখ দুঃখ বা শান্তির অপেক্ষা করে না; সে অব্যাহত-গতিতে আপনার গন্তব্য পথে চলিতে থাকে।

দর্শনশাস্ত্রের আবির্ভাব ও প্রয়োজন

সেই মহামহিম মহাকালের অমোঘ আবর্ত্তনে ভারতবাসীর সেই সুখের দিন ফুরাইয়া গেল, শান্তি-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; একে একে সনাতন ধর্ম্ম-সেতু বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল। তখন

ক্রমশঃ হৃদয় মধ্যে সংশয়ের সূচনা হইতে লাগিল; এবং অনেকে পুরাতন ধর্ম্মবিশ্বাসের কোমল জীর্ণ বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সংশয়ের সেবাতেই মনোনিবেশ করিল।—অচিরে সেই সূক্ষ্ম সংশয়-রেখাই ভীষণ জলদজালে পরিণত হইয়া ভারতে বিষম দুর্দ্দিনের সঞ্চার করিয়া তুলিল।

ক্রমে শান্তশীল সাধু-হৃদয়ও সংসর্গ-দোষে কুতর্ক-কালিমা-স্পর্শে মলিন হইতে মলিনতর হইতে লাগিল। বিতণ্ডাবাদরূপ ঝটিকাসম্পাতে নিত্য নূতন নাস্তিকতা আনয়ন করত চিরপরিচিত সত্য ও সরল ধর্ম্মপথ সমুদয় পঙ্কিল ও দুর্গম করিয়া তুলিল, এবং খরতর বেগে দেহাত্মবুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের আশ্রয়ভূমি বেদ-তরুর শাখাসমূহও ছিন্ন ভিন্ন ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। বেদ তখন হতশ্রী ও কাণ্ডমাত্রসার হইয়া রহিল। এতদবস্থায় প্রশান্তচিত্ত ঋষিগণের হৃদয় নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; তাঁহারা উপস্থিত বিপদের উপযুক্ত প্রতীকার-পথ দেখিতে লাগিলেন;—দুষ্টমতি নাস্তিক-নিরাশের অমোঘ অস্ত্র দর্শনশাস্ত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে গোতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি ও বেদব্যাস প্রভৃতি মহামতি মহর্ষিগণ নাস্তিক্য-নিরাশে বদ্ধপরিকর হইয়া, অধ্যাত্মজগতের প্রদীপস্বরূপ ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা (বেদান্ত), এই ছয়খানি বেদানুমোদিত দর্শন প্রণয়ন করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্থাপন করিলেন।

উপরে যে, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি ছয়খানি দর্শনের নাম

করা হইল,ঐ সকল দর্শনকে 'আস্তিক দর্শন' বলা হইয়া থাকে (১); কারণ, উহার প্রত্যেক দর্শনেই দেহাতিরিক্ত পারলৌকিক নিত্য আত্মার সদ্ভাব এবং শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগ সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছে। আস্তিক-দর্শনের ন্যায় নাস্তিকদিগেরও আর ছয়খানা দর্শন আছে। অবসরমত সে সমুদয়ের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

দর্শনশাস্ত্রের সংখ্যা ও বিভাগ

মহামতি মাধবাচার্য্য তদীয় 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ' নামক গ্রন্থে আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন লইয়া মোট সতেরটী দর্শনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই সকল দর্শনের বিশেষ বিশেষ প্রতি-পাদ্য বিষয়ও সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, সে সকলের মধ্যে কয়েকটী দর্শনের মতবাদ ও বিষয়ের গুরুত্ব এতই কম যে, আলোচ্য ন্যায় বৈশেষিকাদি দর্শনের সহিত উহাদের পরিগণনা না করিলেই উত্তম বলিয়া মনে হয়। এইজন্য আমরা এখানে সে সকলের নাম নির্দ্দেশে ও আলোচনায় বিরত রহিলাম।

(১) আস্তিক ও নাস্তিক শব্দের যথার্থ অর্থ এইরূপ—যাহারা মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব এবং জন্ম ও তদুপযুক্ত ভোগভূমি স্বীকার করে, তাহারা আস্তিক, আর যাহারা তাহা স্বীকার করে না; এখানেই কর্ম্মভোগ শেষ হয়, তাহার জন্য আর পরজন্মের আবশ্যক হয় না, বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহারা নাস্তিক। নাস্তিকেরা পরলোক মানে না; সুতরাং পারলৌকিক ফলোপদেশক বেদকেও আদর করে না। এইজন্য 'নাস্তিকা বেদ-নিন্দকাঃ' কথার সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রতিপাদ্য বিষয়ানুসারে বিভাগ কল্পনা করিতে হইলে, উপরি উক্ত প্রধান দর্শনগুলি নামতঃ ছয়প্রকার হইলেও, বস্তুতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার যোগ্য। যেমন—১। ন্যায়, ২। সাংখ্য, ৩। মীমাংসা। তন্মধ্যে ন্যায়দর্শন দুই প্রকার—এক গোতমকৃত, অপর কণাদকৃত। সাংখ্যদর্শন দুই প্রকার—এক কপিলকৃত, অপর পতঞ্জলিকৃত। মীমাংসাদর্শনও দুই প্রকার—এক জৈমিনিকৃত, অপর বেদব্যাসকৃত। এইরূপে দর্শনের সমষ্টিসংখ্যা ছয়। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে অংশবিশেষে বিপ্রতিপত্তি থাকিলেও, প্রধানাংশে বড় বিশেষ বৈমত্য নাই; বরং যথেষ্ট ঐক্যই রহিয়াছে—উক্ত উভয় দর্শনই তর্কপ্রধান ও পরমাণুবাদী। কপিলকৃত সাঙ্খ্যদর্শন ও পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শন সম্বন্ধেও ঐ কথা। উভয়েই প্রকৃতি ও পুরুষ প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছেন। তাহার পর, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসার (বেদান্তদর্শনের) মধ্যে যে, কতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা উহাদের নামাংশ 'পূর্ব্ব' ও 'উত্তর' শব্দ হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। মনে হয়, একই দর্শনের দুইটা ভাগ,—একটী 'পূর্ব্ব', অপরটী 'উত্তর'। আচার্য্য রামানুজস্বামী স্বীয় 'শ্রীভাষ্য' মধ্যে, কর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা, এই দুইটী দর্শনকে একই মীমাংসা শাস্ত্রের পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন; সুতরাং উক্ত ষড়্দর্শনকে তিনভাগে বিভক্ত করিলে,

ষড়্দর্শনের শ্রেণীত্রয়

বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। এইরূপ বিভাগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শাস্ত্রকারগণ 'সমানতন্ত্র-সিদ্ধান্ত' নামে একটা সিদ্ধান্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন (১)।

প্রকারন্তরে উক্ত ষড়্‌দর্শন আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—এক শ্রৌত দর্শন, অপর স্মার্ত্ত দর্শন। তন্মধ্যে যে সমুদয় দর্শন প্রধানতঃ শ্রুতি ও শ্রৌত পদার্থ নিরূপণের নিমিত্ত নির্ম্মিত, এবং শ্রুতি-প্রমাণের উপর সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত, সেই সকল দর্শন শ্রৌত দর্শন; আর তদ্ভিন্ন যে সমুদয় দর্শন কেবল শ্রুত্যর্থ স্মরণপূর্ব্বক স্ব স্ব বুদ্ধি-পরিকল্পিত তত্ত্ব-নিরূপণার্থে নির্ম্মিত এবং প্রধানতঃ লৌকিক যুক্তি তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই সমুদয় দর্শন স্মার্ত্ত দর্শন নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। এতদনুসারে পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা, এই দুইটী দর্শন

(১) সিদ্ধান্ত তিন প্রকার ১। স্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত, ২। প্রতিতন্ত্র-সিদ্ধান্ত, ৩। সমানতন্ত্র-সিদ্ধান্ত। তন্মধ্যে স্বশাস্ত্রগত যে সিদ্ধান্ত, তাহা স্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। বিরোধী শাস্ত্রোক্ত যে সিদ্ধান্ত, তাহা প্রতিতন্ত্র-সিদ্ধান্ত; আর সমান শাস্ত্রোক্ত যে সিদ্ধান্ত, তাহা সমান তন্ত্রসিদ্ধান্ত।

ন্যায় ও বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল, এবং কর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা, ইহারা পরস্পর সমানতন্ত্ররূপে পরিগণিত। এই কারণে ন্যায়দর্শনে যে কথা নাই, অথচ বৈশেষিক দর্শনে আছে; ন্যায়দর্শনে স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপাদিত কোন বিষয়ের সহিত বিরুদ্ধ না হইলে, বৈশেষিকোক্ত সেই কথাটী ন্যায়দর্শনেও স্বীকৃত বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। অন্যান্য দর্শন সম্বন্ধেও এই নিয়ম। এই বিষয়টী ন্যায়দর্শনে বিচারিত হইয়াছে।

প্রথমোক্ত শ্রৌত-দর্শনরূপে, আর ন্যায় বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনগুলি স্মার্ত্ত দর্শনরূপে পরিগণিত হইতে পারে। কারণ, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা, এই দর্শনদ্বয় প্রধানতঃ শ্রুতিবাক্যেরই মীমাংসায় প্রযুক্ত; সুতরাং শ্রুতির উপরই প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু ন্যায় বৈশেষিকাদি দর্শনগুলি সেরূপ নহে; পরন্তু নির্দ্দোষ তর্কযুক্তির সাহায্যে অভিমত তত্ত্বনিরূপণে ব্যগ্র; কেবল শাস্ত্রার্থের দৃঢ়তা সম্পাদনের সহায় বা অনুকূলরূপে শ্রুতিবাক্যও উহাতে পরিগৃহীত হইয়া থাকে মাত্র। স্বয়ং ভগবান্ বেদব্যাসও বেদান্তদর্শনের স্থানে স্থানে ঐ জাতীয় দর্শন সমূহকে 'স্মৃতি' ও 'স্মার্ত্ত' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

অতঃপর হিন্দুদর্শনের মৌলিকতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, উক্ত দর্শনশাস্ত্রসমূহ গোতম প্রভৃতি ঋষিবৃন্দের অসীম প্রতিভার পরিচায়ক হইলেও, বস্তুতঃ তাঁহাদের প্রতিভাপ্রসূত অভিনব কল্পনামাত্র নহে। ঐ সকল দার্শনিক তত্ত্ব ও তাহার আলোচনাপদ্ধতি এ দেশের অতি পুরাতন সম্পত্তি। গোতমাদি ঋষিবৃন্দের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে—স্মরণাতীত যুগেও ব্রহ্ম, জীব, জগৎ, বন্ধ, মোক্ষ ও জন্মান্তরবিষয়ক দর্শনোচিত চিন্তা যে, এ দেশের সুধীসমাজে সমাদৃত ও প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। বেদেই আমরা সর্ব্বপ্রথমে দার্শনিক চিন্তার সহিত পরিচিত হই। বৈদিক উপনিষদভাগের প্রায়

হিন্দু দর্শনের মৌলিকতা।

সর্ব্বত্রই দার্শনিকতা বিত্তমান রহিয়াছে ; সংহিতাভাগেও ইহার অভাব নাই ; তবে পরিমাণে অল্প ও নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে মাত্র। (১)

সময় ও সমাজের তাৎকালিক অবস্থানুসারে ধ্রুব সত্য সেই তত্ত্বগুলিকে কর্কশ তর্ক পাষাণে অকারণ নিঘর্ষণ করা আবশ্যক ছিল না ; তাই সেকালে, আধুনিক পরীক্ষাপ্রণালী অনুসৃত হয় নাই। পরে সমাজ যখন প্রবল সংশয়বাদের লীলাক্ষেত্র হইয়া পড়িল, এবং ব্রহ্মবিত্তার প্রশস্ত পথ যখন ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইতে লাগিল ; তখন লোকহিতৈষী ঋষিগণ— স্বর্ণকার যেমন পুরাতন স্বর্ণালঙ্কারগুলি প্রথমে একত্রিত করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে, পরে আবার অগ্নিসংযোগের সাহায্যে সেই পুরাতন সোণায় নূতন অলঙ্কার নির্ম্মাণ করে ; ঠিক তেমনি ঋষিগণ বৈদিক চিন্তাগুলিকেই নানা ছাঁচে ঢালিয়া অপূর্ব্ব ছয়খানি দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একই মূলদেশ হইতে নিঃসৃত পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীসমূহ যেরূপ বিভিন্ন প্রদেশের ভিতর দিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রস্থিত হইয়াও কেহই মহাসমুদ্রে সম্মেলনের কথা বিস্মৃত হয় না, ঠিক সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত হিন্দু-দর্শনগুলিও একই বেদ হইতে বহির্গত হইয়া এবং পরস্পর বিরোধী নানাপথে প্রসৃত হইয়াও, দুঃখনিবৃত্তি ও তন্নিদান ব্রহ্ম-বিদ্যারূপ চরম লক্ষ্য হইতে কেহই বিচ্যুত হয় নাই ;

(১) ইহার উদাহরণরূপে ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি উপনিষদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সকলেই সমভাবে সেই একই লক্ষ্য স্থানে যাইয়া বিশ্রাম লাভ করিয়াছে"।

অতঃপর হিন্দু-দর্শনসমূহের মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক হইতেছে। কিন্তু আবশ্যক হইলেও, এ কার্য্য এত কঠিন, এতই দুর্ব্বোধ এবং এতই নিবিড় তিমিরাবৃত যে, আমাদের ক্ষীণতর জ্ঞানালোক সে তিমিররাশি নিরসনপূর্ব্বক তত্ত্ব-নির্দ্ধারণে অক্ষম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেখিতে পাওয়া যায়—প্রায় প্রত্যেক দর্শনই প্রত্যেক দর্শনের স্পষ্টতঃ নামোল্লেখ না করিলেও, তদুক্ত বিষয়বিশেষের খণ্ডন-মণ্ডন দ্বারা নিজ নিজ সিদ্ধান্ত সংস্থাপনে যত্নপর হইয়াছেন। সাংখ্যদর্শনকার কপিল ত স্পষ্টাক্ষরেই "ন বয়ং ষট্‌পদার্থবাদিনো বৈশেষিকাদিবৎ।" বলিয়া বৈশেষিকের নাম ও তৎপ্রতিপাদ্য ষট্‌পদার্থের পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রকার প্রায় সকল দর্শনই সকল দর্শনের উপর অল্পাধিক পরিমাণে কটাক্ষপাত করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই; কাজেই বলিতে হয় যে, দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে কোনটী অগ্রে, কোনটী পশ্চাৎ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়িতরূপে নির্ণয় করা একপ্রকার অসম্ভব। তবে প্রকৃত কথা এই যে, প্রচলৎ ষড়্‌দর্শনের সিদ্ধান্ত বা মতবাদগুলি যে অতি পুরাতন—স্মরণাতীত কাল হইতেই যে, ঐ সমুদয় সিদ্ধান্ত বা মতবাদ এদেশে সুধীসমাজে সমাদৃত বা উপেক্ষিতরূপে বিদ্যমান ছিল, উপনিষদই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

দর্শনসমূহের পৌর্ব্বাপর্য্য

সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদের যে স্থানে সৎস্বরূপ ব্রহ্মের সর্ব্বকারণতা নিরূপণোদ্দেশে "সদ্‌এব সোম্যেদম্ অগ্র আসীৎ" বলা হইয়াছে, ঠিক তাহার পাশেই নাস্তিকমত খণ্ডনোদ্দেশ্যে "তদ্ধৈক আহুঃ—অসদেব ইদম্ অগ্র আসীৎ" এইরূপ অসৎ-কারণতাবাদ—যাহা পরে বৌদ্ধসম্প্রাদায়ে সিদ্ধান্তরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। অবশ্য, শ্রুতি কখনই ঐরূপ অসৎ-কারণতা-বাদ গ্রহণ করেন নাই, বরং ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছেন 'কুতঃ খলু সোম্যৈতৎ সম্ভবতি ? সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র-আসীৎ" ইত্যাদি। বৌদ্ধ-সমাজাদৃত উক্ত অসৎ-কারণতাবাদের খণ্ডনোদ্দেশ্যে ঐ উপনিষদ্‌ই বিবিধ যুক্তিরও অবতারণা করিয়াছেন। সে সমুদয় যুক্তি সংক্ষিপ্ত হইলেও, খুব সারগর্ভ ও বিচারসহ।

ইহা হইতেও বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, দার্শনিক চিন্তা এ দেশের অতি প্রাচীন। প্রকৃতপক্ষে বেদ—উপনিষদ্‌ই উহার মূল ভিত্তি। সেই পুরাতন চিন্তাপদ্ধতিতেই পরবর্ত্তী মনীষিগণ দেশ কাল ও অবস্থাভেদে এবং সমাজের অধিকারানুসারে স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া 'অরুন্ধতিদর্শন' ন্যায়ে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম তত্ত্ব বিবৃত করিয়া বহিরাসক্ত লোকদিগকে আত্মদর্শনে সমুন্মুখ করিয়াছিলেন। এতদনুসারে, গোতম-কৃত ন্যায়দর্শনকে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, আর বেদব্যাসকৃত বেদান্ত-দর্শনকে সর্ব্বকনিষ্ঠ বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। ইতিহাস এ বিষয়ে নীরব থাকিলেও, পদার্থ-সংকলনের

প্রণালী দৃষ্টে এই প্রকার পৌর্ব্বাপর্য্যই সঙ্গত বলিয়া অনুমিত হয়। (১)

---

(১) বিবেকজ্ঞানের সুবিধার জন্যই, দর্শনশাস্ত্রে পদার্থ-সংকলন করা আবশ্যক হয়। কারণ, জাগতিক অনন্ত পদার্থের এক একটী করিয়া তত্ত্ব-বিজ্ঞান বা পরিচয় জানা কোন জীবের পক্ষেই সম্ভবপর হয় না। তাই তাঁহারা জাগতিক পদার্থগুলির এক একটা শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। সমাজের বুদ্ধি-বিকাশ ও প্রতিভা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই সমুদয় শ্রেণী-বিভাগেরও বিস্তার কমিয়া যায়; তখন অল্পসংখ্যক সূক্ষ্ম বিভাগের দ্বারাই কাজ চলিতে পারে, বুঝিয়া লোকে সেই সূক্ষ্ম বিভাগ ধরিয়াই তত্ত্বনিরূপণে প্রবৃত্ত হয়। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণের ব্যবস্থা দেখিলেও, ইহাই বুঝা যায়। এতদনুসারে বিচার করিলে বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে, গোতম সকলের প্রথম, কণাদ দ্বিতীয়, কপিল তৃতীয়, পতঞ্জলি চতুর্থ, জৈমিনি পঞ্চম, এবং বেদব্যাস সর্ব্ব কনিষ্ঠ ষষ্ঠ দার্শনিক। কারণ—

গোতম ষোড়শ পদার্থ দ্বারা যে কাজ করিয়াছেন, কণাদ সেখানে ছয়টী মাত্র পদার্থ দ্বারাই সে কাজ সারিয়াছেন। আবার কণাদ ছয়টী পদার্থ দ্বারা যাহা করিয়াছেন, কপিল কেবল প্রকৃতি ও পুরুষ, এই দুইটী মাত্র পদার্থ দ্বারাই তাহা সম্পন্ন করিলেন। পতঞ্জলি কেবল কপিলের অনুক্তাংশ-মাত্র পরিপূর্ণ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার ও কপিলের মধ্যে বড় কিছু প্রভেদ নাই। তাহার পর জৈমিনি মুনি প্রধানতঃ কর্ম্ম ও অদৃষ্ট সম্বন্ধেই বিচার করিয়াছেন, পদার্থ সংকলনে তিনি আদৌ মনোযোগ দেন নাই; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। সর্ব্বশেষে বেদান্তদর্শনপ্রণেতা বেদব্যাসের কথা। গোতম প্রভৃতি যেখানে ষোড়শ, ছয় ও দুইটী পর্য্যন্ত পদার্থ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, বেদব্যাস সেখানে একমাত্র ব্রহ্ম পদার্থ দ্বারাই সমস্ত সমাধা করিয়াছেন।

এইরূপ পদার্থ সংকলনের সংক্ষেপ-বিস্তার অনুসারে চিন্তা করিলেও গোতমকৃত ন্যায় দর্শনের প্রথমত্ব ও ব্যাসকৃত বেদান্ত দর্শনের কনিষ্ঠত্ব সহজেই প্রতিপন্ন হয়।

মনে হয়—যে সময় দেশে নাস্তিকতার চরম ফল—দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া লোকের হৃদয় হইতে পরলোক-চিন্তা একেবারে বিদূরিত করিবার উপক্রম করিতেছিল, এবং অধিকাংশ লোকই ইহকাল-সর্ব্বস্ব হইয়া "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" "ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ" ইত্যাদি নাস্তিকমতের মহামন্ত্র জপে আস্থাবান্ হইয়া পড়িতেছিল, তখন মহর্ষি গোতমের সকরুণ হৃদয় সমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল।

পৌর্ব্বাপর্য্যের উপযোগিতা। ১। গোতম

তিনি বুঝিয়াছিলেন, এ সময়ে দুর্ব্বিজ্ঞেয় সূক্ষ্ম ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশে সমাজের কোন উপকার হইবে না, বরং সমাজের অবস্থানুসারে তাহাতে বিপরীত ফলেরই সম্ভাবনা অধিক। সুচিকিৎসক যেমন রোগ ও রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করেন, তেমনি তিনিও তাৎকালিক সমাজের মতিগতি ও প্রবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, প্রথমেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ না করিয়া, সর্ব্বানর্থের নিদানভূত দেহাত্মবুদ্ধি-নিরাশেই সমধিক যত্নবান্ হইলেন এবং তদনুকূল দৃঢ়তর তর্কযুক্তি সংকলনে আপনার শক্তি নিয়োজিত করিলেন।

তিনি যুক্তি দ্বারা বুঝাইলেন যে, দেহ, প্রাণ, মন বা ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অচেতন জড়পদার্থ কখনই আত্মা নহে; উহারা আত্মার ভোগ-সাধনমাত্র। প্রকৃত আত্মা হইতেছে—দেহাদির অতীত নিত্য চৈতন্যসম্পন্ন। সেই নিত্য আত্মাই কর্ত্তা, ভোক্তা, সুখ-

দুঃখভোগী ও ইহলোক-পরলোকগামী, এবং দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু দেহনাশেও তাহার নাশ হয় না; কারণ, দেহ অনিত্য, আর উহা নিত্য। এখানে তিনি দেহাত্মবাদীকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য, তাহাদের অভিমত আত্মগত কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ও সুখ দুঃখাদি সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া প্রধানতঃ দেহাত্মবাদমাত্র খণ্ডন করিয়াই আপনার কর্ত্তব্য সমাপন করিলেন। তাহার পর, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণের সাহায্যে বিপক্ষ-পক্ষ খণ্ডন করিয়া স্বাভিমত সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সংস্থাপন করিলেন।

তাহার পর মহামুনি কণাদের কথা। তিনি দেখিলেন, মহর্ষি গোতমের প্রবর্ত্তিত সিদ্ধান্তানুসারে লোকের দেহাত্মবুদ্ধি কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইলেও, নাস্তিক-সম্মত স্বভাব-কারণতাবাদ এখনও অখণ্ডিতই রহিয়াছে। তাহা খণ্ডন করাও একান্ত আবশ্যক; তাই তিনি গোতমের অনুক্তাংশ-পরিপূরণ ব্যপদেশে পরমাণুকারণবাদ সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়া বৈশেষিক দর্শন প্রণয়ন করিলেন। বৈশেষিক দর্শনের অপর নাম 'ঔলূক্য দর্শন'। ইহা দ্বারা কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মহাভারতোক্ত উলূকনামক ঋষি ও কণাদ একই ব্যক্তি। ইহা হইতে বৈশেষিকের প্রাচীনতা সিদ্ধ হয়।

২। কণাদ

কণাদ ঋষি প্রমাণ করিলেন যে, স্বভাব কখনই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎ-সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না; কেননা, স্বভাব নিজে অচেতন জড় পদার্থ; সে কখনই ভাল মন্দ বিচারে সমর্থ নহে;

সুতরাং দেশকালাদি নিমিত্ত নির্বিবশেষে সর্ব্বদা একাকার কার্য্য করাই তাহার পক্ষে সম্ভব, বৈচিত্র্যসৃষ্টি কখনই সম্ভব হইতে পারে না। অতএব বুঝিতে হইবে, জীবের অদৃষ্টানুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছাবশে অচেতন পরমাণু হইতেই বিচিত্র জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে প্রায় সম্পূর্ণরূপে মহর্ষি গোতমের মতেই সম্মতি দান করিয়া কণাদ ঋষি নিবৃত্ত হইলেন।

৩। কপিল

অতঃপর মহর্ষি কপিলের কথা। তিনি দেখিলেন—মহর্ষি গোতম ও কণাদকৃত ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের প্রচারের ফলে লোকের হৃদয় হইতে নাস্তিকতা ও দেহাত্মবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছে, এবং অধ্যাত্ম-চিন্তার প্রতিও লোকের সমধিক আগ্রহ উৎপন্ন হইয়াছে। তখন তিনি সময় ও সুযোগ বুঝিয়া আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন—বিবেক-জ্ঞানোপযোগী কৃত আত্মতত্ত্বোপদেশে মনোযোগী হইলেন।

তিনি স্বপ্রণীত সাংখ্যদর্শনে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, ন্যায় ও বৈশেষিক প্রদর্শিত নিত্য আত্মা যে, দেহেন্দ্রিয়াদির অতীত ইহ-পরলোকগামী এবং অখণ্ড অনন্ত ও দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন, এ কথা সত্য; কিন্তু আত্মাকে যে, কর্ত্তৃত্ব বা সুখ দুঃখাদিসম্বন্ধ ও চৈতন্যসম্পন্ন বলা হইয়াছে, সে কথা সত্য নহে; পরন্তু আত্মা নিত্যচৈতন্যস্বরূপ, উদাসীন ও অক্রিয়। কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্মগুলি প্রকৃতিসম্ভূত বুদ্ধির স্বাভাবিক গুণ; কেবল অজ্ঞান বা অবিবেক বশতঃ, আত্মাতে প্রতিফলিত হয়, এবং ঐ সমুদয়

বুদ্ধিধর্ম্মকেই আত্মধর্ম্ম বলিয়া লোকের ভ্রান্তি হইয়া থাকে। এই অবিবেকই জীবের সর্ব্বপ্রকার অনর্থের নিদান। আর প্রকৃতি বা বুদ্ধি হইতে আত্মার বিবেক বা পার্থক্যোপলব্ধিই উক্ত ভ্রান্তিনিরসনের একমাত্র উপায়।

উপরে যে, প্রকৃতির কথা বলা হইল, উহা ত্রিগুণাত্মিকা পরিণামস্বভাবা ও জড় পদার্থ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয়ের অতিরিক্ত প্রকৃতির কোন স্বরূপ নাই; পরন্তু ঐ গুণত্রয়ই প্রকৃতি নামে পরিচিত, এবং জগতের উপাদান; কিন্তু ন্যায় বা বৈশেষিক-সম্মত পরমাণু জগতের উপাদান কারণ নহে। পরমাণু সমূহ সাংখ্যোক্ত তন্মাত্রস্থানীয় অনিত্য জন্য পদার্থ; সুতরাং উহারা জগতের মূল কারণ হইতে পারে না। কণাদ ঋষি নাস্তিকবাদ-বিমোহিত মানব সমাজকে কতকটা সন্তুষ্ট রাখিবার উদ্দেশ্যে পরমাণুকারণবাদ গ্রহণ ও ঈশ্বর প্রতিষেধ প্রভৃতি অসত্য সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন; কেন না, তাহা না করিয়া কেবল নাস্তিকতার বিরোধী উপদেশ মাত্র প্রদান করিলে, বিবেকজ্ঞানের একান্ত উপযোগী দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব ও জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি আবশ্যক বিষয়গুলিও তৎকালে কেহ গ্রহণ করিত না; সুতরাং গোতম ও কণাদকে ঐ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াই নিবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। তাহার পর, কপিল দেব, মানব সমাজকে আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর করিবার উদ্দেশ্যে আরও কতিপয় অভিনব বিষয়—যাহা সাধারণ লোকের অবিজ্ঞাত ছিল, তাহা বুঝাইয়া অবসর গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর মহামুনি পতঞ্জলির কথা। তিনি দেখিলেন—মহর্ষি কপিলের প্রবর্ত্তিত সিদ্ধান্তে এখন কাহারো সংশয় বা বিপ্রতিপত্তি নাই। সকলেই তাঁহার সিদ্ধান্ত শিরোধার্য্য করিয়া অবিচলিতচিত্তে তদনুরূপ জ্ঞানানুশীলনের ফলে অধ্যাত্মপথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে ; কিন্তু এখনও বিবেকজ্ঞানোপযোগী যোগমার্গ তাহাদের অবিজ্ঞাতই রহিয়াছে। অতএব কপিলের অনুক্তাংশ পরিপূরণ ও দুরুক্তাংশ বিশোধনের ইহাই উপযুক্ত সময়। এইরূপ মনে করিয়া প্রথমেই তিনি বিবেকজ্ঞানোপযোগী যোগপথ অতি বিশদ ও সহজভাবে বুঝাইয়া দিলেন, এবং যোগসিদ্ধির অন্যতম উপায়রূপে ঈশ্বরের অবতারণা করিলেন। তখনও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের উপযুক্ত সময় হয় নাই, বিবেচনা করিয়া, ঈশ্বরকে তিনি জীব-সুলভ ক্লেশ-কর্ম্মাদি দোষশূন্য পুরুষবিশেষমাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, এবং তাঁহার উপাসনার দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন (১)। তদনুসারে তিনি বিস্তৃতভাবে ক্রিয়াযোগ, জ্ঞানযোগ, যোগফল নিরূপণ করিয়া আপনার অভিমত যোগদর্শন সমাপ্ত করিলেন।

পতঞ্জলি

---

(১) পতঞ্জলির মতে ঈশ্বরে ও জীবে একমাত্র প্রভেদ যে, জীব অনাদি কাল হইতে ক্লেশ, কর্ম্ম, কর্ম্মফল ও কর্ম্মাশয়ের সহিত সংসৃষ্ট, কিন্তু ঈশ্বর কখনও ঐ সকল দোষে সংস্পৃষ্ট নহে। জীবগণকে সাধনা দ্বারা ঐ সকল দোষ দূর করিয়া মুক্ত হইতে হয়, কিন্তু নিত্য নির্দ্দোষ ঈশ্বর সদাই মুক্ত। ক্লেশ পাঁচপ্রকার—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। কর্ম্ম দুই প্রকার—শুভ ও অশুভ। বিপাক—কর্ম্মের ফল। আশয় অর্থ জ্ঞান ও কর্ম্মের সংস্কার। ঈশ্বরে ইহার একটীও নাই।

এই প্রকারে যখন ন্যায়াদি দর্শনের প্রচার-বাহুল্যে, দেশের সর্ব্বত্র নাস্তিকতার খরস্রোত ক্রমশঃ মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল, শনৈঃ শনৈঃ জন্মান্তরবাদ ও পরলোক-চিন্তা আসিয়া লোকের হৃদয়দেশ অধিকার করিয়া বসিল; দেহাত্ম-ভ্রান্তির মোহান্ধকার সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইল, এবং পরতত্ত্ব বা ব্রহ্মস্বরূপ জানিবার জন্য সমাজের আগ্রহাতিশয় পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল, তখনই মহামুনি জৈমিনি পূর্ব্বমীমাংসা প্রণয়নে মনোযোগী হইলেন।

মীমাংসামাত্রই সংশয়-সাপেক্ষ; যেখানে সংশয়, সেখানেই মীমাংসার প্রয়োজন; সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ অলৌকিক অপরাপর বিষয়ে বিশ্বস্ত থাকিলেও বেদের স্বতঃ প্রামাণ্য সম্বন্ধে তখনও সম্পূর্ণরূপে সংশয়শূন্য হইতে পারেন নাই; অথচ বেদবাক্যে বা তদর্থে দৃঢ় প্রত্যয় বা অন্ধবিশ্বাস ব্যতীত একমাত্র বেদৈকগম্য অবাঙ্মনস-গোচর ব্রহ্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা কখনও সম্ভবপর হয় না বা হইতে পারে না; সুতরাং বেদবাক্যে বিশ্বাসহীন জিজ্ঞাসুর নিকট "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বেদবাক্য উপস্থাপিত করিলেও কোন ফলোদয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ চিত্তশুদ্ধির জন্য যে সমুদয় ক্রিয়ানুষ্ঠানের একান্ত আবশ্যক; যাজ্ঞিক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ বা বিরলতা নিবন্ধন সেই সমুদয় কর্ম্মানুষ্ঠানেও লোকের প্রবৃত্তি তখন মন্দীভূত হইয়াছিল; নিজ নিজ অধিকারের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সকলেই যেন ব্রহ্মজিজ্ঞাসার জন্য ব্যাকুল হইতেছিল; তাই

জৈমিনি

তিনি তখন মন্দমতি লোকদিগকে প্রথমে কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়ে বুঝাইলেন যে, "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যম-তদর্থানাম্" অর্থাৎ বেদ স্বতঃ প্রমাণ; বেদবাক্য কখনই ভ্রান্ত বা উন্মত্তপ্রলাপ নহে; যজ্ঞাদি ক্রিয়াপ্রতিপাদনই উহার একমাত্র উদ্দেশ্য; সেই সমুদয় ক্রিয়া হইতেই জীবগণ নিজ নিজ অভিমত ফলরাশি প্রাপ্ত হইবে; অতএব তোমরা সকলে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে বেদোদিত কর্ম্মানুষ্ঠানে মনোযোগী হও। তাহার পর, যে সমস্ত বেদবাক্য ক্রিয়ানুষ্ঠানের বোধক নয়; কেবলই বস্তুসত্তা মাত্র-প্রতিপাদক (১), সে সমস্ত বাক্যের অর্থবিচারে বা তদর্থা-নুশীলনে তোমাদের প্রয়োজন নাই। তোমরা কেবল "স্বর্গ-কামোঽশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি ক্রিয়াবিধির প্রামাণ্যের উপর নির্ভর করিয়া স্বর্গাদি প্রিয়ফলসাধক অশ্বমেধ প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও; বেদোক্ত কর্ম্মই পুরুষের সর্ব্বদুঃখ-প্রশমনের প্রকৃষ্ট উপায় এবং পরম কল্যাণের উৎকৃষ্ট সাধন।

জৈমিনি মুনি এইরূপে চিত্তের বিশুদ্ধি ও স্থিরতা সিদ্ধির উপায়ভূত কর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগিতা সংস্থাপনপূর্ব্বক বেদের নিত্যতা, অপৌরুষেয়তা ও স্বতঃ প্রমাণতারূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিষ্ঠা করিয়া 'পূর্ব্বমীমাংসা' সমাপ্ত করিলেন। অতঃপর মহর্ষি বেদব্যাসের কথা।

জগন্মঙ্গলকর গোতমাদি ঋষিবৃন্দের এইরূপ ক্রমিক নিপুণ

---

(১) জৈমিনির মতে—কেবল বস্তুমাত্র-বোধক "একমেবাদ্বিতীয়ং" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যের প্রামাণ্য প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

চেষ্টা ও উদার উপদেশের ফলে, যে সময় জনসমাজের হৃদয়মধ্যে ক্রমে পারলৌকিক আত্মার অস্তিত্ব ও নিত্যতা বুদ্ধি নাস্তিকতা-নিরাসপূর্ব্বক দৃঢ়ীভূত হইল;

বেদব্যাস

এবং শিষ্টজনেরা যখন সুব্যবস্থিত প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞানে প্রলুব্ধ হইয়া তদুপযোগী যোগপথে ও যাগাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমধিক আগ্রহসহকারে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন; ঠিক সেই সময়ে, মহর্ষি বেদব্যাস জীবনিস্তারের একমাত্র উপায়, বেদসার উপনিষদের চরম লক্ষ্য সেই মোক্ষদ্বার ব্রহ্মবিদ্যা,—যাহা তখনও লোকদৃষ্টির অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল, সেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশে ব্যগ্র হইয়া ব্রহ্মসূত্র—বেদান্তদর্শন প্রণয়নে কৃতসংকল্প হইলেন।

তিনি তাৎকালিক সমাজের জ্ঞানোন্মেষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উত্তমরূপে বুঝাইলেন যে, দৃশ্যমান এই জগৎ সত্য নহে—মায়াময় অসত্য; জীবগণ নিত্যমুক্ত এবং অখণ্ড ও অনন্ত ব্রহ্ম স্বরূপ। এই ব্রহ্মভাব লাভই জীবের মুক্তি, এবং বেদ স্মৃতি ও পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র ও তদুক্ত সমস্ত ধর্ম্মের ইহাই চরম লক্ষ্য বা শেষ উদ্দেশ্য। জীবগণ উক্ত ব্রহ্মাত্মভাব লাভেই চিরকৃতার্থ হইয়া থাকে, ইত্যাদি জীবহিতকর বিষয় সমূহ বুঝাইয়া বেদব্যাস নিজের কর্ত্তব্য শেষ করত বিশ্রাম লাভ করিলেন।

ভারতীয় মৌলিক দর্শন শাস্ত্র সমূহের উৎপত্তি, স্থিতি, গতি ও পৌর্ব্বাপর্য্যসম্বন্ধে যাহা কথিত হইল, তাহা দ্বারাই দর্শনশাস্ত্র-সমূহের মধ্যে আপাত-দৃষ্টিতে যে সমস্ত বিরোধ লক্ষিত হয়, তৎপরিহারেরও পথ প্রদর্শিত হইল; কারণ, উক্ত দর্শনগুলি

কেবল ঋষিদের বিদ্যাপ্রদর্শনের জন্যই রচিত হয় নাই, পরন্তু সময় ও সামাজিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাহা তৎকালোচিত মঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, তাহাই তাঁহারা তর্কযুক্তি-সহযোগে গ্রন্থাকারে সন্নিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং 'বিবাহ-প্রবৃত্ত বর' ন্যায়ে তাঁহারই উৎকর্ষ ঘোষণা করিয়াছিলেন মাত্র। কেহ যদি তাহা হইতে অপরের নিন্দাভিপ্রায় গ্রহণ করেন, তবে তাহা বিষম ভ্রম করা হইবে, একথা সকলকেই মনে রাখিতে হইবে। (১)

পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত ও তাহার আলোচনা।

কিন্তু ইদানীন্তন কোন কোন চিন্তাশীল মনস্বী মনে করেন যে, সমাজের শিক্ষা, জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির ক্রমিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদর্শনসমূহেরও ক্রমোন্নতি ঘটিয়াছে। তাহাদের মতে মহর্ষি গোতমের বিদ্যা, বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির গুরুত্ব বা গভীরতা, তৎকৃত ন্যায়-দর্শনেই সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছে—তিনি নিজের জ্ঞানে যতটুকু সত্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই তিনি ন্যায়দর্শনে বিবৃত করিয়াছেন; তদপেক্ষা অধিক উন্নত চিন্তা তাঁহার জ্ঞান-ভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল না। মহর্ষি কণাদ, কপিল প্রভৃতি দার্শনিকগণের

---

(১) 'বিবাহ-প্রবৃত্ত বর' ন্যায়টী এইরূপ—বিবাহের সভায় বরের পূজনীয় বা সম্মানার্হ বহু লোক উপস্থিত থাকিলেও, সে সভায় বরের আসনই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে যেমন অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও গুরুজনগণ কখনই বর অপেক্ষা হীন বলিয়া বিবেচিত হন না, ইহাও তদ্রূপ, অর্থাৎ এক দর্শনের প্রশংসা করায় অন্য দর্শনের হীনতা বুঝায় না।

অবস্থাও এতদনুরূপ; কারণ, এই ক্রমোন্নতি বিধানই বিশ্বসৃষ্টির স্বভাবসিদ্ধ অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়ম।

উল্লিখিত ক্রমোন্নতিবাদ প্রকৃত সত্য বা অব্যভিচারী কি না, এখানে সে সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিব না, সম্ভব হইলে পরে আলোচনা করিব। এখানে এইমাত্র বক্তব্য যে, ভারতীয় দর্শনসমূহকে ক্রমোন্নতির ফল বলিয়া স্বীকার করিলে, ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কপিল, কণাদ, গোতম ও জৈমিনি ঋষি ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ে সমধিক অজ্ঞ ছিলেন; কারণ, তাঁহাদের দর্শনে ঈশ্বরের স্থান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; পক্ষান্তরে, তাঁহারা সে বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও অতি অল্প ও অকিঞ্চিৎকর; সুতরাং সুধীসমাজে তাঁহারা দার্শনিকোচিত সম্পূর্ণ সম্মান লাভের দাবী করিতে পারেন না। অপরাপর দার্শনিকগণের সম্বন্ধেও যে, বিষয়বিশেষে অল্পাধিক পরিমাণে অজ্ঞতা বা অনভিজ্ঞতা কল্পনা করিতে পারা যায় না, তাহা নহে; সুতরাং ভারতীয় কোন দার্শনিকই পূর্ণমাত্রায় দার্শনিক সম্মান লাভের অধিকারী হইতে পারেন না।

আমাদের মনে হয়, এই ক্রমোন্নতিবাদই যাহাদের মূল মন্ত্র, এবং সে মন্ত্রসাধনার চূড়ান্ত ফল যাহাদের—স্বীয় পূর্ব্বপুরুষের অমানুষত্ব সংস্থাপন; তাহাদের মতে উক্ত যুক্তি সমীচীন হইলেও, আমরা তাহাতে একমত হইতে পারি না। কেন না, জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত যথেষ্ট আছে যে, একই ব্যক্তি বহু বিষয়ে বিচক্ষণ পণ্ডিত হইয়াও, অবস্থাভেদে বা অনুরাগবশে কোন

একটী মাত্র বিষয়ের অনুশীলনে ও ব্যাখ্যানেই আপনার শক্তি নিয়োজিত করিয়া থাকেন। মহামতি পাণিনি, ব্যাকরণ গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া কি, তাঁহাকে বিষয়ান্তরে অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? বহুদর্শী পিতা শিশু পুত্রের হিতার্থে 'শিশুশিক্ষা' রচনা করিয়াছেন বলিয়া কি, তাঁহার বিদ্যার সীমা 'শিশুশিক্ষা'তেই পর্য্যাপ্ত করিতে হইবে? অতএব গোতমাদি ঋষিগণ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও, সমাজের কল্যাণার্থে, যিনি যখন যাহা উপযুক্ত বোধ করিয়াছেন, তিনি তখন সেই বিষয়েই একখানা দর্শনশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, এ কথাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও বিচারসহ বলিয়া মনে হয়। অতঃপর হিন্দুদর্শনের লক্ষ্য বা প্রধান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক।

এইরূপ একটী প্রসিদ্ধ প্রবচন আছে যে,

"প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে।"

অর্থাৎ অতিবড় মূর্খ লোকও বিনা প্রয়োজনে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। মূর্খ লোকেরই যখন এই অবস্থা, তখন সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, দিব্যদর্শী মহর্ষি-বৃন্দের এরূপ আয়াসবহুল বিপুল দর্শনশাস্ত্র প্রণয়নের মধ্যেও নিশ্চয়ই একটা গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে, যাহা সাধনের জন্য ঐ সমুদয় কঠোরতর দর্শনশাস্ত্র সমূহ বিরচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল; সুতরাং প্রত্যেক দর্শনপাঠকেরই এই প্রকার জিজ্ঞাসা হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক যে, আর্য্য ঋষিবৃন্দের হৃদয়নিহিত সেই মহৎ উদ্দেশ্যটা

দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন বা লক্ষ্য

কিরূপ ও কি প্রকার ? এবং উল্লিখিত দর্শনশাস্ত্রসমূহই বা সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে কি পরিমাণে কতটা সহায়তা করিয়া থাকে ?

এতদুত্তরে আচার্য্যগণ বলেন, 'আপামর সাধরণ জীবগণের যাহা উদ্দেশ্য—জীবনের মুখ্য লক্ষ্য, সমস্ত হিন্দুদর্শনেরও তাহাই উদ্দেশ্য বা প্রধান লক্ষ্য। জগতে দেশ কাল ও জাতি ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে মনুষ্যমাত্রেরই—কেবল মনুষ্যের কেন, জীবমাত্রেরই প্রধান লক্ষ্য হইতেছে—সর্ব্ববিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও তৎসহচর বিমল আনন্দ প্রাপ্তি। পরস্পারের মধ্যে ধর্ম্ম কর্ম্ম ও সম্প্রদায়গত বিরোধ যতই প্রবল থাকুক না কেন, এ বিষয়ে কাহারো মতভেদ বা বিপ্রতিপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলেই চাহে—'সুখং মে ভূয়াৎ, দুঃখং মা ভূৎ', অর্থাৎ চিরদিন যেন আমার সুখই হয়, কখনও যেন দুঃখ না হয়। অধিক কি, সমস্ত পৃথিবীটা যেরূপ সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া নিয়ত তাহারই চতুষ্পার্শ্বে পরিভ্রমণ করিতেছে, তদ্রূপ পৃথিবীর সমস্ত জীবও উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সমস্ত কার্য্য করিতেছে। জীবসাধারণের এই অবিসংবাদিত উদ্দেশ্যই হিন্দুদর্শন সমূহের প্রধান লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল উপযুক্ত পথিপ্রদর্শনের জন্যই বিভিন্নপ্রকার ছয়খানি দর্শনশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে। এখানে বলা আবশ্যক যে, দর্শন শাস্ত্রে প্রদর্শিত পথগুলি পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন দিগ্‌বর্ত্তী হইলেও, গন্তব্য স্থান বা প্রধান লক্ষ্য সকলেরই এক—সেই ত্রিবিধ দুঃখের

আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি (১)। ফল কথা, উপায় সম্বন্ধে আপাত-বিরোধ থাকিলেও, কোন স্থানেই উপেয় বিষয়ে অণুমাত্রও বিরোধ নাই।

উক্ত ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও মুক্তি একই কথা। মুক্তির অপর নাম নিঃশ্রেয়স ও নির্ব্বাণ। বৌদ্ধশাস্ত্রেই নির্ব্বাণ শব্দের ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, তদ্ভিন্ন প্রায় প্রত্যেক দর্শনেই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি, নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিশব্দের স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে,—

মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন—

"প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-চ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।" (ন্যায়দর্শন। ১।১।১)

---

(১) হিন্দুশাস্ত্রে দুঃখকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—১। আধ্যাত্মিক। ২। আধিদৈবিক। ৩। আধিভৌতিক। তন্মধ্যে শারীরিক ও মানসিক দুঃখ আধ্যাত্মিক। দেবতা হইতে বাত বৃষ্টি বিদ্যুৎ প্রভৃতি দ্বারা উৎপাদিত দুঃখ আধিদৈবিক। আর দস্যু তস্কর ও ব্যাঘ্রাদি প্রাণী হইতে আগত দুঃখ আধিভৌতিক নামে অভিহিত।

উক্ত ত্রিবিধ দুঃখের যেরূপ নিবৃত্তি হইলে আর কখনও দুঃখভোগের সম্ভাবনা থাকে না, সেরূপ নিবৃত্তিকেই আত্যন্তিক নিবৃত্তি বলে। উক্তপ্রকার দুঃখ নিবৃত্তিই যে, পরম পুরুষার্থ—লোকের প্রার্থনীয়, তদ্বিষয়ে বোধ হয় কাহারো আপত্তি নাই; তবে আনন্দপ্রাপ্তির পরম পুরুষার্থতা সম্বন্ধে মত-ভেদ আছে। কেননা সাংখ্যকার মুক্তিতে দুঃখনিবৃত্তি ব্যতীত আনন্দ প্রাপ্তির কথা স্বীকার করেন না।

কণাদ বলিয়াছেন—

"অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥১॥ যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ, স ধর্ম্মঃ ॥২॥ বৈশেষিক দর্শন—১॥১॥১—২॥

কপিল বলিয়াছেন—

"অথ ত্রিবিধদুঃখ-নিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ ॥" সাংখ্যদর্শন ১।১

পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং, স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেঃ ॥" পাতঞ্জল দর্শন ৪।৩৪ ॥

মীমাংসকগণ বলিয়াছেন—

"আত্যন্তিকস্তু দেহোচ্ছেদো নিঃশেষ-ধর্ম্মাধর্ম্মপরিক্ষয়নিবন্ধনো মোক্ষ ইতি সিদ্ধম্। সমুৎখাত-নিখিল-সাংসারিক-দুঃখবন্ধনো মুক্ত ইত্যুচ্যতে ॥" প্রকরণপঞ্জিকা।

বেদব্যাস বলিয়াছেন—

"তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষ-বিনাশৌ ॥" বেদান্তদর্শন—

"ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে ॥" ৩।১।১৩ ও ৪।১।১৯

উল্লিখিত উদাহরণ দৃষ্টে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ ও তদুপায় প্রদর্শনই সমস্ত হিন্দুদর্শনের প্রধান লক্ষ্য।

দর্শনশাস্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, দর্শনশাস্ত্রসমূহ কখনও 'কান্তা-সম্মিত' কাব্য নাটকাদি শাস্ত্রের ন্যায় কেবল আপাতরমণীয় মধুর বাক্যবিন্যাস করিয়া, কিংবা 'প্রভুসম্মিত' বেদ, ও স্মৃতিশাস্ত্রের ন্যায় কেবলই কঠোর আজ্ঞামাত্র

হিন্দুদর্শনের বিশেষত্ব

প্রদান করিয়াই নিশ্চিন্ত হয় নাই; পরন্তু পরম হিতৈষী সুহৃদের ন্যায় নানাবিধ তর্ক যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ এমন উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছে যে, উহা তত্ত্বজিজ্ঞাসুর মানস-পটে দৃঢ় ভাবে অঙ্কিত হইয়া প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইতে থাকে। এই কারণেই দর্শন শাস্ত্রসমূহকে 'সুহৃৎসাম্মিত' শাস্ত্র কহে (১)। এবম্বিধ তর্কযুক্তির উপাদেয়তা প্রাচীন আচার্য্যগণও সাদরে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

মনু বলিয়াছেন—

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশং চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥"

(১) আচার্য গণ শাস্ত্রসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—
১। কান্তাসম্মিত, যথা—কাব্য নাটকাদি। ২। প্রভুসম্মিত; যেমন বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি। ৩। সুহৃৎসম্মিত; যেমন দর্শনাদি। কাব্যনাটকাদি শাস্ত্র পত্নীর ন্যায় কেবল আপাত রমণীয় বাক্য-বিন্যাসেই পরিসমাপ্ত; যুক্তিতর্ক সেখানে স্থান পায় না; এই কারণে কাব্যনাটক প্রভৃতিকে 'কান্তাসম্মিত' বলে। আর বেদ স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রও কেবল প্রভুর ন্যায় আজ্ঞা করিয়া থাকে; সেখানেও যুক্তি-তর্কের কোন অধিকার নাই; কারণ, প্রভুর আজ্ঞা অবিচারণীয়—অনুল্লঙ্ঘনীয়। এইজন্য বেদস্মৃতি প্রভৃতিকে'প্রভুসম্মিত'কহে। আর বন্ধু যেমন লোককে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়া, পরে কর্ত্তব্য পথের উপদেশ করে; দর্শনশাস্ত্রও সেইরূপ অগ্রে যুক্তির সাহায্যে বিষয়টি বুঝাইয়া দেয়, পরে কর্ত্তব্যের উপদেশ প্রদান করে; সেইজন্য উহা 'সুহৃৎসম্মিত' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

স্বয়ং শ্রুতিও "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ" বলিয়া মননের (বিচারের) আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অপরে আরও স্পষ্ট কথায় বলিয়াছেন,—

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ॥"

অভিপ্রায় এই যে, ভোগসুখে নিরত সংসারী মানব পদে পদে প্রতিহত হইয়া আপনার দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া কাতর হয়, ত্রিতাপের তীব্র তাপে যখন রমণীয় সংসার-সুখের স্তরে স্তরে দুরপনেয় দুঃখরাশির ভীষণ ছায়া নিরীক্ষণ করিতে থাকে, অথচ আশানুরূপ প্রতীকারের পথ কোথাও খুঁজিয়া পায় না; তখন আপনা হইতেই হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে; তখন ভোগসুখে বিষম বৈরাগ্য বা বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়, এবং উপস্থিত বৈরাগ্য-তরুর শান্তিময় শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের জন্য মন স্বতই ব্যাকুলতার সঙ্গে শান্তিরাজ্যের প্রকৃত পথিপ্রদর্শক তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়।

তত্ত্বদর্শী গুরু তখন সেই শরণাগত সংযমী শিষ্যকে সর্ব্বশান্তির নিকেতন-শ্রুতি-প্রদর্শিত মুক্তির প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শন করেন। বীতরাগ শিষ্যও তখন গুরূপদিষ্ট সেই রহস্য শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সহকারে হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হন; কিন্তু অবিশুদ্ধ মন বড়ই চঞ্চল, নিতান্তই অবাধ্য; সে সহজে কোন কথা গ্রহণ করিতে বা অভ্যস্ত পথ পরিত্যাগ করিতে সম্মত হয় না, বরং শ্রুতি ও গুরুর অকৈতব উপদেশের উপরেও নানাপ্রকার ছল, তর্ক, সংশয়

ও বিপরীত ভাবনা আনয়নপূর্ব্বক নির্ভয় সনাতন সাধন-পথেও কণ্টকারোপণ করিয়া ভীতির সঞ্চার করিয়া থাকে।

সংশয়িত বা বিপর্য্যস্ত বিষয়ে কখনও ধ্যান বা মনোনিবেশ সম্ভবপর হয় না; সুতরাং তখন মননের একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে থাকে। মনন অর্থ—প্রতিকূল-তর্ক নিবারণোপযোগী অনুকূল বিচার। আলোচ্য দর্শনশাস্ত্রসমূহ সেই প্রকার বিচার ও বিচারের প্রণালী অতি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছে। উপরি উদ্ধৃত "মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ" এই 'মন্তব্য' শব্দেও দর্শনশাস্ত্রোক্ত বিচার পদ্ধতিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই প্রকারে সাধনপথের কণ্টকাপসারণ ও বিশুদ্ধি সম্পাদনেই দর্শনশাস্ত্র সমূহের বিশেষ উপযোগিতা এবং ইহাই শাস্ত্রান্তর হইতে দর্শনশাস্ত্রের বিশেষত্ব। হিন্দুর সমস্ত দর্শনই উক্ত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আপন আপন সিদ্ধান্ত সংস্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছে।

হিন্দুদর্শনের প্রতিপাদ্য

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, জীবের দুর্ব্বহ দুঃখশান্তির পথিপ্রদর্শন করাই দর্শনশাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে যে সমুদয় বিষয় অনুকূল, অথবা যে সকল বিষয় বিবৃত না করিলে উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়-নির্দ্দেশই অসম্ভব হয়, সাধারণতঃ সেই সমুদয় বিষয়ই দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। লোকের রুচি প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যভেদে উক্ত উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথগুলি বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া বহু আকার ধারণ করিয়াছে। তদনুসারে বিভিন্ন দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহও

ক্রিয়ৎ পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু বিষয় ও বিচারাদিগত এরূপ প্রভেদসত্ত্বেও, ব্রহ্ম, জীব, জগৎ, জ্ঞান, অজ্ঞান, বন্ধ, মোক্ষ প্রভৃতি কতিপয় বিষয় প্রত্যেক দর্শনেই সমভাবে স্থানাধিকার করিয়াছে; সুতরাং ঐ সমুদয় বিষয়কেই হিন্দুদর্শনের সাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

দর্শন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও একথার সমর্থন করিতেছে। দর্শনশব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণপূর্ব্বক অর্থানুসন্ধান করিলেও বুঝা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বপ্রতিপাদন করাই দর্শনশাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য। অতএব এখন 'দর্শন' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ করা আবশ্যক হইতেছে।

দর্শন শব্দের যৌগিকার্থ

'দৃশ্' ধাতুর উত্তর 'অনট্' প্রত্যয়যোগে দর্শন শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। দৃশ্' ধাতুর সাধারণ অর্থ—প্রেক্ষণ। বাহ্য বস্তুর সহিত চক্ষুঃ সংযোগের ফলে, যে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার নাম প্রেক্ষণ; 'দর্শন' ইহার পর্য্যায় শব্দ। লোকে সাধারণতঃ চাক্ষুষ জ্ঞানকেই 'দর্শন' বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে; এই কারণে কেহ কেহ মনে করেন যে, নাস্তিকশিরোমণি চার্ব্বাক-সম্প্রদায়ই দর্শন শব্দের প্রথম প্রবর্ত্তক কারণ, নাস্তিকগণ প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অন্য কোন প্রমাণ স্বীকার করেন না, এবং ষড়্বিধ প্রত্যক্ষের মধ্যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষেরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। কারণ, এরূপ অর্থ ধাতুপাঠানুগত হইলেও, সর্ব্বত্র

এরূপ অর্থের অবাধ প্রচলন নাই। শব্দ-ব্যবহারবিদ্ পণ্ডিতগণ সর্ব্ববিধ জ্ঞানমাত্রেই 'দর্শন' শব্দের যথেচ্ছ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহার উদাহরণ বিরল নহে। অধিক কি, বৈয়াকরণ পণ্ডিতগণও, পরিশেষে বাধ্য হইয়া, "দৃশেরপি জ্ঞানবচনত্বাৎ" বলিয়া, 'দৃশ্' ধাতুর জ্ঞানমাত্র অর্থ স্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছেন; সুতরাং সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, চাক্ষুষ জ্ঞানও যেমন 'দৃশ্' ধাতুর অর্থ, জ্ঞান মাত্রও তেমনি উহার অপর একটী অর্থ। উভয় অর্থই ব্যবহার-সিদ্ধ ও প্রামাণিক। অতএব জ্ঞান সাধন (তত্ত্বজ্ঞান-প্রতিপাদক) শাস্ত্রমাত্রই 'দর্শন' সংজ্ঞায় অভিহিত হইবার যোগ্য। ন্যায় বৈশেষিকাদি আর্ষ শাস্ত্রগুলিও লৌকিক ও অলৌকিক নানাবিধ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছে; তজ্জন্য সে সমুদয় শাস্ত্রও 'দর্শন' নামে অভিহিত হইয়াছে।

বিশেষতঃ চাক্ষুষ দর্শন (চক্ষুরিন্দ্রিয়জনিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান) যেরূপ অধিকতর অভ্রান্ত ও সত্যগ্রাহী; সুতরাং সাময়িকভাবে বিশ্বাসযোগ্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ বিশুদ্ধ যুক্তি-তর্কসংবলিত ন্যায়-বৈশেষিকাদি শাস্ত্র হইতে লব্ধ লৌকিক বা অলৌকিক সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানও অবিসংবাদিত সত্যাবেদক ও অধিকতর অভ্রান্ত বলিয়া লোকের সমধিক বিশ্বাস্য হয়। চাক্ষুষ দর্শনের সহিত এইরূপ সৌসাদৃশ্য নিবন্ধনই ন্যায় বৈশেষিকাদি শাস্ত্রনিচয় 'দর্শন' নামে পরিচিত হইয়াছে, এ কথাও বলা যাইতে পারে।

যদিও প্রতিনিয়ত উত্থান-পতনশীল বুদ্ধিবৃত্তিমাত্রই

প্রচলিত জ্ঞান-শব্দের ব্যবহারিক অর্থ বলিয়া পরিগৃহীত হয় সত্য, তথাপি তত্ত্ববিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ সেরূপ অর্থকে জ্ঞান-শব্দের প্রকৃত অর্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—যাহা মুক্তি ও তদনুকূল সাধনপথের কণ্টকাপনয়নপূর্ব্বক জীবের সর্ব্বসন্তাপহরণে সম্পূর্ণ সমর্থ বা সহায়, তদৃশ বুদ্ধিবৃত্তিই জ্ঞান-শব্দের যথার্থ অর্থ, এবং তন্নিরূপণই দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতির প্রধান লক্ষ্য। তদ্ভিন্ন যে সমুদয় বুদ্ধিবৃত্তি কেবল সংসারগোচর ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তি-পরিহারের উপায় বা সাধনমাত্র, —মুক্তির সহিত অতি দূরসম্বন্ধেও সম্বদ্ধ নহে, সে সমুদয় বুদ্ধিবৃত্তি ব্যবহারক্ষেত্রে 'জ্ঞান' নামে পরিচিত হইলেও, বস্তুতঃ উহারা অজ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে এইরূপই উপদেশ দিয়াছিলেন—

"অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসাক্ষান্তিরার্জ্জবম্।

*　　*　　*　　*

এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥" ইতি

শব্দ-বিদ্যাবিশারদ মহামতি অমরসিংহও তদীয় অভিধানে "মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্প-শাস্ত্রয়োঃ" এই বাক্যে মোক্ষবিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তিকেই 'জ্ঞান,' আর তদ্ভিন্ন শিল্প ও শাস্ত্রবিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তিকে 'বিজ্ঞান' সংজ্ঞায় বিশেষিত করিয়াছেন (১)।

(১) কেহ কেহ উদ্ধৃত শ্লোকাংশের অন্যপ্রকার অর্থও করিয়া থাকেন। যথা—'মোক্ষে ধীঃ' অর্থাৎ মোক্ষবিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তির নাম 'ধী'; 'অন্যত্র জ্ঞানম্' অর্থাৎ অন্য সাধারণ বিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তির নাম—জ্ঞান, আর 'শিল্প-শাস্ত্রয়োঃ বিজ্ঞানং' অর্থাৎ শিল্প ও শাস্ত্রবিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তির নাম 'বিজ্ঞান'। বস্তুতঃ এরূপ অর্থ সর্ব্বসম্মত নহে।

অতএব দর্শন শব্দের সমুদিত অর্থ হইতেছে এই যে, যে শাস্ত্র মোক্ষ ও তদুপযোগী আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি অলৌকিক বিষয় সমুদয় প্রতিপাদন করে, এবং সেই সমুদয় বিষয়ে চাক্ষুষ জ্ঞানের ন্যায় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দর্শনের ন্যায় অবিসংবাদী পরিস্ফুট জ্ঞান সমুৎপাদন করে, তাহার নাম দর্শন শাস্ত্র। ন্যায় বৈশেষিকাদি শাস্ত্রসমূহও নিজ নিজ অভিপ্রায়ানুসারে ঐ প্রকার জ্ঞান সমুৎপাদনে সাহায্য করিয়া থাকে; এইজন্য উহারা দর্শন নামে পরিচিত হইয়াছে।

আরও এক কথা, আত্মা ও ব্রহ্ম প্রভৃতি বিষয়ে তত্ত্বদৃষ্টি সমুৎপাদনই যে, সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য লক্ষ্য, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রতিপাদ্য বিষয়ের নামানুসারে গ্রন্থের নাম-করণ চিরপ্রসিদ্ধ। এখনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই; সুতরাং এরূপ কল্পনা করা বোধ হয় অনুচিত হইবে না যে, অতি প্রথমে ন্যায় ও বৈশেষিকাদি শাস্ত্রগুলি তত্তৎ শাস্ত্রীয় প্রধান প্রধান বিষয়ের নামানুসারে 'আত্মদর্শন' 'ব্রহ্মদর্শন' বৈশেষিকদর্শন' ও 'সংখ্যদর্শন' প্রভৃতি নামেই অভিহিত হইত। পরে কাল-প্রভাবেই হউক, আর ব্যবহার-সৌকর্য্যবোধেই হউক, নামের প্রথমাংশ পরিত্যক্ত হইয়া কেবল 'দর্শন' অংশমাত্র ব্যবহারক্ষেত্রে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে (১)। দার্শনিক আচার্য্যগণের মধ্যে,

(১) নামের এরূপ সংক্ষেপে ব্যবহার পুরাকালেও বিদ্যমান ছিল যথা— 'ভীমসেন' স্থলে 'ভীম, 'সত্যভামা' স্থলে সত্যা, 'রামচন্দ্র' স্থলে রাম। বর্ত্তমান সময়েও —'হরিদাস' স্থলে হরি,'সুধীর' স্থলে 'সুধী' ও 'সনৎকুমার' স্থলে 'সনৎ'। গ্রন্থের মধ্যেও যথা— 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' স্থলে শকুন্তলা, 'রঘুবংশ' স্থলে 'রঘু' ইত্যাদি নামসংক্ষেপ দৃষ্ট হয়।

প্রধানতঃ আচার্য্য শঙ্করকেই স্বকৃত ভাষ্যমধ্যে স্থানে স্থানে শুদ্ধ 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ করিতে দেখা যায় (১)।

কিন্তু তৎপূর্ব্বে আস্তিক-সম্মত কোন গ্রন্থে কেহ ঐরূপ অর্থে দর্শনশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কি না, তাহা নিঃসংশয়িতরূপে বলিতে পারা যায় না। তবে, বহু জৈনগ্রন্থে ঐরূপ অর্থে দর্শন শব্দের উল্লেখ ও পরিচয়াদি দৃষ্ট হয়। আচার্য্য শঙ্করেরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী এমন কি, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে বা পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে যাহার আবির্ভাব ও অবস্থিতি অনুমিত হয়, সেই হরিভদ্রসূরিনামক একজন জৈন পণ্ডিত স্বকৃত 'ষড়্দর্শন-সমুচ্চয়' নামক গ্রন্থে ষড়্দর্শনের নাম নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে ও মঙ্গলাচরণ-কালে 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বলা আবশ্যক যে, সেখানে দর্শন শব্দের অন্যপ্রকার অর্থ করিবার উপায় নাই (২)। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেখানে ষড়্দর্শনের মধ্যে বেদান্ত ও পাতঞ্জল দর্শনের নাম নাই, তৎপরিবর্ত্তে আছে, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের নাম। উহাদের দ্বারাই দর্শনের ষট্‌ত্ব সংখ্যা পূরণ

(১) 'নৈবাস্মদীয়ে দর্শনে কিঞ্চিদসমঞ্জসমস্তি'।' (বেদান্তদর্শন ২।১।৯)
"ঔপনিষদমিদং দর্শনম্।" ২।১।৯
"বৈদিকস্য দর্শনস্য।" ২।১।১২

(২) "বৌদ্ধং নৈয়ায়িকং সাংখ্যং জৈনং বৈশেষিকং তথা।
জৈমিনীয়ং চ নামানি দর্শনানামমূন্যহো॥"
"সদ্দর্শনং জিনং নত্বা বীরং স্যাদ্বাদদেশিকম্।
সর্ব্বদর্শন-বাচ্যোঽর্থঃ সংক্ষেপেণ নিগদ্যতে॥" (মঙ্গলাচরণ)

করা হইয়াছে। কেহ কেহ আবার বৈশেষিক দর্শনকে ন্যায়-দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দর্শনের সংখ্যা পাঁচের অধিক স্বীকার করেন নাই; বরং লোকায়ত-(চার্ব্বাক) সিদ্ধান্ত দ্বারা দর্শনের ষড়্‌বিধত্ব রক্ষা করিয়াছেন (১)। তাপনী শ্রুতিতেও দর্শন শব্দের উল্লেখ আছে,—"পরমর্ষিবিভট্টারকঃ শ্রুত্যষ্টাদশ বিদ্যাঃ সর্ব্বাণি চ দর্শনানি লীলয়ৈব প্রণিন্যে" ইতি। এখানে অষ্টাদশ বিদ্যার অতিরিক্তরূপে দর্শনের উল্লেখ থাকায় প্রকৃতার্থ নির্ণয় করা বড়ই কঠিন হইতেছে। তাই প্রপঞ্চসার-প্রণেতা শঙ্করাচার্য্য উক্ত বাক্যের ব্যাখ্যাস্থলে ন্যায় ও বৈশেষিকাদির পরিবর্ত্তে, "দর্শনানি—বৌদ্ধ-শৈব-ব্রাহ্ম-সৌর-বৈষ্ণব-শাক্তানি" এইরূপ অভিনব ষড়্‌দর্শনের নাম নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ইহা দ্বারা মনে হয় যে, প্রাচীনেরা যৌগিকার্থানুসারেই দর্শন-শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। তবে একথাও বলা আবশ্যক যে, যৌগিকার্থই শব্দার্থ-ব্যবহারের একমাত্র নিয়ামক নহে; পরন্তু অভিধান প্রভৃতি আরও কতিপয় কারণ আছে, যাহা দ্বারা প্রত্যেক লোকই শব্দকে বিভিন্ন অর্থে পরিচালিত ও নিযন্ত্রিত করিয়া থাকে; নচেৎ কেবল ব্যুৎপত্তিগত অর্থকেই শব্দ-ব্যবহারের একমাত্র নিয়ামক বলিয়া

(১) "নৈয়ায়িকমতাদন্যে ভেদং বৈশেষিকৈঃ সহ।
ন মন্যন্তে মতে তেষাং পঞ্চৈবাস্তিত্ববাদিনঃ॥
ষষ্ঠদর্শনসংখ্যা তু পূর্য্যা চ তন্মতে কিল।
লোকায়ত-মতাক্ষেপাৎ কথ্যতে তেন তন্মতম্॥" (ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়)

স্বীকার করিলে, কেবল যে, ব্যবহারেরই বিশৃঙ্খলা ঘটে, তাহা নহে; পরন্তু অনেকস্থলে শব্দ-ব্যবহারই অসম্ভব হইয়া পড়ে। সংক্ষেপতঃ উদাহরণ স্বরূপ 'গো' শব্দ ও 'বৃক্ষ' শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

'গম্' ধাতুর উত্তর 'ডোস্' প্রত্যয়যোগে 'গো' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। গম্ ধাতুর অর্থ—গমন, আর 'ডোস্' প্রত্যয়ের অর্থ—কর্ত্তৃত্ব; সুতরাং গো-শব্দের যৌগিকার্থ হইতেছে—গমনকর্ত্তা (যিনি গমন করেন)। এখন এইরূপ যৌগিকার্থ ধরিয়া যদি গো-শব্দের ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে, গতিশীল যে কোন মনুষ্যকেও গো-শব্দের সুমধুর আহ্বানে আপ্যায়িত করা যাইতে পারে! পক্ষান্তরে, যাহার চতুর্দ্দশ পুরুষ অবাধে গো-পদে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সেই গো বেচারীকেও শয়নাবস্থায় আর গো বলা যাইতে পারে না; কারণ, সে সময়ে ত সে গো—গমনকারী নহে, (শয়নকারী); সুতরাং গো-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার অযোগ্য। বৃক্ষ শব্দের অবস্থাও এইরূপ। বৃশ্চ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'শক' প্রত্যয়যোগে 'বৃক্ষ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৃশ্চ্ ধাতুর অর্থ—ছেদন; আর 'শক্' প্রত্যয়ের অর্থ—কর্ত্তৃত্ব; সুতরাং প্রকৃতি-প্রত্যয়ের সম্মিলিত অর্থ হইতেছে—ছেদন-কর্ত্তা (যিনি ছেদন করেন)। এখন এইপ্রকার যৌগিকার্থ ধরিয়া 'বৃক্ষ' শব্দের ব্যবহার করিলে, প্রসিদ্ধ বৃক্ষকে না বুঝাইয়া ছেদনকারী মনুষ্যকেই বুঝাইতে পারে; এবং 'বৃক্ষ-চ্ছেদন কর' বলিলে, বৃক্ষের ছেদন করা না বুঝাইয়া ছেদন-

কর্ত্তারই শিরশ্ছেদন বুঝাইতে পারে। অথচ তাদৃশ ব্যবহার আজ পর্য্যন্ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, শব্দব্যবহারে কেবল ব্যাকরণই একমাত্র নিয়ামক নহে; অভিধান প্রভৃতি কারণান্তরও আছে (১)।

(১) শব্দবিদ্ পণ্ডিতগণ শব্দার্থনির্ণয়ের জন্য এই সমুদয় কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমানাৎ কোষাপ্তবাক্যাদ্ ব্যবহারতশ্চ।
বাক্যস্য শেষাদ্বিবৃতের্বদন্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্য বৃদ্ধাঃ॥"

ব্যাকরণ হইতে অর্থবোধ যথা—পাচক (পাককর্ত্তা), পাঠক (পাঠকারী)। উপমান বা সাদৃশ্য দ্বারা অর্থবোধ যথা। গো সদৃশ গবয়, (এখানে গোর সাদৃশ্য দৃষ্টে গবয় শব্দের অর্থ নির্ণয় হয়) অভিধান হইতে যথা, নর, সুর প্রভৃতি। আপ্তবাক্য হইতে যেমন, 'অমুক দেশে অমুক নামে কোন বস্তু আছে' ইত্যাদি। ব্যবহার হইতে যেমন, বৃদ্ধ-ব্যবহার দৃষ্টে বালকের পদার্থ-জ্ঞান হয়। বাক্যশেষ হইতে অর্থ বিশেষ প্রতীতি যেমন, 'যব' শব্দের অর্থ। যব শব্দটীকে ম্লেচ্ছেরা 'কঙ্গু' নামক শস্যে ব্যবহার করে, কিন্তু আর্য্যগণ দীর্ঘশূকে (যাহা যব বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহাতে) ব্যবহার করেন। বেদে 'যব' শব্দের প্রয়োগ আছে। সেখানে কোন অর্থ গ্রাহ্য? না, দীর্ঘশূক অর্থ; কারণ, ঐ বাক্যের শেষে আছে—"বসন্তে সর্ব্বশস্যানাং জায়তে পত্রশাতনং। মোদমানাশ্চ তিষ্ঠন্তি যবাঃ কণিশশালিনঃ॥" ইতি। বিবৃতি অর্থাৎ শব্দের ব্যাখ্যা হইতে, যেমন 'চমস' শব্দ। "অর্ব্বাগ্‌বিল উর্দ্ধবুধ্নশ্চমসঃ" ইত্যাদি বিবরণ হইতে জানা যায় যে, হাতার মত একটী বস্তুর নাম চমস। প্রসিদ্ধ পদের সান্নিধ্য হইতে অর্থবোধ, যেমন, 'এই সহকার বৃক্ষে 'পিক' মধুর রব করিতেছে।' এখানে 'সহকার' (আম্র) শব্দের সঙ্গে 'পিক' শব্দ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, পিক অর্থ কোকিল।

অতএব উপরে দর্শন শব্দের যেরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করা হইল, তাহা বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হয় নাই।

এ পর্য্যন্ত হিন্দুদর্শনের স্বরূপ, বিভাগ, পৌর্ব্বাপর্য্য, উদ্দেশ্য, আকর, আবির্ভাব ও প্রয়োজন প্রভৃতি সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে যতটা সম্ভব, আলোচিত ও বিবৃত হইল। অতঃপর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের মধ্যে যে, কতটা ঐক্যানৈক্য রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে কয়েকটা কথা বলিয়াই ভূমিকা শেষ করিব, এবং প্রকৃত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

উপসংহার বা আলোচনা

এদেশের দর্শন শাস্ত্রসমূহ সংস্কৃত ভাষায় সন্নিবদ্ধ থাকায় এতকাল সংস্কৃতভাষাবিদ্ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যেই উহা সীমাবদ্ধ ছিল। অপর সাধারণে দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে বড় কিছু খোঁজ খবর রাখিত না; রাখা সম্ভবও হইত না; কারণ, দর্শনশাস্ত্রগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, অত্যন্ত নীরস ও কর্কশ, অথচ তাহারা সংস্কৃত ভাষায় অপটু। কাজেই এরূপ বিসদৃশ সংযোগে সহজে সুফলের সম্ভব হইতে পারে না। ভগবৎকৃপায় এখন আর সেদিন নাই; পূর্ব্বাবস্থার অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন অনেকেই সংস্কৃত ভাষার সহিত অল্পাধিক পরিমাণে পরিচয় রাখিতেছেন, এবং সেরূপ পরিচয় রক্ষা করা শ্লাঘনীয় বলিয়াও মনে করিতেছেন; সুতরাং এখন কেবল ভাষার আবরণে আর তাহাদের প্রবেশ-পথ অবরুদ্ধ রাখিতে পারিতেছে না। তাহার ফলে উদীয়মান পাশ্চাত্য শিক্ষার সমুন্নতি বিস্তৃতি ও প্রতিপত্তির সঙ্গে

সঙ্গে প্রাচীন হিন্দুদর্শনের উপরও শিক্ষিত সুধীসমাজের সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে। আরও আহ্লাদের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী অনেক কৃতবিদ্য লোকও স্বদেশ-প্রিয়তা বশতই হউক, আর দুর্ব্বার জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যেই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক এখন এই পুরাতন প্রাচ্য দর্শনের সারবত্তা গভীরতা ও উপযোগিতা নির্ণয়মানসে তাহারই সেবায় মন সমর্পণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। অতএব আশা করা যায় যে, তাঁহাদের এই প্রকার আন্তরিক যত্ন, ঐকান্তিক উৎসাহ ও অদম্য উদ্যমের ফলে, ক্ষীণপ্রভ প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্র সমূহও পুনরায় নব জীবন লাভ করত উজ্জ্বল আলোকমালা বিস্তারপূর্ব্বক সকলের হৃদয়-মন্দির উদ্ভাসিত করিতে সমর্থ হইবে। এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব। কথাটা এই—

দেশ, কাল ও সমাজের অবস্থাভেদে মানুষের চিন্তা ও সিদ্ধান্ত-প্রণালী প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে; সুতরাং কোন গ্রন্থের পরিচয় জানিতে হইলে, কিংবা প্রকৃতি পরীক্ষা করিতে হইলে, পরীক্ষককে সর্ব্বাদৌ তদানীন্তন ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে; নচেৎ পরীক্ষণীয় বিষয়সমূহ কখনও তাহার নিকট আত্ম-প্রকাশ করিবে না। অতএব বলা বাহুল্য যে, যাহারা বৈদেশিক ভাবাবেশে বিভোর হইয়া, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রকৃতি ও পরিচয় জানিতে প্রয়াসী হন, অথবা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের

মধ্যে একটা সমন্বয় বা সামঞ্জস্য সংস্থাপনে যত্ন করেন; তাঁহারা কখনই সফলকাম হইতে পারেন না, এবং তাহা সম্ভবপরও হয় না। কারণ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ পৃথক্ ও বিপরীত পথগামী। প্রাচ্য দর্শনের আরম্ভ, দুঃখবাদে, এবং সমাপ্তি তাহার দুঃখনিরাসে ও পরমানন্দ-লাভে; আর প্রতীচ্য দর্শনের আরম্ভ হইয়াছে সংশয়বাদে, এবং সমাপ্তি হইয়াছে জড়-তত্ত্বনির্দ্ধারণে, (কিন্তু পরতত্ত্ব নিরূপণে নহে)।

এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, বিবিধ বৈচিত্র্যের বিলাসভূমি বিশ্বরাজ্যে যে সমুদয় বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রতিনিয়ত নয়নপথে পতিত হয়, তদ্দর্শনে চিন্তাশীল মানবের মনোমধ্যে স্বতঃই একটা কার্য্য-কারণভাব কল্পনা করিবার কৌতূহল জাগিয়া উঠে। সংশয়ই সে কৌতূহলের মূল। সংশয়মূলক সেই কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য যে, জগৎ ও তদুপাদানাদি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা, তাহাই প্রতীচ্য দর্শনের মূলভিত্তি; সুতরাং বন্ধ, মোক্ষ, আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা উহার মুখ্য বিষয় নহে—গৌণ—অতি গৌণ।

কিন্তু প্রাচ্য দর্শনের অবস্থা উহার সম্পূর্ণ বিপরীত—জগতের প্রত্যেক জীব প্রতি মুহূর্ত্তে যে ভীষণ দুঃখের জ্বালা অনুভব করিতেছে; যাহার অস্তিত্ব বিষয়ে ধনী, দরিদ্র, মূর্খ, পণ্ডিত, কাহারও বিপ্রতিপত্তি বা সংশয়ের লেশমাত্রও নাই; এবং যাহা পরিহার করিবার জন্য প্রত্যেক প্রাণীই স্বতঃ পরতঃ প্রযত্ন করিয়া থাকে; সেই অবিসংবাদিত বা সর্ব্বসম্মত দুঃখ-নিবৃত্তির জন্যই প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্রসমূহের প্রবৃত্তি বা আরম্ভ; কিন্তু কোনও কাব্য-

কথার স্থায় কেবল বিশ্ববৈচিত্র্য প্রদর্শনের জন্য নহে। পরদুঃখ-কাতর মহর্ষিগণ যোগলব্ধ দিব্যজ্ঞানে যাহা ধ্রুব সত্য ও তৎকালোচিত দুঃখশান্তির অমোঘ উপায় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহাই লোকহিতার্থে দর্শনশাস্ত্রাকারে সন্নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কোনও সংশয় বা বিস্ময়ের বশে দর্শনশাস্ত্র রচনা করেন নাই; কারণ, তাঁহারা সকলেই ঋষি ছিলেন। 'ঋষি' অর্থই দিব্যদর্শী সত্যবাদী—"ঋষয়ঃ সত্য-বচসঃ।" তাঁহারা সমাধিশুদ্ধ স্বীয় হৃদয়-দর্পণে নিখিল বস্তু-তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া পশ্চাৎ তাহাই লোকহিতার্থে গ্রন্থাকারে সন্নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন মাত্র। প্রত্যক্ষ বিষয়ে কখনও ভ্রম বা সংশয় থাকিতে পারে না; সুতরাং তাঁহাদের শাস্ত্রারম্ভের মূলে সংশয় বা বিস্ময়ের পরিকল্পনা করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।

বিশেষতঃ, আত্মা, ঈশ্বর, বন্ধ, মোক্ষ প্রভৃতি যে সমুদয় বিষয় প্রাচ্য দর্শনের মুখ্য বা প্রধান প্রতিপাদ্য, সে সমুদয়ই প্রতীচ্য দর্শনে গৌণ—অতি গৌণরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, দৃশ্যমান জগৎ ও তাহার কার্য্য-কারণভাব কল্পনা প্রভৃতি যে সমুদয় বিষয় প্রতীচ্যদর্শনে প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে, প্রাচ্য দর্শনে সে সমুদয়ই অতি গৌণ বা প্রাসঙ্গিক বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অধিকন্তু, সত্যে প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তর্কানুসন্ধান করা হইতেছে প্রাচ্য দর্শনের প্রকৃতি, আর সংশয়ের প্রেরণায় তত্ত্বানুসন্ধান করা হইতেছে প্রতীচ্যের পদ্ধতি; কাজেই বিভিন্নপ্রকৃতি ও বিপরীত-পথগামী প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্পূর্ণ

সামঞ্জস্য বা ঐকমত্য পরিকল্পনার প্রয়াস কখনই সুফলপ্রদ হইতে পারে না।

[গোতমের ন্যায়দর্শন]

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, আস্তিক-সম্মত ষড়্‌দর্শনের মধ্যে গোতমকৃত ন্যায়দর্শনই সকলের প্রথম এবং বেদব্যাসকৃত বেদান্তদর্শনই সকলের চরম বা কনিষ্ঠ। এক্ষণে আমরা সেই ন্যায়দর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

গোতম দর্শনের 'ন্যায়দর্শন' নাম

সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষ প্রদর্শনপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত-সংস্থাপনকে 'ন্যায়' বলে। আলোচ্য গৌতম দর্শনে উক্ত প্রকার ন্যায় বহুল পরিমাণে সন্নিবদ্ধ থাকায় এবং তর্কের সাহায্যে তত্ত্বনির্ণয়ের ব্যবস্থা থাকায় উহা 'ন্যায় দর্শন' নামে অভিহিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, পরার্থে প্রযুক্ত অনুমানমাত্রেই পঞ্চাবয়ব-সাপেক্ষ ;—পরকে বুঝাইবার নিমিত্ত যখনই অনুমান করিতে হয়, তখনই প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন নামক পাঁচটী অংশ বা অবয়ব স্বীকার করা আবশ্যক হয়। শাস্ত্রে উক্ত (১) পাঁচটী অবয়বকে 'ন্যায়' নামে পরিভাষিত করা হইয়াছে। গোতমকৃত দর্শনে উক্ত পাঁচটী অবয়ব অতি নিপুণতার সহিত নিরূপিত ও

(১) প্রতিজ্ঞা প্রভৃতির লক্ষণ ও পরিচয় পরে বিশেষভাবে প্রদত্ত হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বার্থ ও পরার্থভেদে অনুমান দুই প্রকার; তন্মধ্যে পরার্থানুমানস্থলেই উক্ত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব রূপ ন্যায়ের প্রয়োগ আবশ্যক হয়, স্বার্থানুমান স্থলে নহে।

প্রদর্শিত হইয়াছে; সম্ভবতঃ এই কারণেও গোতমীয় দর্শন 'ন্যায় দর্শন' নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

ভাষ্যকার বাৎসায়ন কিন্তু ন্যায় কথার অন্যপ্রকার অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"কঃ পুনরয়ং ন্যায়ঃ? প্রমাণৈরর্থ-পরীক্ষণং ন্যায়ঃ।"

অর্থাৎ বিভিন্ন প্রমাণের সাহায্যে বস্তু-তত্ত্ব পরীক্ষার নাম 'ন্যায়'। সেই পরীক্ষাপ্রণালী এই গ্রন্থে বিশেষভাবে স্থান লাভ করিয়াছে বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে 'ন্যায়দর্শন'। ন্যায়-বিদ্যার অপর নাম "আন্বীক্ষিকী"। আন্বীক্ষিকী শব্দের অর্থ-নির্দ্দেশ-স্থলে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"প্রত্যক্ষাগমাশ্রিতম্ অনুমানং সা অন্বীক্ষা।"

"প্রত্যক্ষাগমাভ্যামীক্ষিতস্য অন্বীক্ষণম্ অন্বীক্ষা, তয়া প্রবর্ত্ততে ইতি আন্বীক্ষিকী, ন্যায়বিদ্যা ন্যায়শাস্ত্রম্।"

"অন্বীক্ষা" কথার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে—প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্রানুগত অনুমানের নাম অন্বীক্ষা। অথবা প্রত্যক্ষ বা শব্দ প্রমাণের সাহায্যে অবগত বিষয়ের যে, অনু—পশ্চাৎ জ্ঞান (অনুমিতি), তাহার নাম 'অন্বীক্ষা'। সেই অন্বীক্ষানুসারে যে শাস্ত্র আরব্ধ হইয়াছে, তাহার নাম আন্বীক্ষিকী—ন্যায়বিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্র।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ণ আন্বীক্ষিকী বিদ্যাকে অতি বড় উচ্চ আসন দিয়াছেন। এমন কি, সর্ব্ববিদ্যার প্রদ্যোতক প্রদীপস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানাম্ উপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা ॥" ইতি

ইহার মতে পরিগণিত বিদ্যার মধ্যে এই ন্যায়বিদ্যাই (আন্বীক্ষিকীই) সমস্ত বিদ্যার প্রদীপ স্বরূপ, সমস্ত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং সর্ব্ব ধর্ম্মের আশ্রয় স্বরূপ। ইহা দ্বারা আন্বীক্ষিকী বিদ্যার যে, কিরূপ গৌরব ঘোষণা করা হইল, তাহা আর বলিতে হইবে না। মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মে একস্থানে স্বয়ং বেদব্যাসও আন্বীক্ষিকী বিদ্যার উপাদেয়তা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'আমি সেই মহাত্মা আন্বীক্ষিকী [illegible] করিয়া উপনিষদের সারতত্ত্ব সমুদ্ধার করিয়াছি।' ইহা ছাড়া অন্যান্য স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসাদি গ্রন্থেও স্থানে স্থানে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার প্রশংসাবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ঐ সমুদয় গ্রন্থের স্থানবিশেষে আবার আন্বীক্ষিকী বিদ্যার যথেষ্ট নিন্দাবাদেরও অভাব নাই। বেদব্যাস একস্থানে বলিয়াছেন—

"ন্যায়-তন্ত্রাণ্যনেকানি তৈস্তৈরুক্তানি বাদিভিঃ।
হেত্বাগম-সদাচারৈর্যদ্যুক্তং তদুপাস্যতাম্ ॥" ইতি

এবং—

"অক্ষপাদ-প্রণীতে চ কাণাদে সাঙ্খ্য-যোগয়োঃ।
ত্যাজ্যঃ শ্রুতিবিরুদ্ধোঽংশঃ শ্রুত্যেকশরণৈর্নৃভিঃ ॥"

ইত্যাদি।

এ সকল বাক্যে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, বিভিন্নবাদীর লিখিত ন্যায় শাস্ত্রমধ্যে এমন অনেক বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে, যাহা যুক্তিবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও সাক্ষাৎ শ্রুতিবিরুদ্ধও বটে; সুতরাং সে সমুদয় অংশ পরিত্যাজ্য। শাস্ত্রে ত্যাগার্হ অসত্য বিষয়ের সন্নিবেশ যে কিয়ৎ পরিমাণে গৌরবহানিকর হয়, তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ে বৈমত্য বা দোষসংস্পর্শ থাকিলেও, প্রধান প্রতিপাদ্য নির্দ্দোষ তর্কাংশে উহার শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভাষ্যকারের উক্ত বাক্যেরও ঐ অংশেই তাৎপর্য্য। তর্কবিদ্যা যে, বুদ্ধিমার্জ্জনা ও বিচার-নৈপুণ্য বর্দ্ধিত করে, সে বিষয়ে কাহারো সংশয় বা বিপ্রতিপত্তি নাই; সুতরাং শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ের পক্ষে তর্কবিদ্যার যে, গুরুত্ব ও উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

মহামহোপাধ্যায় গঙ্গেশোপাধ্যায়ের প্রবর্ত্তিত নব্য ন্যায়ের প্রচার বাহুল্যে মূল ন্যায়দর্শনের পঠন-পাঠনপদ্ধতি অতিশয় দৈন্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার ফলে, উহার কোন কোন ব্যাখ্যাগ্রন্থ বিলুপ্ত প্রায়ও হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বাৎস্যায়নকৃত ন্যায়ভাষ্য, উদ্দ্যোতকরকৃত ন্যায়বার্ত্তিক, বাচস্পতি মিশ্রকৃত ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা, উদয়নাচার্য্য-প্রণীত বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত ন্যায়সূত্রবৃত্তি ও জয়ন্তভট্টের ন্যায়মঞ্জরী প্রভৃতি কতিপয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

ন্যায়দর্শনের সূত্রসংখ্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। স্থলবিশেষে সূত্রাংশ ভাষ্যমধ্যে, আবার ভাষ্যাংশ সূত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতেই সূত্রসংখ্যার এই প্রকার গোলযোগ সংঘটিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ন্যায়দর্শনে ৫৪৭টী সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহামতি বাচস্পতি মিশ্র যে, 'ন্যায়সূচী নিবন্ধ' রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সূত্রসংখ্যা নির্দ্ধারণের জন্য যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে সমগ্র ন্যায়-দর্শনের সূত্রসংখ্যা পাঁচশত আটাশ (৫২৮)। উক্ত সূত্রসমূহ পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং প্রত্যেক অধ্যায় আবার দুই দুইটা আহ্নিকে পরিসমাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, পাঁচ অধ্যায়ের দশটী আহ্নিকে উক্ত সূত্রগুলি শেষ হইয়াছে।

আহ্নিক শব্দটী 'পাদ' বা পরিচ্ছেদের স্থলবর্ত্তী। একদিনের মধ্যে গ্রন্থের যতটা অংশ রচিত হইয়াছিল, সেই অংশটুকুই 'আহ্নিক' নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সমগ্র ন্যায়-দর্শন রচনা করিতে মহামুনি গোতমের দশদিনমাত্র সময় লাগিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই দশদিনের গ্রন্থখানা এখন দশ মাসেও আয়ত্ত করা সহজ হয় না?

ন্যায়দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য ষোড়শ পদার্থের মধ্যে, প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক ও নির্ণয় এই নয়টী, আর দ্বিতীয় আহ্নিকে বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস ও ছল, এই পাঁচটীমাত্র পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রমাণ-পরীক্ষা, আর তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে প্রমেয়-পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। (১) তাহার পর, পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে 'জাতি' ও দ্বিতীয় আহ্নিকে 'নিগ্রহস্থান' নামক দুইটী বিষয় নিরূপিত ও বিচারিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, উক্ত ষোড়শ পদার্থের নিরূপণ ও আলোচনা প্রসঙ্গে আরও বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় গ্রন্থমধ্যে সমালোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, হিন্দুদর্শন মাত্রেরই দুঃখবাদে আরম্ভ, এবং দুঃখশান্তিতে পর্য্যবসান। এ নিয়মের কোথাও ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। মহর্ষি গোতমও এ নিয়ম লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি স্বপ্রণীত ন্যায়দর্শনের প্রারম্ভেই দুঃখনিবৃত্তি ও নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তি এবং তাহার উপায়ানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, অতি সংক্ষেপে ও সহজ কথায় আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। দুঃখ ও তদুপশমাত্মক নিঃশ্রেয়সকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ॥" [ন্যায়সূত্র ১।১।২]

(১) পরীক্ষা অর্থ—প্রতিজ্ঞাত বিষয়গুলি জগতে আছে কি না, থাকিলেও, যে পদার্থ যে ভাবে বর্ণিত হইল, তাহা ঠিক সেইরূপই কি না, এবং উহাদের সংখ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধেও প্রকারান্তর থাকা সম্ভব কি না, এই সকল বিষয় আলোচনাপূর্ব্বক নিজের অভিমত পক্ষ সমর্থন ও সংস্থাপন করা। বিনা পরীক্ষায় কেহ কাহারো কথা গ্রহণ করিতে সম্মত হয় না, এইজন্য প্রতিজ্ঞাত বিষয়ে পরীক্ষার প্রয়োজন।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, জগতে দুঃখ বলিয়া কোনও পদার্থ নাই, অথবা উহা অপ্রিয় বা অনভিপ্রেত নহে, এ কথা বলিবার উপায় নাই; কারণ, দুঃখের অস্তিত্ব ও প্রতিকূলভাব কাহারো অবিদিত নহে; সুতরাং দুঃখের অস্তিত্ব ও অপ্রিয়ত্ব আর বিশেষ করিয়া প্রতিপাদনের আবশ্যক হয় না। ইহা প্রাণিমাত্রেরই সুপরিচিত ও স্বতঃসিদ্ধ। জগতে যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই দুঃখের প্রচণ্ড প্রতাপ পরিলক্ষিত হয়। ধনী দরিদ্র ও মূর্খ পণ্ডিতনির্ব্বিশেষে সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে ইহার তীব্রতা অনুভব করিয়াছে ও করিতেছে। এই দুঃখের তীব্র তাড়না যাহার হৃদয়ে নিতান্ত অসহনীয় বলিয়া অনুভূত হইতে থাকে, সেই সৌভাগ্যশালী পুরুষই এই দুঃসহ দুঃখাভিঘাত হইতে আত্মত্রাণে ব্যাকুল হইয়া উপযুক্ত উপায়ান্বেষণে প্রবৃত্ত হন। তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, এই বিষম দুঃখ-ব্যাধির প্রশমন করিতে হইলে রোগ-প্রত্যনীক চিকিৎসা করিলে চলিবে না, পরন্তু হেতু-প্রত্যনীক চিকিৎসা করিতে হইবে (১)। কাজেই তখন দুঃখের মূলানুসন্ধান করা তাহার অত্যাবশ্যক হয়।

দুঃখবাদ ও প্রতীকার চিন্তা।

প্রণিধান সহকারে বিচার করিয়া দেখিলে, বেশ বুঝিতে

(১) চিকিৎসা সাধারণতঃ দুই প্রকার—এক রোগ-প্রত্যনীক, দ্বিতীয় হেতুপ্রত্যনীক। তন্মধ্যে যাহা কেবল উপস্থিত রোগ-যাতনা নিবারণার্থ চিকিৎসা, তাহা রোগ-প্রত্যনীক; আর যাহা রোগের নিদান বা মূল কারণ নিবারণার্থ চিকিৎসা, তাহা হেতুপ্রত্যনীক।

পারা যায় যে, দুঃখ সম্বন্ধের যত প্রকার কারণ আছে, তন্মধ্যে দৃশ্যমান স্থূল শরীর-পরিগ্রহই সর্ব্ববিধ দুঃখের প্রধান কারণ। জগতে দুঃখরহিত কোন শরীরী দেখিতে পাওয়া যায় না ; দুঃখ যেন শরীরের চিরসহচর ; উহারা কেহই যেন পরস্পরকে ছাড়িয়া ক্ষণকালও থাকিতে নিতান্ত নারাজ। এই কারণে স্থূল শরীর-পরিগ্রহকেই (জন্ম ধারণকেই) দুঃখ ভোগের নিদান বলিয়া নির্দ্দেশ করা, বোধ হয়, কখনই অসঙ্গত হইতে পারে না।

অতঃপর শরীর-পরিগ্রহের নিদান পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, জীবের প্রবৃত্তিই উক্ত শরীর-পরিগ্রহের নিদান। প্রবৃত্তি অর্থ—শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান। স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মানুষ্ঠানেই জীবগণকে বিভিন্ন জগতে বিভিন্ন প্রকার শরীর-ধারণ করিতে বাধ্য করে। নিজ নিজ কর্ম্মানুসারেই যে, জীবগণের জন্ম ও ফল-ভোগের তারতম্য সংঘটিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র একমত হইয়া একই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রুতি বলিয়াছেন—

"তং বিদ্যা-কর্ম্মণী সমন্বারভেতে" [বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৬।৪।২] অর্থাৎ স্বোপার্জ্জিত জ্ঞান ও কর্ম্ম তাহার (মৃত ব্যক্তির) পশ্চাদনুসরণ করিয়া থাকে।

"তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি"
প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।
তস্মাৎ লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে॥"

[বৃহদারণ্যক ৪।৪।৬]

অর্থাৎ ভোগাসক্ত পুরুষ স্বীয় কর্ম্মের সহিত অনুরূপ জন্ম লাভ করিয়া থাকে। একথা কঠোপনিষদ্ আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—

"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥"

অর্থাৎ নিজ নিজ কর্ম্ম ও জ্ঞানানুসারে কোন কোন জীব শরীর ধারণের উদ্দেশ্যে জঙ্গমযোনি প্রাপ্ত হয়; কেহ কেহ বা স্থাবরদেহ অধিগত হয়। মনুসংহিতা এই বিষয়টীই কিঞ্চিৎ বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন—

"শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিযোনিতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্॥"

ইহা ভিন্ন আরও বহুতর প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে, যাহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, জীবগণের প্রাক্তন কর্ম্মরাশিই বর্ত্তমান জন্ম ও তদুপযোগী ভোগবৈচিত্র্যের একমাত্র কারণ।

উপরে যে, কর্ম্মকে জন্মের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল, তাহা নিষ্কাম কর্ম্ম নহে—সকাম কর্ম্ম। (১) কামনার বীজ হইতেছে দোষ। দোষ অর্থ—রাগ (অনুরাগ—ভালবাসা) ও দ্বেষ। এই রাগ ও দ্বেষই সকল জীবকে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মপথে প্রেরণা করে। জীবগণ কখনও প্রবল অনুরাগের বশে, কখনও বা দ্বেষের বশে ভাল মন্দ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এবং তাদৃশ কর্ম্মই

(১) নিষ্কাম কর্ম্মের ফল জন্ম নহে—চিত্তশুদ্ধি ও সংসারনিবৃত্তি।

জীবের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; সুতরাং রাগ ও দ্বেষই জীবগণের প্রবৃত্তিজনক প্রধান দোষ।

কথিত রাগ দ্বেষরূপ দোষও আবার মিথ্যাজ্ঞান-প্রসূত; মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রান্তিবুদ্ধি প্রবল হইলেই মানুষ অনিত্যকে নিত্য বলিয়া, অসত্যকে সত্য বলিয়া এবং অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া মনে করে, এবং সেই সমুদয় অযথাভূত বস্তুতেই যথাসম্ভব অনুরক্ত বা বিরক্ত হইয়া শুভাশুভ পথে পদার্পণ করিয়া থাকে। মহামতি বিজ্ঞানভিক্ষু একটী মাত্র শ্লোকে ইহা বিবৃত করিয়াছেন—

"রাগ-দ্বেষাদয়ো দোষাঃ সর্ব্বে ভ্রান্তিনিবন্ধনাঃ।
কার্য্যো হ্যস্য ভবেদ্দোষঃ—পুণ্যাপুণ্যমিতি শ্রুতিঃ॥

[সাংখ্যসার]

অর্থ—ভ্রান্তিজ্ঞান হইতেই রাগদ্বেষাদি দোষের উৎপত্তি; এবং উক্ত দোষনিচয়ের ফল— পুণ্য-পাপও দোষসংজ্ঞার অন্তর্ভূত।

সর্ব্বানর্থ বীজ এই মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রান্তিবুদ্ধি যতদিন অপনীত না হইবে, জীব শত চেষ্টায়ও ততকাল দুঃখধারার তীব্রাভিঘাত নিরুদ্ধ করিতে পারিবে না। কারণ অব্যাহত থাকিলে, কার্য্যোৎপত্তির বাধা করিবে কে? এই অভিপ্রায়েই মহর্ষি গোতম "দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ" বলিয়া নিদান-চিকিৎসার উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন যে,—

হে জীবগণ, তোমরা যদি দুঃসহ দুঃখ-যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাও, যদি কস্মিন্ কালেও ত্রিবিধ দুঃখ দর্শন করিতে ইচ্ছা

না কর, তাহা হইলে অগ্রে মিথ্যাজ্ঞানের—অনিত্য অনাত্মা দেহাদিগত নিত্যআত্মত্বাদি ভ্রান্তির নিরসনে যত্নপর হও। দুরন্ত মিথ্যাজ্ঞান বিদ্যমান থাকিলে, সে নিশ্চয়ই দুঃখসন্ততি প্রসব করিবেই করিবে। পক্ষান্তরে, মূল কারণ মিথ্যাজ্ঞান বিধ্বস্ত হইলে, তৎকার্য্য রাগদ্বেষাদি দোষরাশিও নিশ্চয়ই অন্তর্হিত হইবে; দোষরাশির অভাবে তদনুযায়ী কর্ম্মপ্রবৃত্তিও নিরস্ত হইবে; কর্ম্মবীজ বিনষ্ট হইলে, শুভাশুভ ফলভোগও অসম্ভব হইবে; ফলভোগ অসম্ভাবিত হইলে, তন্নিমিত্ত দেহধারণ বা জন্মপরিগ্রহেরও আর আবশ্যক হইবে না; দেহের অভাবে দুঃখভোগের সম্ভাবনা কোথায়? দেহই দুঃখ-ভোগের একমাত্র আশ্রয় স্থান; সুতরাং জন্মের অভাবে দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক অভাব অবশ্যম্ভাবী। এই কারণেই আচার্য্য গোতম দুঃখের কারণ-পরম্পরা প্রদর্শনচ্ছলে তদুচ্ছেদের উপায় নির্দ্ধারণেরও সুযোগ করিয়া দিয়াছেন।

ভ্রান্তি বা মিথ্যাজ্ঞানই যখন দুঃখভোগের মূল কারণ, তখন সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই উক্ত দুঃখ-ব্যাধি প্রশমনের অসাধারণ উপায়। অতএব দুঃখভোগে কাতরচিত্ত ব্যক্তিমাত্রেরই তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত। (১)

দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়-তত্ত্বজ্ঞান

(১) জগতে এরূপ কতকগুলি পদার্থ দৃষ্ট হয়, যাঁহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা চিরপ্রসিদ্ধ। উঁহারা কখনও কোথাও একসঙ্গে অবস্থান করে না। যেমন—শীত ও গ্রীষ্ম; সুখ ও দুঃখ; তেজঃ ও তিমির প্রভৃতি। তত্ত্বজ্ঞান আর ভ্রান্তিজ্ঞানও ঐ শ্রেণীর পদার্থ; জ্ঞান ও

জ্ঞানমাত্রেই প্রমাণ-সাপেক্ষ; প্রমাণের সাহায্য ব্যতীত কখনও কোন প্রকার প্রমা-জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী প্রমাণ ও প্রমেয় (জ্ঞাতব্য পদার্থ) নির্দ্দেশ করা আবশ্যক; তাই মহর্ষি গোতম প্রথমেই সে সকলের নাম নির্দ্দেশ করিতেছেন—

পদার্থ সংকলন

"প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-চ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ" ॥ ১ ॥ ১ ॥ ১ ॥

প্রমাণ, প্রমেয় (প্রতিপাদ্য বা জ্ঞেয়), সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান, এই ষোড়শ প্রকার পদার্থের তত্ত্ব বা যথার্থ স্বরূপ অবগত হইলেই জীব নিঃশ্রেয়স বা পরম মঙ্গল মুক্তিলাভে সমর্থ হয়।

অজ্ঞানের বিরোধিতা স্বভাবসিদ্ধ। এই কারণেই জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া যায়। কোন বিষয়ে ভ্রান্তিজ্ঞান উপস্থিত হইলে, যতক্ষণ তদ্বিষয়ে যথার্থজ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) উৎপন্ন না হয়, ততক্ষণ সেই ভ্রান্তি জ্ঞান অক্ষুন্নই থাকে। কারণ, তত্ত্বজ্ঞানই ভ্রান্তিজ্ঞান নিরাসের একমাত্র উপায়। মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন—

"নিয়তকারণাৎ তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ ॥" (সাংখ্যদর্শন ১।৫৬)

অর্থাৎ অন্ধকার নিবারণে আলোকই যেমন একমাত্র কারণ, তেমনি ভ্রান্তিজ্ঞান নিবৃত্তিতেও জ্ঞানই একমাত্র নিয়ত (অব্যভিচারী) কারণ। মহর্ষি গোতমও এইরূপ কার্য্য-কারণভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগিতা দেখাইয়াছেন।

মহর্ষি গোতম উক্ত ষোড়শ পদার্থের কেবল নাম নির্দ্দেশ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, তিনি পরিকল্পিত ষোড়শ পদার্থের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ দ্বারা ঐ সকল পদার্থের প্রকৃত স্বরূপও বুঝাইয়া দিয়াছেন, এবং বিবিধ যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে সে সমুদয় পদার্থের নির্দ্দেশানুযায়ী অস্তিত্বও সমর্থন করিয়াছেন (১)। আমরা ক্রমশঃ সে সমুদয় কথার আলোচনা করিব।

তত্ত্বজ্ঞান বস্তু-বিচার সাপেক্ষ; বস্তুবিচারও আবার প্রমাণ-

(১) ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ঋষি ন্যায়দর্শনের প্রতিপাদন প্রণালী অতি সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"ত্রিবিধা চাস্য শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিঃ—উদ্দেশঃ, লক্ষণং, পরীক্ষা চেতি। অত্র নামধেয়েন পদার্থমাত্রস্যাভিধানম্ উদ্দেশঃ। উদ্দিষ্টস্য তত্ত্বব্যবস্থাপকো ধর্ম্মঃ লক্ষণম্। লক্ষিতস্য—যথালক্ষণম্ উপপদ্যতে নবা ইতি প্রমাণৈরবধারণং পরীক্ষা। (১।১।৩))

এই গোতমীয় ন্যায় শাস্ত্রের উক্তিপ্রণালী তিন প্রকার (১) উদ্দেশ, (২) লক্ষণ ও (৩) পরীক্ষা। তন্মধ্যে প্রতিপাদ্য বিষয়ের যে, কেবল নাম-মাত্র নির্দ্দেশ, তাহার নাম উদ্দেশ। সেই উল্লিখিত পদার্থের যে, পদার্থান্তর হইতে বৈশিষ্ট্য বা পরিচয়কথন, তাহার নাম লক্ষণ। যাহার যেরূপ লক্ষণ বা পরিচয় প্রদান করা হয়, সেই পদার্থ যে, ঠিক সেইরূপই বটে, অন্য প্রকার নহে, উপযুক্ত যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা তাহার দৃঢ়তা সমর্থন করার নাম পরীক্ষা।

ইহা ন্যায়দর্শনের প্রতিপাদন-পদ্ধতি হইলেও, অন্য দর্শনেরও অনভিমত নহে; কারণ, যে কোন তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইলেই উক্ত তিনপ্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক হয়; নচেৎ কেবল নাম নির্দ্দেশ বা লক্ষণ প্রদর্শন দ্বারাই অভিমত তত্ত্বে বুদ্ধিমান্ লোকে সহজে আস্থা স্থাপন করেন না, বা করিতে পারেন না।

সাপেক্ষ। বিষয় না থাকিলে যেমন জ্ঞান ও বিচার হয় না; তেমনি প্রমাণ না থাকিলেও বস্তুসিদ্ধি (প্রমেয়ের অস্তিত্বসিদ্ধি) হয় না; এই জন্য বিষয় (প্রমেয়) নির্দ্দেশের পূর্ব্বে প্রমাণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হয়। এই কারণেই মহর্ষি গোতম প্রমেয় নির্দ্দেশের অগ্রেই প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা শিষ্টসম্মত পদ্ধতিও বটে। সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ স্বকৃত কারিকা মধ্যে—

সংকলিত পদার্থের পৌর্ব্বাপর্য্য

"প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি"

বলিয়া উক্ত পদ্ধতিরই অনুমোদন করিয়াছেন। দৃঢ়তর প্রমাণ ব্যতীত যখন কোন বিষয়েরই অস্তিত্ব অসন্দিগ্ধরূপে সিদ্ধ হইতে পারে না, তখন সর্ব্বাদৌ প্রমাণ নির্দ্দেশ করা যুক্তি-সম্মতও বটে।

জীবের চিরবাঞ্ছিত নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হইতেছে তত্ত্বজ্ঞান। সেই তত্ত্বজ্ঞান যেরূপই হউক না কেন, বিজ্ঞেয় বিষয় ব্যতীত তাহা কখনই আত্মলাভ করিতে পারে না। অতএব সূত্রের প্রথমে তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী প্রমেয় বা বিষয় নির্দ্দেশ করাই উচিত ছিল সত্য; কিন্তু তাহা হইলেও, প্রমেয়-নির্ণয় যখন প্রমাণের অধীন,—যতক্ষণ নির্দ্দোষ প্রমাণ দ্বারা বস্তুসত্তা অবধারিত না হয়, ততক্ষণ তাহা কখনই বস্তুরূপে প্রমেয়শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না; তখন প্রমেয়-নির্দ্দেশের অগ্রে প্রমাণের নির্দ্দেশ নিশ্চয়ই অসঙ্গত হয় নাই; বরং সমধিক শোভনই (সমীচীনই) হইয়াছে।

'তাদের পর, সংশয় না থাকিলে নির্ণয় বা সিদ্ধান্তের আবশ্যক হয় না'; এবং বিনা প্রয়োজনে নির্ণয়ের প্রয়াসও সম্পূর্ণ বাতুল-চেষ্টার ন্যায় উপেক্ষণীয় হয়; এই কারণে প্রমেয়ের পরই সংশয় ও প্রয়োজনের নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হইয়াছে। কোন সন্দিগ্ধ বিষয় অপরকে বুঝাইতে হইলেই অগ্রে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন, পশ্চাৎ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে হয়; ইহাই ন্যায়-সম্মত নিয়ম। এই কারণে প্রয়োজনের পরেই দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রকার কার্য্য-কারণভাবের পৌর্ব্বাপর্য্য মনস্থ করিয়াই সূত্রমধ্যে অপরাপর পদার্থেরও (প্রমেয়েরও) পর পর নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

প্রথম সূত্রে, যে ষোড়শ পদার্থ পরিগণিত হইয়াছে, এখন একে একে সে সমুদয়ের লক্ষণ নির্দ্দেশ বা পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক হইয়াছে। তদনুসারে প্রথমেই প্রমাণের লক্ষণ বলা হইতেছে—

"প্রত্যক্ষানুমানোপমানাগমাঃ প্রমাণানি" ॥ ১। ১। ৩ ॥

অর্থাৎ প্রাগুক্ত ষোড়শ পদার্থ নির্ণয়োপযোগী প্রমাণ চারি প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আগম (শব্দ)।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, সমস্ত হিন্দুদর্শনেরই উদ্দেশ্য বা চরম লক্ষ্য এক; কিন্তু উদ্দেশ্য এক হইলেও তৎসিদ্ধির উপায় সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। প্রায় সকল দার্শনিকই নিজ নিজ রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে বিভিন্ন প্রকার সাধনা-প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন। তদনুসারে দার্শনিক প্রমাণ ও প্রমেয় সম্বন্ধে

যথেষ্ট পার্থক্য সংঘটিত হইয়াছে। তাহার ফলে, প্রমেয়সংখ্যা (প্রতিপাদ্য পদার্থের সংখ্যা) এক হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত, এবং প্রমাণের সংখ্যা এক হইতে দশ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছে (১)।

মহর্ষি গোতমের মতে তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ীভূত পদার্থ সংখ্যা যেমন ষোলটীর ন্যূনাধিক নহে, তেমনি পদার্থ-নির্ণায়ক প্রমাণ-সংখ্যাও চারিটীর কম বেশী নহে।

বুঝিতে হইবে, উক্ত চতুর্ব্বিধ প্রমাণ ব্যতীত কথিত ষোড়শ পদার্থের অস্তিত্ব নির্ণীত হয় না; পক্ষান্তরে, উক্ত ষোড়শ পদার্থ-

---

(১) পদার্থসংখ্যা কপিল ও পতঞ্জলির মতে পঁচিশ, গোতমের মতে ষোড়শ, কণাদের মতে সপ্ত, বেদান্তমতে এক। প্রমাণের সম্বন্ধে এইরূপ বিভাগ সংকলিত হইয়াছে—

প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদ-সুগতৌ পুনঃ।
অনুমানং চ তচ্চাপি সাংখ্যাঃ শব্দং চ তে উভে॥
ন্যায়ৈকদেশিনস্ত্বাবদুপমানং চ তাপ্যপি।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহুঃ প্রভাকরাঃ॥
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি ইতি পৌরাণিকা জগুঃ॥”

চার্ব্বাকের মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। কণাদ ও বৌদ্ধবিশেষের মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান; সাংখ্যমতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ; নৈয়ায়িকের (গোতমের) মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ও উপমান; প্রভাকরমতে এতদতিরিক্ত অর্থাপত্তিও পঞ্চম প্রমাণ; ভট্ট ও বৈদান্তিকমতে এতদতিরিক্ত অনুপলব্ধিও একটী প্রমাণ, এবং পৌরাণিক মতে সম্ভব ও ঐতিহ্য নামে আরও দুইটী প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে।

সমর্থনের জন্য কথিত চারিটী প্রমাণের অতিরিক্ত কোন প্রমাণ কল্পনা করিবারও আবশ্যক হয় না ; সুতরাং তত্ত্ব-নিরূপণের পক্ষে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আগম, এই চারিপ্রকার প্রমাণই যথেষ্ট (১)।

উল্লিখিত চতুর্বিবধ প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, অপর ত্রিবিধ প্রমাণের মূল, এবং সর্ব্ববাদি-সম্মত ; (২) এইজন্য সূত্রকার প্রথমেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন—

(১) লক্ষণ রচনার সাধারণ নিয়ম এই যে, অগ্রে সাধারণ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া পশ্চাৎ তাহার বিশেষ লক্ষণ ও বিভাগাদি নির্দ্দেশ করিতে হয়। এখানে প্রথমেই প্রমাণের বিভাগ নির্দ্দেশ করায় সে নিয়ম ভগ্ন হইতেছে ; তজ্জন্য সূত্রস্থ এক 'প্রমাণ' শব্দকেই লক্ষ্য ও লক্ষণ, এতদুভয়ার্থে প্রযুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। সংজ্ঞা অর্থে 'প্রমাণ' শব্দটী লক্ষ্য, আবার 'প্রমীয়তেঽনেনেতি' অর্থাৎ যাহা দ্বারা প্রমাজ্ঞান হয়—এই প্রকার যোগার্থানুসারে ঐ প্রমাণ শব্দই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ বা সাধারণ পরিচায়করূপে গৃহীত হয় ; সুতরাং সূত্রস্থ 'প্রমাণ' পদদ্বারাই প্রমাণের সামান্যভাবে পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বিভাগ ও বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হয় নাই।

(২) প্রত্যক্ষ ব্যতীত ব্যাপ্তিজ্ঞান বা সাধ্য-সাধনভাব কিছুই নির্ণীত হয় না ; এবং প্রত্যক্ষ ব্যতীত উপমান-উপমেয়ভাবও কল্পনা করা যায় না ; তাহার পর, প্রত্যক্ষ ব্যবহার না থাকিলে প্রথমে, কোন শব্দে কিরূপ অর্থ বুঝায়, তাহাও জানিতে পারা যায় না ; এই কারণে প্রত্যক্ষ প্রমাণকে সমস্ত প্রমাণের মূল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

"ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্" ॥ ১ । ১ । ৪ ॥

চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় শব্দাদি বাহ্য বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া, যে জ্ঞান সমুৎপাদন করে, তাহার নাম প্রত্যক্ষ জ্ঞান। বিশেষ এই যে, শব্দজন্য জ্ঞানের ন্যায় ইহা ব্যপদেশ্য নহে; অর্থাৎ শব্দ দ্বারাই শাব্দ জ্ঞানের নির্দ্দেশ হইয়া থাকে, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সেরূপ নির্দ্দেশ বা অভিব্যক্তি করা কখনও সম্ভবপর হয় না।

ভ্রম ও সংশয়স্থলে কখন কখন জ্ঞাত বিষয়ের ব্যভিচার বা পরিবর্ত্তনও ঘটিয়া থাকে, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান চিরদিনই অব্যভিচারী, অর্থাৎ প্রথম জ্ঞানকালে যে বিষয় যেরূপে অনুভূত হয়, পরেও সে বিষয় সেইরূপেই থাকে; কখনও তাহার অন্যথা প্রতীতি হয় না। বিষয়ের অন্যথাত্ব হইলে তাহা কখনই প্রত্যক্ষ প্রমাণমধ্যে গণ্য হইতে পারে না। সংশয়স্থলে একাধিক বস্তুও জ্ঞানের বিষয় হয়; সুতরাং সেখানে 'ইদমিত্থমেব' অর্থাৎ ইহা এইরূপই বটে, ইত্যাকার নিশ্চয়বুদ্ধি থাকে না; কিন্তু প্রত্যক্ষস্থলে ঐরূপ নিশ্চয়-বোধ থাকা একান্ত আবশ্যক; এবং তাহাই যথার্থ প্রমা (১)। অতঃপর অনুমানের লক্ষণ বা স্বরূপ পরিচয়াদি আলোচিত হইতেছে—

(১) সাধারণতঃ অনুমানাদি প্রমাণস্থলে বিজ্ঞেয় বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সংযোগ আবশ্যক হয় না, বরং বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগ সে সমুদয় জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী। যেমন, পর্ব্বতে ধূমদর্শনে অদৃশ্য বহ্নিরই অনুমান

[অনুমান]

প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষের পরেই অনুমানের স্থান। অনুমান প্রমাণ স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষমূলক হইলেও, স্থলবিশেষে নির্দ্দোষ অনুমান দ্বারা প্রত্যক্ষেরও ভ্রান্তি বা অযথার্থতা প্রমাণিত হইয়া থাকে (১)। ব্যবহারজগতে অনুমানের প্রাধান্য সর্ব্ববাদিসম্মত। অনুমানের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন মানবই কর্ত্তব্যপথে এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। যাহারা অনুমান প্রমাণের প্রাধান্য স্বীকারে

করা হয়; কিন্তু সেই বহ্নি যদি প্রত্যক্ষ-গোচরই থাকে, তবে প্রকৃতিস্থ কোন লোকই তদ্বিষয়ে আর অনুমান করিতে সমুৎসুক হয় না।

তাহার পর, প্রত্যক্ষ ভ্রমের স্থলে প্রকৃতপক্ষে দৃশ্য বিষয়ই বিদ্যমান থাকে না। কেবল দোষবশতঃ অবিদ্যমান বস্তুও বিদ্যমানের ন্যায় প্রতীত হয় মাত্র; সুতরাং সেখানেও প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞেয় বিষয়ের সহিত মোটেই ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ থাকে না। এই অভিপ্রায়েই প্রত্যক্ষের লক্ষণে 'অব্যভিচারী' বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে।

(১) আমরা সকলেই সূর্য্যকে ক্ষুদ্রায়তন প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, কিন্তু অনুমানের সাহায্যে জানি—সূর্য্য ক্ষুদ্রায়তন নহে—অতি মহান্, পৃথিবী অপেক্ষাও বহুলক্ষগুণ বৃহৎ। এখানে নির্দ্দোষ অনুমান দ্বারা সদোষ প্রত্যক্ষ বাধিত হইয়া থাকে। এখানে অনুমানই বলিয়া দেয়, যে, অতি দূরত্ব দোষে তোমরা অত বড় সূর্য্যকেও ক্ষুদ্র বলিয়া দেখিতেছ সত্য, কিন্তু তোমাদের এই প্রত্যক্ষ সত্য নহে, ভ্রম।

'অনুমান' শব্দ কখনও জ্ঞানে, কখনও বা তৎসাধন প্রমাণেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কোথায় কোন অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা সাধারণতঃ প্রস্তাবানুসারেই বুঝিতে

নিতান্ত নারাজ, তাহাদের (নাস্তিক প্রভৃতির) পক্ষে দৈনন্দিন ব্যবহার নিষ্পাদন করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। (২)

অনুমান প্রমাণে প্রধানতঃ হেতু, সাধ্য ও পক্ষ, এই তিনটী বিষয় থাকা আবশ্যক হয়। তন্মধ্যে যাহা দ্বারা অনুমান করা হয়, তাহার নাম হেতু, যাহার সম্বন্ধে অনুমান করা হয়, তাহার নাম সাধ্য, আর যাহাতে বা যে অধিকরণে সাধ্য পদার্থের সদ্ভাব অনুমিত হয়, তাহার নাম পক্ষ। যেমন 'এই পর্ব্বতটী বহ্নি-বিশিষ্ট, যেহেতু ইহাতে ধূম দেখা যাইতেছে' (পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ), এইস্থলে ধূম হইতেছে হেতু, বহ্নি হইতেছে সাধ্য, আর পর্ব্বত হইতেছে পক্ষ।

সাধারণতঃ হেতু অপেক্ষা সাধ্য পদার্থটী (যাহা প্রমাণিত করিতে হইবে, তাহা) হয় ব্যাপক—হেতু অপেক্ষা অধিক স্থানবর্ত্তী। হেতু হয় তাহার ব্যাপ্য অর্থাৎ সাধ্য অপেক্ষা

(২) মনে করুন, মা কিংবা তথাবিধ কেহ যখন আমাদিগকে কোন খাদ্য বস্তু ভোজন করিতে দিয়া থাকেন, তখন উহা বিষমিশ্রিত কি না, তাহা পরীক্ষা না করিয়াই স্বচ্ছন্দচিত্তে আমরা ভোজন করিতে থাকি ; কেন না, মাতা কখনই বিষমিশ্রিত অন্ন প্রদান করিতে পারেন না। এই প্রকার অনুমানই আমাদের ঐ প্রকার ভোজনে প্রবৃত্তির কারণ হয়। দ্বিতীয়তঃ গুরু যখন শিষ্যকে উপদেশ দেন, তখন শিষ্যের মনোগত বোধ, অবোধ বা সংশয় প্রভৃতি ভাব তাহার মুখভঙ্গী ও বাক্য ভঙ্গী দ্বারাই অনুমান করিয়া থাকেন। অতএব অনুমান প্রমাণ স্বীকার না করিলে আমাদের সমস্ত ব্যবহারই অচল হইয়া পড়ে।

অল্পস্থানবর্ত্তী ফল কথা, হেতু-পদার্থটী চিরদিনই সাধ্য অপেক্ষা ন্যূন্য দেশে কিংবা অনধিক দেশে (অন্ততঃ সাধ্যের সমস্থানবর্ত্তী) থাকিতে বাধ্য ; হেতু কখনই সাধ্য অপেক্ষা বেশী স্থানে থাকিতে পারে না ; থাকিলে সে হেতু ব্যভিচারী'দুষ্ট হেতু নামে অভিহিত হয়। (১)

পক্ষ

যাহার উপর (যে অধিকরণে) কোনও সন্দিগ্ধ বা অসিদ্ধ (অনির্দ্ধারিতরূপ) বিষয়ের সদ্ভাব (অস্তিত্ব) সাধন করা হয়, তাহার নাম 'পক্ষ'। এই সাধন কার্য্যটী ইচ্ছা-পূর্ব্বকই হউক, আর অনিচ্ছাপূর্ব্বকই (হঠাৎই) হউক, তাহাতে কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সাধ্য বিষয়ে সন্দেহ বা অসিদ্ধতা থাকিলেই যথেষ্ট হয়। (২)।

---

(১) ব্যাপ্য ও ব্যাপকের সাধারণ বা সহজ লক্ষণ এই :—"অধিক দেশবৃত্তিত্বং ব্যাপকত্বম্ (অপেক্ষাকৃত অধিক স্থানবর্ত্তিত্বই ব্যাপকত্ব), আর "ন্যূনদেশবৃত্তিত্বং ব্যাপ্যত্বম্" (সাধ্য অপেক্ষা অল্পস্থানবর্ত্তিত্বই ব্যাপ্যত্ব)। কিন্তু এ লক্ষণ দ্বারা সর্ব্বস্থানের উপপত্তি হয় না। এইজন্য উহার বিশেষ লক্ষণ আবশ্যক হয়, তাহা এইরূপ :—

"তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকধর্ম্মবত্ত্বম্ ব্যাপকত্বম্" আর "তদভাবব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিত্বং ব্যাপ্যত্বম্"।

তাৎপর্য্যার্থ—ব্যাপ্য পদার্থটী যতস্থানে থাকে, তাহার কোথাও যাহার অভাব থাকে না, তাহা হয় ব্যাপক ; আর উভয়ের মধ্যে যাহার অভাব ব্যাপক হয়, অর্থাৎ অধিক স্থানবর্ত্তী হয়, তাহা হয় ব্যাপ্য। ব্যাপ্য দ্বারা ব্যাপকের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়।

(২) এই জন্য 'পক্ষের' পরিচয়ার্থ বলা হইয়া থাকে যে, "সন্দিগ্ধ-সাধ্যবান্—পক্ষঃ", আর "নিশ্চিতসাধ্যবান্—সপক্ষঃ।"

উক্ত অনুমিতি জ্ঞান প্রধানতঃ ব্যাপ্তিজ্ঞান সাধ্য; সুতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমিতি প্রমার যথার্থ করণ—অনুমান। ব্যাপ্তি অর্থ—হেতুরূপে কল্পিত পদার্থটী যতগুলি স্থান অধিকার করিয়া থাকে, তাহার কোথাও যাহার (সাধ্যের) অভাব থাকা কখনও সম্ভব হয় না, তথাবিধ সাধ্য পদার্থের সহিত যে, তথাবিধ হেতুর সামানাধিকরণ্য বা একাধিকরণে অবস্থান, তাহার নাম ব্যাপ্তি। ইহারই নাম অনুমান প্রমাণ। (১)

ব্যাপ্তি

এই যে, হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবরূপ সম্বন্ধ (ব্যাপ্তি), তাহা দুই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে। এক অন্বয়রূপে, অপর ব্যতিরেকরূপে। তদনুসারে ব্যাপ্তিও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক অন্বয়ব্যাপ্তি, দ্বিতীয় ব্যতিরেকব্যাপ্তি। যেখানে হেতু সত্তা দ্বারা সাধ্যসত্তা অনুমিত হয়, সেখানকার ব্যাপ্তিকে বলে

অন্বয় ও ব্যতিরেক ব্যাপ্তি

---

(১) ব্যাপ্তি দুইপ্রকার, এক সমব্যাপ্তি, অপর বিষমব্যাপ্তি। যেখানে হেতু ও সাধ্য দুই পদার্থই সমনিয়তবৃত্তি হয়, অর্থাৎ কেহও কাহাকে ছাড়িয়া থাকে না—উভয়ই সমদেশবর্ত্তী হয়, সেখানকার ব্যাপ্তিকে 'সমব্যাপ্তি' কহে। যেমন গন্ধ ও পৃথিবী, এবং চন্দন ও সৌরভ। গন্ধ কখনও পৃথিবী বা পার্থিব পদার্থ ছাড়িয়া অন্যত্র থাকে না; এবং পৃথিবীও কখনই গন্ধশূন্য হইয়া থাকে না। এই প্রকার, চন্দনও সৌরভশূন্য হয় না, এবং সৌরভও কখনই চন্দন ছাড়িয়া থাকে না। এই জাতীয় ব্যাপ্তির নাম সমব্যাপ্তি। কিন্তু বিষম ব্যাপ্তিস্থলে হেতু ও সাধ্যের সমনিয়ত দেশস্থিতি সর্ব্বদা ঘটে না। যেমন ধূম ও বহ্নি। এস্থলে ধূম বহ্নি ছাড়িয়া

অন্বয়ব্যাপ্তি। যেমন ধূমের সত্তায় বহ্নির অনুমিতি। কার্য্য দ্বারা কারণানুমিতি-স্থলেই প্রায়শঃ অন্বয় ব্যাপ্তির ব্যবহার হইয়া থাকে। অন্বয় ব্যাপ্তির আকার এই প্রকার—'যো যো ধূমবান্, স বহ্নিমান্' অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধূম আছে, সেই সেই স্থানেই বহ্নি আছে। এইরূপে কল্পিত নিয়মের কোথাও ব্যভিচার বা অন্যথা হইলেই ব্যাপ্তি অসিদ্ধ (দুষ্ট) হইবে; দুষ্ট ব্যাপ্তি অবশ্য ত্যাজ্য।

যেখানে সাধ্যের অভাব বা অসত্তা দ্বারা সাধনের (হেতুর) অভাব বা অসত্তা কল্পিত হয়, সেখানকার ব্যাপ্তির নাম ব্যতিরেক ব্যাপ্তি। ইহার আকার এইরূপ—'যো ন বহ্নিমান্, স ন ধূমবান্' অর্থাৎ যেখানে বহ্নি নাই, সেখানে ধূমও নাই ইত্যাদি।

যেখানে অন্বয় ও ব্যতিরেক—উভয় প্রকার দৃষ্টান্তই মিলে, সেখানে উক্ত উভয় প্রকার ব্যাপ্তিই কল্পিত হইয়া থাকে (১)। আর তাহা সম্ভব না হইলে কোথাওবা কেবলই অন্বয়ব্যাপ্তি, কোথাওবা কেবলই ব্যতিরেকব্যাপ্তি কল্পিত হইয়া থাকে। ফল কথা, যেখানে অন্বয় ভিন্ন ব্যতিরেকে কোন দৃষ্টান্তই মিলে না,

---

না থাকিলেও, বহ্নি কিন্তু ধূম ছাড়িয়াও বহু স্থানে থাকে। তপ্ত লৌহে বহ্নি থাকে সত্য, কিন্তু ধূম তাহাতে থাকে না; এই জাতীয় স্থানের ব্যাপ্তিকে বিষম ব্যাপ্তি বলে।

(১) হেতু ও সাধ্যের যে, এইরূপ সহচার দর্শন, তাহা যে, কতবার হওয়া আবশ্যক, সে বিষয়ে কোনও নিয়ম নাই। তবে, সাধারণতঃ ভূয়োদর্শন দ্বারাই ঐরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চিত হইয়া থাকে। ফল কথা, উহা দ্রষ্টার বোধশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

সেখানে কেবলই অন্বয়ব্যাপ্তি দ্বারা, আর যেখানে ব্যতিরেক ভিন্ন অন্বয়ে দৃষ্টান্ত মোটেই পাওয়া যায় না, সেখানে কেবলই ব্যতিরেক ব্যাপ্তি দ্বারা, আর যেখানে উভয় প্রকারেরই দৃষ্টান্ত মিলে, সেখানে অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয় প্রকার ব্যাপ্তি দ্বারাই কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। এতদনুসারে অনুমানের তিন প্রকার বিভাগ কল্পিত হইয়া থাকে। যথা—কেবলান্বয়ী, কেবল ব্যতিরেকী ও অন্বয়-ব্যতিরেকী। (১)

(১) 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই প্রসিদ্ধ উদাহরণ স্থলে অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয় প্রকার ব্যাপ্তি কল্পনাই সম্ভব হয়। কেন না, 'যো যো ধূমবান্, স স বহ্নিমান্, যথা মহানসং', অর্থাৎ যাহা যাহা ধূমবিশিষ্ট, সে সমস্তই বহ্নিবিশিষ্ট হয়, যেমন রন্ধনগৃহ; এইরূপে অন্বয়মুখে, এবং 'যো ন বহ্নিমান্, ন স ধূমবান্, যথা জলহ্রদঃ' অর্থাৎ যাহা বহ্নিযুক্ত নয়, তাহা ধূমযুক্তও নয়; যেমন জলহ্রদ, এইরূপে ব্যতিরেকমুখেও ব্যাপ্তি সংকলন করা যাইতে পারে। আর 'সর্ব্বং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' সমস্ত বিষয়ই বচনের যোগ্য, যেহেতু উহারা জ্ঞেয়। এস্থলে জ্ঞেয়ত্বের অভাব কোথাও না থাকায় 'যৎ ন বাচ্যং, তৎ ন জ্ঞেয়ম্' অর্থাৎ যাহা বচনের যোগ্য নয়, তাহা জ্ঞানের বিষয়ও নয়, এরূপ দৃষ্টান্ত অসম্ভব হওয়ায় কেবলই অন্বয়মুখে 'যৎ যৎ জ্ঞেয়ং, তৎ তৎ বাচ্যম্' অর্থাৎ যাহা যাহা জ্ঞানের বিষয়, তৎসমস্তই বচনের যোগ্য, এইরূপে ব্যাপ্তি রচনা করিতে হয়। আর 'পৃথিবী ইতরভিন্না গন্ধবত্ত্বাৎ অর্থাৎ পৃথিবী আকাশাদি চারি ভূত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, এস্থলে গন্ধ থাকিলেই যে, অপর চারি ভূত হইতে স্বতন্ত্র হইবে, তাহার দৃষ্টান্ত কোথাও নাই; কারণ, এই পৃথিবী ছাড়া আর একটা পৃথিবী প্রসিদ্ধ নাই, যাহা দৃষ্টান্তরূপে ধরা যাইতে পারে; কাজেই এখানে কেবলই ব্যতিরেকভাবে 'যৎ নৈবং, তৎ নৈবং'

মানুষ প্রথমে কোথাও কোনও দুইটী পদার্থের সাহচর্য্য দর্শন করে। সেই সাহচর্য্য দর্শন করিয়া যখন—বুঝিতে পারে যে, ইহাদের মধ্যে, একটী থাকিলে অপর বস্তুটী নিশ্চয়ই থাকে। পক্ষান্তরে, অপর বস্তুটী না থাকিলে এটী কোথাও থাকে না বা থাকিতে পারে না—এতদুভয়ের মধ্যে একটা অব্যভিচারী সম্বন্ধ রহিয়াছে; তখন ঐ উভয় বস্তুর অর্থাৎ হেতু ও সাধ্যের মধ্যে একটা ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিবোধ স্থিরতর করিয়া লয়। পরে সেই লোকই যখন অন্যত্র কেবল সেই ব্যাপ্য বস্তুটী মাত্র দর্শন করে, তখন তাহার হৃদয়-নিহিত সেই ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব-বিষয়ক সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, অর্থাৎ সেই পুরাতন ব্যাপ্তির স্মরণ হয়। তাহার পরে, সেইস্থানে ঐ দৃষ্ট বস্তুর ব্যাপক বস্তুটীর—যাহার অভাবে এই বস্তুটী (হেতু পদার্থটী) থাকিতেই পারে না, সেই সাধনীয় বস্তুটীর অস্তিত্ব অনুমিত হয়।

ব্যাপ্তি গ্রহের উপায়

অনুমিতির ক্রম এইরূপ—প্রথমে হেতুদর্শন, পরে ব্যাপ্তিস্মরণ, অনন্তর সেই ব্যাপ্য হেতু পদার্থটীর সম্মুখস্থ 'পক্ষে'— যাহার উপর সাধ্য পদার্থটীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় ছিল, সেই স্থানে বা আশ্রয়ে বিদ্যমানতা নিশ্চয়, তাহার পর, প্রকৃত বিষয়ে অনুমিতি-জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। ন্যায়দর্শনকার উপরি উক্ত অনুমানকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

অর্থাৎ যাহা পৃথিবী নয়, তাহা গন্ধযুক্তও নয়, এইপ্রকার ব্যাপ্তি কল্পনা করিতে হয়, অতএব ইহাকে 'কেবল ব্যতিরেকী' বলা হইয়া থাকে।

"অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং—পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টং চ॥" ১।১।৫॥

(অথ—অনন্তর—প্রত্যক্ষের পর) তৎপূর্ব্বকং (প্রত্যক্ষ-পূর্ব্বক), ত্রিবিধ (তিন প্রকার) অনুমানং (অনুমান প্রমাণ)।

অনুমানের বিভাগ

পূর্ব্ববৎ (কারণলিঙ্গক), শেষবৎ (কার্য্য-লিঙ্গক) সামান্যতো দৃষ্টং (কার্য্য-কারণ ভিন্ন উপায়ে কল্পিত)। অনুমান সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ-মূলক—প্রত্যক্ষ-প্রমাণ হইতেই প্রধানতঃ উহার জন্ম হয়; কাজেই অনুমানকে 'তৎপূর্ব্বকং' (প্রত্যক্ষ-মূলক) বলা হইয়াছে। (১) অনুমান শব্দের যদি অনুমিতি জ্ঞানমাত্র অর্থ ধরা যায়, তাহা হইলে 'তৎপূর্ব্বকং' কথার অর্থ হইবে ব্যাপ্তিজ্ঞানপূর্ব্বক। কারণ, ব্যাপ্তিজ্ঞান বা হেতুসাধ্যের সামানাধিকরণ্য-জ্ঞান হইতেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুমিতির জন্ম হইয়া থাকে।

উক্ত অনুমান তিনপ্রকার—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। তন্মধ্যে—কারণমাত্রই কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া থাকে;

পূর্ব্ববৎ

সেই কারণ-দর্শনে যে, তৎকার্য্যের অনুমান, তাহার নাম 'পূর্ব্ববৎ'। যেমন—গভীর নীলবর্ণ মেঘ-দর্শনে অচিরভাবী বৃষ্টির অনুমান।

এখানে, তাদৃশ মেঘ হইতেছে কারণ, আর বৃষ্টি হইতেছে

(১) প্রত্যক্ষের পরে হয় বলিয়াই এই প্রমাণের নাম হইয়াছে—'অনুমান'। 'অনু' অর্থ—পশ্চাৎ; 'মান' অর্থ—প্রমাজ্ঞানের সাধন প্রমাণ। অতএব সূত্রে অনুমানকে 'তৎপূর্ব্বকং' বলিয়া বিশেষিত করা খুবই সঙ্গত হইয়াছে।

তাহার কার্য্য বা ফল। বহুবার ঐ প্রকার মেঘ হইতে বৃষ্টি দর্শনের ফলে, তাদৃশ মেঘ ও বৃষ্টির মধ্যে যে, একটা অব্যভিচারী কার্য্য-কারণভাব সম্বন্ধরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ক বোধজ সংস্কারও নিশ্চয়ই দ্রষ্টার হৃদয়ে নিঃসংশয়িতরূপে নিবদ্ধ ছিল। এখন মেঘ-দর্শনে হৃদয়নিহিত সেই ব্যাপ্তি-সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া অচিরভাবী বৃষ্টির অনুমান ঘটাইল। এই জাতীয় সমস্ত অনুমানই 'পূর্ব্ববৎ' অনুমানের অন্তর্গত।

দ্বিতীয় ভেদ 'শেষবৎ'। কারণ অপেক্ষা পরবর্ত্তী বিধায় কার্য্যকে 'শেষ' বলিতে হয়। সেই কার্য্যরূপ শেষ বস্তুটী যেখানে হেতুরূপে কল্পিত হয়, এবং সেই কার্য্য দ্বারা যে, তৎকারণের অনুমান করা হয়, তাহার নাম 'শেষবৎ'। যেমন—অকস্মাৎ নদীর জলবৃদ্ধি ও বেগদর্শনে অতীত বৃষ্টির অনুমান।

এখানে বৃষ্টি হইতেছে কারণ, আর জলের স্রোতোবৃদ্ধি হইতেছে তাহার কার্য্য বা ফল; সুতরাং নদীর জল-বেগবৃদ্ধি দর্শনে যে, অতীত বৃষ্টির অনুমান হইল, তাহা 'শেষবৎ' অনুমানেরই অন্তর্গত হইল। এইজাতীয় সমস্ত অনুমানই 'শেষবৎ' অনুমানের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অতঃপর সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের কথা। যাহা কখনও প্রত্যক্ষগোচর হয় নাই বা হইবার সম্ভাবনাও নাই, কেবল সাধারণ নিয়মানুসারে অর্থাৎ সামান্যভাবে ব্যাপ্তিজ্ঞানের সাহায্যে যে, তদ্বিষয়ক অনুমান, তাহার নাম সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। যেমন, চন্দ্র ও সূর্য্যের উদয়াস্তদর্শনে তাহাদের গতির অনুমান। এস্থলে চন্দ্র ও সূর্য্যের গতি সাধারণ

সামান্যতোদৃষ্ট

চক্ষুর অগোচর হইলেও, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের সাহায্যে, বুঝিতে পারা যায়। কেন না, গতি ব্যতিরেকে একস্থানের বস্তু কখনও অন্য স্থানে যাইতে পারে না; গমনের দ্বারাই একস্থানের বস্তুর স্থানান্তর-সম্বন্ধ ঘটিয়াথাকে। ইহা সর্ব্বত্র দৃষ্ট ও অবিসংবাদিত। তদনুসারে পূর্ব্বদিকের সূর্য্য ও চন্দ্রকে যখন পশ্চিম দিকে উপস্থিত দেখা যায়, তখন, উহাদের গতি প্রত্যক্ষ না হইলেও অনুমান দ্বারা জানা যায় যে, উহাদের যে, অপরদিক্-প্রাপ্তি, তাহা নিশ্চয়ই গতি-পূর্ব্বক। সূর্য্য ও চন্দ্র গতিশীল না হইলে কখনই তাহারা পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিম দিকে উপস্থিত হইতে পারিত না; সুতরাং উহাদেরও নিশ্চয়ই গতি আছে।

সাধারণতঃ অতীন্দ্রিয় বস্তুবিষয়ে যত অনুমান, প্রায় সমস্ত অনুমানই এই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের অন্তর্গত হইয়া থাকে। কিন্তু সমস্ত অনুমানেই ব্যাপ্তিনিশ্চয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। ব্যাপ্তির কোন অংশে ভুল থাকিলে সমস্ত অনুমানটাই ভুল হইয়া যায়। সেই জন্য 'ব্যাপ্তি-পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। সে সব কথা পরে 'পরার্থানুমান' প্রসঙ্গে বলা হইবে। (১)

(১) উক্ত তিন প্রকার অনুমানের অন্য প্রকার ব্যাখ্যাও হইতে পারে। তাহা এই প্রকার—

(ক) 'পূর্ব্ববৎ' অর্থ—ঠিক পূর্ব্বের মত। উভয় পদার্থের (হেতু ও সাধ্যের) ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব নিশ্চয়ের কালে (ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের সময়ে)

স্বার্থ ও পরার্থভেদে উক্ত অনুমানের আরও দুইটী বিভাগ প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে সন্দিগ্ধ বিষয়ে আত্ম-প্রতীতির জন্য যে,

যে প্রকার হেতু ও সাধ্য দৃষ্ট হয়, পরে যদি ঠিক সেই প্রকারের হেতু দেখিয়া ঠিক সেই প্রকার সাধ্যেরই অনুমান করা যায়, তাহা হইলে, ঐ অনুমান—পূর্ব্ব-দৃষ্ট বস্তুর অনুরূপ বস্তুবিষয়ক হওয়ায় 'পূর্ব্ববৎ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যেমন—রন্ধন গৃহে যখন ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তখন ধূম ও বহ্নি উভয়ই প্রত্যক্ষ-গোচর ছিল। পরে, পর্ব্বত মধ্যে ঐ জাতীয় ধূম দর্শন করিয়াই পূর্ব্বদৃষ্ট—রন্ধন গৃহস্থিত বহ্নিরই অনুরূপ বহ্নির অনুমান করা হইল। উপস্থিত ধূম ও বহ্নি উভয়ই পূর্ব্বদৃষ্ট ধূম ও বহ্নির অনুরূপ; সুতরাং সেই ধূমদর্শনে যে, সেইরূপ বহ্নির অনুমান, তাহা—পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর মত বস্তুবিষয়ক হওয়ায় 'পূর্ব্ববৎ' নামে অভিহিত হইল।

(খ) 'শেষবৎ' অর্থ—পরিশেষ অনুমান। কার্য্যমাত্রেরই একজন কর্ত্তা থাকে; কর্ত্তা না থাকিলে কখনও কোথাও কোন কার্য্যই হয় না ও হইতে পারে না; অতএব বুঝিতে হইবে—কার্য্য মাত্রই কর্ত্তার অধীন। এইরূপ নিয়ম বা ব্যাপ্তি অনুসারে অনুমান করা যাইতে পারে যে, পরিদৃশ্যমান জগৎও যখন কার্য্য বা উৎপন্ন পদার্থ, তখন নিশ্চয়ই উহারও এক জন কর্ত্তা আছে। কিন্তু পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান-শক্তিসম্পন্ন কোন পুরুষেই তাদৃশ কর্ত্তৃত্ব সম্ভবপর হয় না; কাজেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি বিভু পরমেশ্বরের উপরই সেই কর্ত্তৃত্বভার সমর্পণ করিতে হয়। এই যে, সৃষ্ট জগৎ-দর্শনে তৎকারণরূপে পরমেশ্বরের অনুমান, ইহাই শেষবৎ অনুমান। ইহারই অপর নাম 'পরিশেষ' অনুমান। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন—"প্রসক্ত-প্রতিষেধে অন্যত্রাপ্রসঙ্গাৎ শিষ্যমানে সংপ্রত্যয়ঃ পরিশেষঃ।"

অনুমান, তাহা স্বার্থানুমান, আর পরকে বুঝাইবার জন্য যে, অনুমান, তাহা পরার্থানুমান।(১) এপর্য্যন্ত অনুমান সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা

অর্থাৎ সন্দিগ্ধ স্থলে যত গুলি বিষয়ের প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকে, তন্মধ্যে অপর সকলগুলি বাধাপ্রাপ্ত হইলে, অবশিষ্ট পদার্থে যে, অভিপ্রেত বিষয়ের অবধারণ, তাহার নাম 'পরিশেষ'।

(গ) 'সামান্যতোদৃষ্ট' অর্থ—যেখানে অনুমেয় বা সাধ্য পদার্থ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষের অগোচর; কেবল প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট অপরাপর বস্তু-বিষয়ক ব্যাপ্তিজ্ঞানের সাহায্যে তদ্বিষয়ে অনুমান করা হয়, তাদৃশ অনুমানের নাম 'সামান্যতো দৃষ্ট'।

যেমন—জ্ঞান-সাধন চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বিষয়ক অনুমান। ক্রিয়ামাত্রই করণসাধ্য বা সাধন-সাপেক্ষ,—কুঠার না হইলে ছেদন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। রূপরসাদি বিষয়ে যে আমাদের জ্ঞান হয়, তাহাও ক্রিয়া; সুতরাং উহাদের জন্যও একটা 'করণ' বা সাধন থাকা আবশ্যক; এই কারণে জ্ঞানের সাধনরূপে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে।

এখানে ছেদনাদি ক্রিয়া ও তৎসাধন কুঠারাদি বস্তু প্রত্যক্ষগোচর। তদ্দৃষ্টে পরিকল্পিত ব্যাপ্তিসাহায্যে অপ্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়েরও অস্তিত্ব অনুমান করা হইতেছে। এই জাতীয় সমস্ত অনুমানই উক্ত 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমানের অন্তর্গত।

আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র এই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানেরও আবার 'বীত' ও 'অবীত' প্রভৃতি ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে এখানে আর সে সমুদায়ের আলোচনা করা হইল না।

(১) স্বার্থ অনুমান—সন্দিগ্ধ বস্তু বিষয়ে কেবল নিজের অবগতির জন্য যে, অনুমান, তাহা স্বার্থানুমান; আর পরকে বুঝাইবার জন্য যে, অনুমান, তাহা পরার্থানুমান।

হইয়াছে, স্বার্থানুমানের পক্ষে তাহাই পর্য্যাপ্ত : কিন্তু পরার্থানুমানের পক্ষে আরও কয়েকটি উপকরণের আবশ্যক হয়। সে সমুদয় উপকরণকে ন্যায়াঙ্গ অবয়ব বলে। ন্যায়াঙ্গ অবয়ব পাঁচ প্রকার—

"প্রতিজ্ঞা-হেতূদাহরণোপনয়-নিগমনান্যবয়বাঃ॥"(১।১ ৩২ সূত্র)
(১) প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ, (৪) উপনয় ও (৫) নিগমন। তন্মধ্যে প্রতিজ্ঞা অর্থ—সাধ্যনির্দ্দেশ। বিবাদাস্পদ যে পদার্থ টীর অস্তিত্ব বা স্বরূপ সাধন করিতে হইবে, সেই সাধনীয় (অনুমেয়) পদার্থের নির্দ্দেশ করার নাম প্রতিজ্ঞা (১)।

যেমন—'পর্ব্বতো বহ্নিমান্'। এস্থলে পর্ব্বতে বহ্নি আছে কি না, এই বলিয়া উভয়ের মধ্যে সংশয় বা বিতর্ক চলিতেছিল ; তন্মধ্যে একজন বলিলেন, 'পর্ব্বতে নিশ্চয়ই বহ্নি আছে' ; ইহাই হইল প্রতিজ্ঞা বাক্য। এই প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য বহ্নির জ্ঞাপক উপযুক্ত হেতু প্রদর্শন করা আবশ্যক হয়।

হেতু অর্থ—প্রতিজ্ঞাত সাধ্য পদার্থের সত্তা-জ্ঞাপক বস্তু, অর্থাৎ পূর্ব্বদৃষ্ট কোন একটী উদাহরণের সহিত সাম্য থাকায় যাহা উপস্থিত সাধ্যপদার্থের সত্তা জ্ঞাপন করিতে সমর্থ, তাহাই হেতুরূপে গৃহীত হয়। (২) পর্ব্বতে যে বহ্নি আছে, তত্রত্য ধূমই তাহা জ্ঞাপন করিয়া

---

(১) "সাধ্যনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা॥" ১।১।৩৩ সূত্র।

সাধনীয়স্যার্থস্য যো নির্দ্দেশঃ, স প্রতিজ্ঞা। সাধনীয়শ্চ বহ্নিমত্তাদিনা পর্ব্বতাদিঃ। (বৃত্তিঃ)

(২) "উদাহরণ-সাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতুঃ॥" ১।১।৩৪

"উদাহরণেন সামান্যাৎ সাধ্যস্য ধর্ম্মস্য সাধনং প্রজ্ঞাপনং হেতুঃ।" (বৃত্তিঃ)

দিতেছে। কেন না, রন্ধনগৃহেও বহ্নির সহিত ধূমের সাহচর্য্য পরিদৃষ্ট হইয়াছে; এখানেও সেইজাতীয় ধূমই দৃষ্ট হইতেছে; সুতরাং এই ধূমই পর্ব্বতস্থ বহ্নির অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে; সুতরাং ধূমকে বহ্নির প্রজ্ঞাপক 'হেতু' বলা সুসঙ্গত হইতেছে।

উল্লিখিত হেতু দুই প্রকার এক অন্বয়ী, অপর ব্যতিরেকী। উদাহরণের সমানধর্ম্মানুযায়ী হেতুর নাম অন্বয়ী, আর বিপরীত ধর্ম্মানুসারে কল্পিত হেতুর নাম ব্যতিরেকী।

হেতু।

এতদনুসারে ব্যাপ্তিও দুই প্রকার হয়। যেমন অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি। হেতুনির্দ্দেশের পরেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের আবশ্যক হয়। দৃষ্টান্তরহিত কোন অনুমানই সাধ্য-সাধনে সমর্থ হয় না; এইজন্য হেতুর পরই উদাহরণের অবতারণা করিতে হয়।

উদাহরণ অর্থ—দৃষ্টান্ত। (১) দৃষ্টান্ত দুইপ্রকার—এক সাধ্যের সমান ধর্ম্মযুক্ত, দ্বিতীয় সাধ্যের বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত। সাধর্ম্ম্যে দৃষ্টান্তস্থলে, 'যথা' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়, আর বৈধর্ম্ম্যে দৃষ্টান্তস্থলে 'যৎ নৈবং, তৎ নৈবম্' অর্থাৎ যাহা এরূপ নহে, তাহা এই প্রকারও নহে ইত্যাদি।

---

(১) "সাধ্যসাধর্ম্ম্যাৎ তদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্॥" ১।১।৩৬॥

"সাধ্যসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসহচরিত-ধর্ম্মাৎ প্রকৃত সাধনাদিত্যর্থঃ। (বৃত্তিঃ)

"তদ্বিপর্য্যয়াদ্বা বিপরীতম্॥" ১।১।৩৭ সূত্র।

"ব্যতিরেক্যুদাহরণম্— তদ্বিপর্য্যয়াৎ সাধ্য-সাধনব্যতিরিক্ত-ব্যাপ্তি-প্রদর্শনাৎ। (বৃত্তিঃ)।

চতুর্থ অবয়ব—'উপনয়'। উপনয় অর্থ—উল্লিখিত উদাহরণানুসারে—সাধর্ম্ম্যে দৃষ্টান্তস্থলে 'তথা' আর বৈধর্ম্ম্যে দৃষ্টান্তস্থলে 'ন তথা' বলিয়া পক্ষেতে সাধ্য পদার্থের উপসংহার করা (১)

অভিপ্রায় এই যে, উদাহরণ প্রদর্শনের পর, প্রতিজ্ঞাত সাধ্য পদার্থটীও যে,অভিমত পক্ষেতে আছে, তাহা নির্দ্দেশ করাই যথার্থ উপনয়। বিশেষ এই যে, প্রদর্শিত উদাহরণ যদি সাধর্ম্ম্যযুক্ত হয়, তবে উপনয়-বাক্যে 'তথা' বা সাধর্ম্ম্য-বোধক শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়, আর, উদাহরণ যদি বৈধর্ম্ম্যে হইয়া থাকে, তবে উপনয়-বাক্যে 'ন তথা' এইরূপে ব্যতিরেক-বোধক কোন শব্দের উল্লেখ করিতে হয়।

পঞ্চম অবয়বের নাম—'নিগমন।' নিগমন অর্থ—হেতুর নির্দ্দেশ-চ্ছলে প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পুনর্ব্বার কথন (২)। নিগমনের উদ্দেশ্য—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ ও উপনয়ের একযোগে কথন বা সমর্থন করা। উক্ত পঞ্চবিধ অবয়বের একত্র সন্নিবেশ করিলে বোধ হয় বিষয়টা বুঝিতে সহজ হইতে পারে; এই জন্য উক্ত

---

(১) "উদাহরণাপেক্ষস্তথেত্যুপসংহারো ন তথেতি বা সাধ্যস্যোপনয়ঃ॥" ১।১।৩৮॥

সাধ্যস্য পক্ষস্য, উদাহরণাপেক্ষঃ—উদাহরণানুসারী য উপসংহার উপন্যাসঃ" (বৃত্তিঃ)।

(২) "হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমনম্॥" ১।১।৩৯

হেতোঃ ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্মস্য—অপদেশঃ কথনম্। প্রতিজ্ঞায়াঃ প্রতিজ্ঞাতার্থস্য সাধ্যবিশিষ্টপক্ষস্য বচনং নিগমনম্॥ (বৃত্তি)।

পাঁচটী অবয়বেরই পর পর সন্নিবেশ করিয়া উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে,—

প্রথমতঃ বাদী প্রতিজ্ঞা করিল—'পর্ব্বতো বহ্নিমান্'। প্রতিবাদী আপত্তি করিয়া বলিল—'কস্মাৎ'? অর্থাৎ ইহার কারণ? বাদী হেতু নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—'ধূমাৎ' যেহেতু ধুম দেখা যায়। প্রতিবাদী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, 'ক ইব'? অর্থাৎ কাহার ন্যায়? বাদী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া বলিল—'যথা মহানসম্'—যেমন রন্ধন-গৃহ। সঙ্গে সঙ্গে উপনয়বাক্য প্রদর্শন করিয়া বলিল—'অয়ং চ তথা' অর্থাৎ এই পর্ব্বতও সেইরূপ—বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্। প্রতিবাদী প্রশ্ন করিল—'তেন কিং'? তাহাতে কি হইল? বাদী উত্তরে বলিল—"তস্মাৎ বহ্নিমানয়ং"—সেই হেতু এই পর্ব্বতও বহ্নিমান্।

এখানেই ব্যতিরেকপক্ষে উপনয় বাক্য এইরূপ বলিতে হইবে যে, 'যন্নৈবং তন্নৈবম্'—যাহা বহ্নিমান্ নয়, তাহা ধূমবান্ও নয়, অর্থাৎ যেখানে বহ্নি থাকে না, সেখানে কখনই ধূম থাকে না। এইরূপে পাঁচপ্রকার ন্যায়াবয়ব প্রদর্শন দ্বারা অনুমেয় পদার্থটীর পক্ষ-সত্তা দৃঢ়ীকৃত হইয়া থাকে। পরকে বুঝাইতে হইলে এই পাঁচটী অবয়বেরই আবশ্যক হয়; কারণ, তাহা না হইলে, অপরে এইরূপ সন্দিগ্ধ সাধ্যের অস্তিত্ব স্বীকারে বাধ্য হইতে পারেনা; কিন্তু নিজের প্রবোধের জন্য অনুমানস্থলে এসকলের কিছুই প্রয়োজন হয় না। (১)

---

(১) জানা আবশ্যক যে, কোন কোন দার্শনিক পাঁচটীর পরিবর্ত্তে তিনটীমাত্র অবয়ব স্বীকার করেন। মীমাংসকগণ বলেন, প্রতিজ্ঞা, হেতু ও

মনে করুন, একজন চাষী লোক মাঠে কাজ করিতেছে; এমন সময় তাহার ধূমপানের ইচ্ছা হইল; সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি আহরণেরও চেষ্টা হইল। অগ্নির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সে অদূর বনভূমিতে ধূমদর্শন করিল। ঐ ধূম দেখিয়া সে মনে করিল যে, ঐ বনভূমি হইতে যখন ধূমোদ্‌গম হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই ঐ স্থানে অগ্নি আছে। অগ্নি না থাকিলে কখনই ধূমোদ্‌গম হইতে পারে না। এইরূপ অনুমানের পর সেই লোক বনভূমিতে প্রবেশপূর্ব্বক অগ্নি গ্রহণ করিয়া ধূমপানে তৃপ্তিলাভ করিল।

এস্থলে, তাহার প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের কেহ প্রতিপক্ষ না থাকায়, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমনাদি প্রয়োগের কোনই আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু অপরকে বুঝাইতে হইলে, তদুত্থাপিত প্রতিকূল তর্ক বা আপত্তি খণ্ডনের জন্য ঐ সমুদয় অবয়বের প্রয়োগ করা নিতান্তই আবশ্যক হইত। যেমন—

দুইজন বন্ধু অরণ্য-সন্নিহিত ভূমিতে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল—এই অরণ্যমধ্যে 'অগ্নি আছে' (প্রতিজ্ঞা)। অপর বন্ধু বলিল—কারণ? উত্তর হইল—যেহেতু ঐ স্থান হইতে ধূমরেখা উদ্‌গত হইতেছে (হেতু)। জিজ্ঞাসা হইল—সে কি রকম?—ধূম থাকিলেই যে, অগ্নি থাকিতে বাধ্য, ইহা কোথায় দেখিয়াছ? উত্তর হইল—রন্ধন গৃহই ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত। সেখানে যখনই ধূম দেখা যায়, তখনই সেখানে অগ্নিও পাওয়া যায়

উদাহরণ, এই তিনটীমাত্র অবয়ব দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে; অতএব পাঁচটী অবয়ব স্বীকার করা অনাবশ্যক।

(দৃষ্টান্ত)। এই বনেও অগ্নির ব্যাপ্য ধূম দৃষ্ট হইতেছে; (উপনয়); অতএব এখানেও নিশ্চয়ই অগ্নি আছে (নিগমন) এই জাতীয় আপত্তি উত্থিত হয় বলিয়াই পরার্থানুমানে উক্ত পঞ্চবিধ অবয়বের সন্নিবেশ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া থাকে, কিন্তু স্বার্থানুমানে বিতর্ক নাই বলিয়াই তাহা আবশ্যক হয় না।

অনুমানের বৈশিষ্ট্য।

প্রত্যক্ষ অপেক্ষাও অনুমানের ক্ষেত্র অতি বিস্তৃত। প্রত্যক্ষ কেবল বর্ত্তমান বিষয়েই নিবদ্ধ; কিন্তু অনুমান প্রমাণ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয়েরই বিষয়-গ্রাহক। ব্যাপ্তি যদি অভ্রান্ত হয়, এবং উপস্থিত হেতুটী যদি নির্দ্দোষ হয়, তাহা হইলে অনুমান কখনও ভুল হইতে পারে না।* এই জন্য ব্যাপ্তি রচনায় বা কল্পিত হেতুতে কোন প্রকার দোষ আছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি উপায় ন্যায়শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। বস্তুতই সেগুলি দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ব্যাপ্তি বা হেতুতে কোন প্রকার দোষ-সম্পর্ক আছে কি না। দোষযুক্ত হেতু দ্বারা যথার্থ জ্ঞানলাভ হয় না; এই জন্য উহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

*এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, যে বিষয়টী কস্মিন্ কালেও প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে; তদ্বিষয়ক অনুমান আপাততঃ নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও, ততক্ষণ অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নহে; যতক্ষণ কোনও শাস্ত্র বা আপ্তবাক্য দ্বারা সমর্থিত না হয়। দেখা যায়—যে ব্যাপ্তি বহুস্থানে নির্দ্দোষ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে;

সেরূপ ব্যাপ্তিরও একটী মাত্র স্থলে ব্যভিচার হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণে বলা যাইতে পারে যে, কেহ যদি এইরূপ একটী ব্যাপ্তি রচনা করেন যে, 'যৎ যৎ পার্থিবং, তৎ তৎ লৌহ-লেখ্যম্, অর্থাৎ পার্থিব বা মৃন্ময় যত বস্তু আছে, সে সমুদয়ই লৌহ দ্বারা খোদিত বা অঙ্কিত হইবার যোগ্য। এই নিয়মের (ব্যাপ্তির) আর কোথাও ব্যভিচার দৃষ্ট না হইলেও, কাঁচে উহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। কারণ, কাঁচ কখনও লৌহলেখ্য হয় না। এই জন্যই অনুমান প্রয়োগে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়।

হেতুর গুণ তিন প্রকার—পক্ষসত্ত্ব (সাধ্যাধিকরণে থাকা), সপক্ষসত্ত্ব অর্থাৎ পূর্ব্বে যেখানে সাধ্য বস্তুটীর সত্তা নিশ্চিত হইয়া আছে, সেখানে থাকা। তৃতীয় গুণ—পক্ষের বিরুদ্ধস্বভাব সম্পন্ন কোন স্থানে না থাকা। এই ত্রিবিধ গুণ না থাকিলে, সে হেতু দ্বারা উদ্দেশ্য-সিদ্ধি (সাধ্য-নিশ্চয়) হয় না। অতএব দুষ্ট হেতু পরিত্যাগ করিয়া গুণযুক্ত হেতু গ্রহণ করিতে হয়। ন্যায়মতে দুষ্ট হেতুকে 'হেত্বাভাস' বলে। 'হেত্বাভাস' অর্থ—'হেতুরিব আভাসতে' অর্থাৎ হঠাৎ হেতুর মত দেখা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে হেতু নহে। ঐ হেত্বাভাস পাঁচপ্রকার—সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণসম, সাধ্যসম ও কালাতীত (১)। তন্মধ্যে 'সব্যভিচার' অর্থ—যাহা সাধ্যনির্ণয়ের পক্ষে ঐকান্তিক বা অব্যভিচারী নহে। অভিপ্রায় এই যে, সাধ্য-নির্ণয়ের নিমিত্ত যে হেতুটী কল্পিত

---

(১) "সব্যভিচার-বিরুদ্ধ-প্রকরণসম-সাধ্যসম-কালাতীতা হেত্বাভাসাঃ ॥ ১।২।৪।

হয়, তাহা যদি সাধ্য-ক্ষেত্রেও (যে অধিকরণে সাধ্যের অস্তিত্ব লইয়া বিবাদ চলিতেছে, সেই অধিকরণেও) থাকে এবং তদ্বিরুদ্ধ স্থলেও থাকে, তবে সেই হেতু 'সব্যভিচার' হেত্বাভাস মধ্যে গণ্য হইবে। কেন না, যদি সাধ্যাধিকরণে নিয়মিত ভাবে না থাকিয়া যেখানে সেখানে থাকে, তবে সেই হেতু দ্বারা স্থলবিশেষে সাধ্যনির্ণয় হইলেও, নিশ্চয়ই সর্ব্বত্র হইবে না। উদাহরণস্থলে বলা যাইতে পারে যে, যদি কেহ পর্ব্বতে অগ্নির সত্তা অনুমান করিতে যাইয়া 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্, দ্রব্যত্বাৎ' অর্থাৎ পর্ব্বতটী বহ্নিযুক্ত, যেহেতু উহা (পর্ব্বত) দ্রব্য পদার্থ,' এইভাবে 'দ্রব্যত্ব'রূপ হেতুর প্রয়োগ করে, তবে তাহা দ্বারা নিশ্চয়ই পর্ব্বতে বহ্নির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইবে না; কারণ, কল্পিত দ্রব্যত্বরূপ হেতুটী পর্ব্বতেও যেমন থাকে, তেমনি যেখানে কখনও বহ্নি থাকা সম্ভবপর নয়, সেই জলহ্রদেও থাকে; সুতরাং ঐরূপ অনিশ্চিত হেতু দ্বারা বহ্নির অস্তিত্ব নির্ণীত হইতে পারে না। এই জন্য এইজাতীয় হেতুকে 'সব্যবিচার' বা 'অনৈকান্তিক' হেত্বাভাস বলা হইয়া থাকে (১)।

দ্বিতীয় হেত্বাভাসের নাম—বিরুদ্ধ। (২) যে সাধ্য-সমর্থনের জন্য যে হেতুর উল্লেখ করা হয়, সেই হেতুটী যদি সেই সাধ্যপদার্থের সমর্থনোপযোগী না হইয়া সম্পূর্ণ বিরোধী হয়, তাহা হইলে সাধ্য-

(১) "অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ॥" ১।২।৫।

সব্যভিচার অর্থ—যে হেতু সাধ্যসিদ্ধির একান্ত বা অব্যভিচারী উপায় নহে; তাহার নাম সব্যভিচার ও অনৈকান্তিক।

(২) "সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধঃ॥" ২।১।৬।

সিদ্ধির বিরুদ্ধ' সেই হেতুকে 'বিরুদ্ধ' নামক হেত্বাভাস কহে। যেমন—'অয়ং বহ্নিমান্, হ্রদত্বাৎ', ইহা বহ্নিমান্, যেহেতু ইহা হ্রদ। এখানে 'হ্রদ' হেতুটী বহ্নি-সিদ্ধির বিরোধী।

এস্থলে পর্ব্বতে বহ্নির অস্তিত্ব সাধনের জন্য যে, হ্রদরূপ হেতু প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা ত সাধ্য সিদ্ধির অনুকূল হইতেই পারে না, বরং সম্পূর্ণরূপে বিরোধী; কেন না, হ্রদে জলই থাকে, বহ্নি সেখানে কখনও থাকে না; জল ও অগ্নির বিরোধ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এই জাতীয় দুষ্ট হেতুর নাম—'বিরুদ্ধ' হেত্বাভাস। ইহার অপর নাম—'অসন্'।

তৃতীয় হেত্বাভাস 'প্রকরণসম'। (১) প্রকরণ অর্থ—যে বিষয়ে চিন্তা বা বিতর্ক চলিতে থাকে, সেই পক্ষ ও তাহার প্রতিপক্ষ,—সাধ্য ও সাধ্যাভাব বিশিস্ট। পরার্থানুমানস্থলে, একজন বলিতেছে পর্ব্বতে বহ্নি আছে; অপরে বলিতেছে, না—পর্ব্বতে বহ্নি নাই—তাহার অভাব আছে; সুতরাং এখানে বহ্নি ও বহ্নির অভাব, উভয়ই বিচার্য্য

---

(১) "যস্মাৎ প্রকরণচিন্তা, স নির্ণয়ার্থমপদিষ্টঃ প্রকরণসমঃ ॥" ২।১।৭।

"প্রকরণং পক্ষ-প্রতিপক্ষৌ—সাধ্যতদভাববন্তৌ ইতি তদর্থঃ। তথাচ নির্ণয়ার্থং প্রযুক্তো হেতুর্যত্র নির্ণয়ং জনয়িতুমশক্তঃ, তুল্যবলেন পরেণ প্রতিবন্ধাৎ; কিন্তু ধর্ম্মিণঃ সাধ্যবত্ত্বং তদভাববত্ত্বং বেতি চিন্তাং জিজ্ঞাসাং প্রবর্ত্তয়তি, স প্রকরণসমঃ। (ইতি বৃত্তিঃ)

যদ্বা প্রকৃষ্টং করণং প্রকরণম্—লিঙ্গং পরামর্শো বা—কো হেতুরনয়োঃ সাধকঃ? এতয়োঃ কঃ পরামর্শঃ প্রমা? ইতি বা যত্র জিজ্ঞাসা ভবতি, (সঃ প্রকরণসমঃ) ইতি বৃত্তিঃ।

বিষয় বলিয়া প্রকরণমধ্যে পরিগণনীয়। এমত অবস্থায় উভয়ে যদি নিজ নিজ পক্ষসিদ্ধির জন্য এরূপ দুইটী হেতুর উল্লেখ করে, যাহা দ্বারা কোন পক্ষেরই নির্ণয় হইতে পারে না, বরং পূর্ব্ব সন্দেহই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে ঐরূপ হেতুকে 'প্রকরণসম' বলে। ইহার অপর নাম—সৎপ্রতিপক্ষ। অর্থাৎ যে হেতুটী কল্পিত হয়, উহার প্রতিপক্ষ বা প্রতিকূল অপর হেতু বিদ্যমান থাকায়, সেই হেতুর নাম হয় 'সৎপ্রতিপক্ষ'।

ন্যায়সূত্রের বৃত্তিকার বিশ্বনাথের মতে 'প্র' অর্থ—প্রকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট; 'করণ' অর্থ—সাধন বা হেতু। অভিপ্রায় এই যে, বাদী যেখানে সাধ্যসত্তার অনুকূলে হেতুর উপন্যাস করিয়াছে; প্রতিবাদী যদি ঠিক সেই স্থলেই ঐ সাধ্যের অভাব সমর্থনের জন্য অপর কোনও হেতুর উল্লেখ করে, তাহা হইলে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় পক্ষেই তুল্য (সম) 'হেতু' বিদ্যমান থাকায় উহাদের মধ্যে প্রথমে উল্লিখিত হেতুর নাম হয় 'প্রকরণম'।

যেমন, এই পর্ব্বতে অগ্নি আছে কি না, এইরূপ সংশয়-ভঞ্জনের নিমিত্ত একজন বলিল—(প্রতিজ্ঞা করিল) পর্ব্বতে অগ্নি আছে (পর্ব্বতো বহ্নিমান্); যেহেতু ইহাতে ধূম রহিয়াছে (ধূমাৎ)। অনন্তর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—(প্রতিজ্ঞা করিল) না, পর্ব্বতে বহ্নি নাই (পর্ব্বতো বহ্ন্যভাববান্), কারণ, উহাতে জল রহিয়াছে (জলাৎ)।

একথা সত্য যে, পর্ব্বতে যদি ধূম থাকে, তবে বহ্নি থাকাও সুনিশ্চিত; আর পর্ব্বতে যদি জলই থাকে, তাহা হইলে বহ্নির অভাব থাকাই সঙ্গত, এমত অবস্থায় বাদী যতক্ষণ যুক্তি বা তর্কের

সাহায্যে আপনার পক্ষ সমর্থন করিতে (উথাপিত হেতুটীর পক্ষ-সত্তা সমর্থন করিতে) না পারিবে, ততক্ষণ ঐরূপ অনির্দ্ধারিত হেতু দ্বারা পর্ব্বতে বহ্নির সত্তা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না ; কাজেই উহাকে হেত্বাভাস বলিতে হইবে।

চতুর্থ হেত্বাভাসের নাম—সাধ্যসম। ইহার অপর নাম অসিদ্ধ। (১) অনুমানস্থলে এমন প্রসিদ্ধ হেতুর উল্লেখ করা আবশ্যক, যাহা বাদী প্রতিবাদী উভয়েরই স্বীকৃত, অন্ততঃ শাস্ত্রাচার্য্য-প্রসিদ্ধ থাকা আবশ্যক ; কিন্তু অনুমানকারী যদি সে নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নিজের বা স্বসম্প্রদায়ের সম্মত কোনও হেতুর উল্লেখ করিয়া সন্দিগ্ধ বিষয়ের অবধারণার্থ অনুমান করিতে চাহে, তাহা হইলে ঐরূপ হেতু দ্বারা কখনই সাধ্য-নিশ্চয় হইতে পারে না ; কারণ, বাদীর উদ্ভাবিত হেতুটী যখন অপ্রসিদ্ধ, তখন অগ্রে তাহারই অস্তিত্ব সাধন করিয়া লইতে হইবে, নচেৎ 'স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি' অর্থাৎ যে নিজেই অসিদ্ধ, সে আবার পরের অস্তিত্ব সাধন করিবে কি প্রকারে? এই জাতীয় অপ্রসিদ্ধ হেতুকে 'সাধ্যসম' ও 'অসিদ্ধ' হেত্বাভাস বলে।

উদাহরণ—নৈয়ায়িকগণ ছায়া বা অন্ধকারকে তেজের অভাব বলেন ; কিন্তু মীমাংসকগণ ছায়াকে একটী স্বতন্ত্র দ্রব্য পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এস্থলে, মীমাংসকগণ এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন যে, 'ছায়া এক প্রকার দ্রব্য ; কারণ, উহাতে

---

(১) সাধ্যাবিশিষ্টশ্চ সাধ্যত্বাৎ সাধ্যসমঃ॥ ১।২।৮ সূ

সাধ্যেন বহ্ন্যাদিনা অবিশিষ্টঃ। কুতঃ ? ইত্যত আহ—সাধ্যত্বাৎ ইতি। যথাহি সাধ্যং সাধনীয়ম্, তথা হেতুরপি চেৎ, সাধ্যসম ইত্যুচ্যতে। (বৃত্তিঃ)

দ্রব্য-ধর্ম্ম গুণ ও ক্রিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। গুণ ও ক্রিয়া যে, দ্রব্য ভিন্ন অন্যত্র থাকে না, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। এস্থলে, ছায়ার সম্বন্ধে উক্ত গুণ ও ক্রিয়া, এই হেতু দুইটী সাধ্যসম বা অসিদ্ধ হইতেছে। কারণ; নৈয়ায়িকগণ ছায়াতে গুণ ও ক্রিয়ার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না; (*) সুতরাং ছায়াগত গুণ ও ক্রিয়া মীমাংসক-সম্মত হইলেও, ছায়াতে যে, গুণ ও ক্রিয়া আছে বা থাকিতে পারে, প্রথমে তাহা সাধন করিয়া লইতে হইবে; পরে ঐ উভয়কে হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিতে হইবে; কিন্তু যতক্ষণ তাহা না হইবে, ততক্ষণ উহারা ছায়ার দ্রব্যত্ব-সমর্থক হেতুরূপে গৃহীত হইতে পারিবে না। অতএব এইজাতীয় হেতুমাত্রেই 'সাধ্যসম' হেত্বাভাসরূপে উপেক্ষণীয়।

(*) ছায়া সম্বন্ধে মীমাংসকগণ বলেন—"তমস্তমালপত্রাভং চলতীতি প্রতীয়তে। রূপবত্ত্বাৎ ক্রিয়াবত্ত্বাৎ দ্রব্যং তু দশমং তমঃ॥"

অর্থাৎ ছায়ার বর্ণ তমালপত্রের ন্যায় নীল, এবং ছায়ার গমনাদি ক্রিয়াও প্রতীত হয়; এবং গুণ ও ক্রিয়া থাকাই দ্রব্যের বিশেষ লক্ষণ; অতএব রূপ ও ক্রিয়া বিদ্যমান থাকায় ছায়া পরিগণিত নব দ্রব্যের অতিরিক্ত একটী স্বতন্ত্র দশম দ্রব্য।

নৈয়ায়িকগণ বলেন—না,—ছায়া কখনও দ্রব্য পদার্থ হইতে পারে না,—উহা তেজের অভাব মাত্র। ছায়াতে যে, রূপ ও ক্রিয়ার প্রতীতি হয়, তাহা ভ্রম মাত্র; কারণ, যাহার ছায়া, তাহারই গমনাদি ক্রিয়া ছায়াতে আরোপিত হয়, এবং আকাশের নীলিমার ন্যায় উহারও নীল আভা বলিয়া ভ্রম হয় মাত্র; অতএব গুণ ও ক্রিয়াশূন্য বিধায় ছায়া দ্রব্য পদার্থ নহে— তেজের অভাব পদার্থ।

উক্ত 'সাধ্যসম' হেত্বাভাসকে নব্য নৈয়ায়িকগণ তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—১। আশ্রয়াসিদ্ধি বা পক্ষাসিদ্ধি, ২। স্বরূপাসিদ্ধি, ও ৩। ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি। তন্মধ্যে আশ্রয়াসিদ্ধি অর্থ—যেখানে সাধ্যের অধিকরণ বা আশ্রয় পদার্থই অপ্রসিদ্ধ, সেখানে আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস ঘটে। যেমন, 'এই মণিময় পর্ব্বতটী বহ্নিমান্'। এস্থলে মণিময় পর্ব্বতের অস্তিত্ব জগতে অপ্রসিদ্ধ; স্নতরাং সাধ্য বহ্নির অধিকরণ অসিদ্ধ হওয়ায় ইহা 'আশ্রয়াসিদ্ধি' নামক হেত্বাভাসের মধ্যে পতিত হইল।

দ্বিতীয় 'স্বরূপাসিদ্ধি'—পক্ষাধিকরণে যে পদার্থটী মোটেই থাকে না, অনুমানের জন্য যদি সেইরূপ পদার্থের প্রয়োগ হয়, তবে তাহা স্বরূপাসিদ্ধিনামক হেত্বাভাস বলিয়া কথিত হয়। যেমন, জলহ্রদে কখনও ধূম থাকে না; তথাপি কেহ যদি অনুমান করেন যে, 'জলহ্রদ একটী বিশিষ্ট দ্রব্য, যে হেতু উহাতে ধূম আছে'।

এস্থলে দেখিতে হইবে যে, জলহ্রদ দ্রব্য পদার্থ সত্য, কিন্তু ধূম থাকায় নহে; কারণ, উহাতে ধূম কখনও নাই বা থাকে না। স্নতরাং ইহা 'স্বরূপাসিদ্ধি' হেত্বাভাস মধ্যে গণ্য হইবে। অতঃপর ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধির কথা বলিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব থাকা আবশ্যক হয়। ব্যাপ্য পদার্থ হয় হেতু, আর ব্যাপক পদার্থ হয় সাধ্য। ঐ ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব গ্রহণকালে ব্যাপ্য পদার্থটীকে যেভাবে হেতুরূপে কল্পনা করা হয়, সময়ান্তরেও তাহাকে সেইভাবেই

হেতুরূপে প্রয়োগ করিতে হয়। তাহার ধর্ম্ম বা গুণগত ন্যূনাধিক্য হইলে চলিবে না। এখন কোন লোক যদি পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান করিতে যাইয়া 'নীল ধূমকে' হেতুরূপে নির্দ্দেশ করে (পর্ব্বতো বহ্নিমান্, নীলধূমাৎ); তাহা হইলে, সে স্থলে 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি' হেত্বাভাস ঘটে। কারণ, ধূমের সহিতই বহ্নির ব্যাপ্তি নিশ্চিত হইয়াছে; কিন্তু নীলধূমের বা শ্বেতধূমের সহিত হয় নাই; অতএব উহার ব্যাপ্যত্ব সিদ্ধ হইল না। (১)

অতঃপর প্রথমোক্ত পঞ্চম হেত্বাভাসের কথা বলা হইতেছে। উহার এক নাম 'কালাতীত' অপর নাম—কালাত্যয়াপদিষ্ট। যে হেতু কালাতিক্রমে প্রযুক্ত হয়, যাহার পক্ষে যে কাল, সেই কালের অন্যকালে যদি সেই পদার্থকে হেতুরূপে উপন্যাস করা হয়, তবে তাহাকে কালাতীত নামক হেত্বাভাস বলা হয়। (২)

---

(১) তর্কশাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম এই যে, কোন বিষয়ে কোনও নিয়ম গঠন করিতে হইলে, তাহার গুণ বা বিশেষণ যত কম করিলে চলিতে পারে, তাহাই করিতে হয়। অকারণ বিশেষণ যোজনা বড়ই দোষাবহ। আলোচ্য স্থানেও বুঝিতে হইবে যে, ধূম যেরূপই হউক না কেন, প্রকৃত ধূম-নিশ্চয়েই বহ্নির ব্যাপ্তি হইবে; সুতরাং শুধু ধূমরূপে ব্যাপ্তিগ্রহ করিলেই যথেষ্ট হয়, নীল ধূম বা পীত ধূম বলিবার কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না; বরং তাহা করিলে 'গৌরব' দোষ ঘটে। কাজেই এখানে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি দোষ হইল।

(২) "কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীতঃ" ১।২।৯ সূত্র।

কালস্য সাধনকালস্য অত্যয়ে অভাবে অপদিষ্টঃ প্রযুক্তো হেতুঃ (কালাতীতঃ) ইতি (বৃত্তিঃ)।

ইহার উদাহরণ এই যে, আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, লাল নীল প্রভৃতি বর্ণগুলি স্থায়ী পদার্থ—ক্ষণিক নহে; কিন্তু স্থিতিমান্ হইলেও আলোকের সাহায্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ হয় না; কেবল আলোকের সাহায্যেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্তানুসারে কেহ যদি অনুমান করে যে, শব্দও নিত্য পদার্থ; যে হেতু আলোক-ব্যঙ্গ্য রূপাদির ন্যায় শব্দও দণ্ড-ব্যঙ্গ—দণ্ড দ্বারা ঢাকে অভিঘাত হইলেই উহা অভিব্যক্ত হয়। অতএব শব্দও একটী নিত্য পদার্থ।

এস্থলে বিবেচ্য বিষয় এই যে, আলোক-সংযোগের সঙ্গে-সঙ্গে পূর্ব্বসিদ্ধ শ্বেত পীতাদি রূপের অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, কিন্তু আলোক-সংযোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ও নষ্ট হইবার পরে, সেই রূপের কেবল অভিব্যক্তি মাত্র থাকে না; শব্দের অভিব্যক্তি কিন্তু সেরূপ নহে,—অগ্রে দণ্ডের সহিত ঢাকের সংযোগ হয়, পশ্চাৎ আঘাতের ফলে শব্দের অভিব্যক্তি বা উৎপত্তি হয়; কিন্তু সংযোগের সমকালে হয় না।

শব্দ যে, সংযোগের সমকালে অভিব্যক্ত হয় না, তাহা অনুভব-সিদ্ধও বটে। দেখা যায়—কোন এক ব্যক্তি কুঠারদ্বারা বৃক্ষ ছেদন করিতেছে। তাহার কুঠারাঘাতে অনবরত শব্দ উৎপন্ন হইয়া লোকের শ্রুতিপথে উপস্থিত হইতেছে। প্রণিধান করিলে বুঝা যায়, বৃক্ষের সহিত কুঠারের সংযোগ হইবার কিছুক্ষণ পরে সেই শব্দ শ্রবণে আসিতেছে; হয়ত ছেদনকারী সে সময়ে কুঠার খানা বৃক্ষ হইতে উঠাইয়া লইয়াছে। এইরূপে জানাযায় যে, শব্দ কখনও

সংযোগকালে অভিব্যক্ত হয় না; অথচ অনুমানকর্ত্তা শব্দকে সংযোগ-সমকালীন অভিব্যঙ্গ্য বলিয়া হেতুনির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং ঐ হেতুটী 'কালাতীত' নামক হেত্বাভাস হইতেছে।

ইহার আর একটী উদাহরণ এই যে, নৈয়ায়িকগণ বলেন— উৎপত্তিসময়ে কোন দ্রব্যেতেই কোন প্রকার গুণ থাকে না। এখন কেহ যদি অনুমান করে যে, 'উৎপত্তিকালীনঃ ঘটঃ গন্ধবান্, দ্রব্যত্বাৎ', অর্থাৎ ঘট যখন উৎপন্ন হইতেছে, তখনও সেই ঘটে গন্ধ আছে, কারণ, উহা দ্রব্য (পার্থিব) পদার্থ। পার্থিব ঘটও দ্রব্য পদার্থ; সুতরাং উহাতেও গন্ধ থাকা খুবই সঙ্গত। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে উৎপত্তিকালিন ঘটে কোন গুণ থাকাই সম্ভব হয় না; সুতরাং উল্লিখিত হেতুটী 'কালাতীত' হেত্বাভাসের অন্তর্ভুত হইতেছে। নৈয়ায়িকগণ কালাতীত হেত্বাভাসকে 'বাধ' নামেও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সে যাহা হউক; উল্লিখিত পাঁচ প্রকার দোষের কোন একটী দোষ সংঘটিত হইলেও বাদীর উপস্থাপিত 'হেতুটী' হেত্বাভাসরূপে (দুষ্ট হেতুরূপে) গণ্য হইবে; সুতরাং তন্মূলক অনুমানেরও অসত্যতা বা অপ্রামাণ্য অবধারিত হইবে। এই জন্য অনুমান প্রয়োগের কালে বাদীকে খুব সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়, যাহাতে ঐ সমুদয় দোষ ঘটিতে না পারে। ইহা ছাড়া দোষ-গুণ পরীক্ষার আরও একটী উপায় আছে। তাহার নাম 'উপাধি'। উপাধি মাত্রেই হেতুর দোষ (ব্যভিচার) প্রকাশ করিয়া থাকে। উপাধি অর্থ—সাধ্যের ব্যাপক হইয়া যাহা

হেতুর অব্যাপক হয়। (১) যাহাকে উপাধিরূপে কল্পনা করা হইবে, সেই পদার্থটীকে সাধ্য অপেক্ষা অধিক স্থানব্যাপী এবং হেতু অপেক্ষা অল্প স্থানবর্ত্তী হইতে হইবে। এইরূপ উপাধিই শুদ্ধ উপাধি বলিয়া পরিগৃহীত হয় এবং তাঁহা দ্বারা ধরিয়া লইতে হয় যে, যে হেতুটী প্রযুক্ত হইয়াছে, নিশ্চয়ই কোন স্থানে তাহা ব্যভিচারী হইবে।

মনে করুন—কেহ যদি 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই অনুমানের পরিবর্ত্তে "পর্ব্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ" অর্থাৎ পর্ব্বতে ধূম আছে; কারণ, উহাতে বহ্নি আছে, এইরূপ অনুমান করিতে ইচ্ছা করে—বহ্নিরূপ হেতুদ্বারা ধূমের অস্তিত্ব সিদ্ধি করিতে চাহে; তবে তাহা ভুল হইবে; কেন না, এখানে উক্তপ্রকার উপাধির সম্ভাবনা আছে। কারণ, বহ্নি থাকিলেই যে, ধূম থাকিবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই বা হইতে পারে না; কেন না, ধূমের উপাদান বহ্নি নহে—জল। এই জন্যই জলহীন তপ্ত লৌহে অগ্নিসত্ত্বেও ধূম থাকে না। অগ্নি-সংযোগে পার্থিব কাষ্ঠাদি হইতে যে জলাংশ উত্থিত হয়, তাহারই নাম ধূম; সুতরাং উক্ত হেতুর উপাধি হইতেছে 'আর্দ্রেন্ধন' (ভিজা কাষ্ঠ)।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই প্রকার উপাধি যেখানে ধরা যায় না, অথচ উপাধি আছে বলিয়া আশঙ্কা মাত্র হয়, সেখানেও যতক্ষণ

---

(১) "সাধ্যস্য ব্যাপকো যস্তু হেতোরব্যাপকস্তথা। স উপাধির্ভবেৎ"। (বিশ্বনাথ—কারিকাবলী)।

তর্কের সাহায্যে সেই উপাধিশঙ্কা তিরোহিত করিতে না পারা যায়, ততক্ষণ সেই হেতুটী সাধ্যের জ্ঞাপক হয় না। এখানে 'তর্ক' (১) শব্দে যুক্তি ও আপ্তবাক্য, উভয়ই বুঝিতে হইবে। অনুমান মাত্রই দৃষ্টান্ত-সাপেক্ষ। দৃষ্টান্ত—ফলতঃ উপমানেরই অন্তর্গত; সুতরাং অনুমানের পর 'উপমান' নিরূপণ করা আবশ্যক।

উপমান।

উপমান অর্থ—পূর্ব্বপরিজ্ঞাত কোন এক বস্তুর সমান ধর্ম্ম-সম্বন্ধ নিবন্ধন যে, অপ্রসিদ্ধ বা অবিজ্ঞাত অপর পদার্থের সাধন অর্থাৎ পরিচয়াদি জ্ঞান, তাহার নাম 'উপমান' প্রমাণ। (+) উপমানের ফল প্রধানতঃ সংজ্ঞা-সংজ্ঞীর সম্বন্ধ গ্রহণ; অর্থাৎ এই পদার্থের নাম অমুক, এবং ইহা অমুক নামের প্রতিপাদ্য ইত্যাদি।

উদাহরণ এই যে, গ্রামবাসী এক ব্যক্তি অভিজ্ঞ বৃদ্ধ জনের প্রমুখাৎ শুনিয়াছে যে, অরণ্যে 'গবয়' নামে একপ্রকার জন্তু আছে, তাহা দেখিতে ঠিক গরুরই মত। কিন্তু এপর্য্যন্ত সে ব্যক্তি কোথাও

---

(১) "অবিজ্ঞাত-তত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ"।
১।১।৪০ সূ।

"তর্কইতি লক্ষ্যনির্দ্দেশঃ। কারণোপপত্তিত উহ ইতি লক্ষণম্। অবিজ্ঞাত-তত্ত্বে অর্থে তত্ত্বজ্ঞানার্থমিতি প্রয়োজনকথনম্। কারণং ব্যাপ্যম্। তস্যোপপত্তিরারোপঃ, তস্মাদ্ য উহঃ—আরোপঃ অর্থাৎ ব্যাপকস্য—।"(বৃত্তিঃ)

(+) "প্রসিদ্ধ-সাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্॥" ১।১।৬ সূ।

প্রসিদ্ধস্য পূর্ব্বসিদ্ধস্য গবাদেঃ সাধর্ম্ম্যাৎ—সাদৃশ্যাৎ। তজ্জ্ঞানাৎ সাধ্যস্য গবয়াদি-পদবাচ্যস্য সাধনং সিদ্ধিঃ উপমানং—উপমিতিঃ। (বৃত্তিঃ)

ঐরূপ জন্তু প্রত্যক্ষ করে নাই। সেই ব্যক্তি অরণ্যে যাইয়া হঠাৎ গো-সদৃশ একটী প্রাণী দেখিতে পাইল। দেখিবামাত্র তাহার পূর্ব্বসংস্কার জাগরিত হইল—'গো-সদৃশ প্রাণীর নাম গবয়'। "সম্মুখস্থ প্রাণীটীও গো-সদৃশ দেখা যাইতেছে; অতএব নিশ্চয় ইহা গবয়-পদবাচ্য। এই প্রাণীটীই সেই গবয় পদার্থ এবং ইহার নাম হইতেছে—গবয়। এই প্রকারে সাদৃশ্য বলে সে ব্যক্তি একটী নূতন প্রাণীকে জানিল এবং তাহার নামও ঠিক করিয়া লইল। এই যে, গবয়ে গো-সাদৃশ্য জ্ঞান, ইহাই উপমান। এই উপমানের সাহায্যেই লোকে অদৃষ্টপূর্ব্ব পদার্থও জানিতে বা বুঝিতে পারে, এবং ইহারই সাহায্যে মানুষ তুলনা-মূলক সমস্ত ব্যবহার নিষ্পাদনে সমর্থ হইয়া থাকে।

অধিকন্তু, এই উপমান প্রমাণের প্রভাবেই অবিজ্ঞাত বহু বিষয়েও, সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর মধ্যে যে, বাচ্য-বাচকভাব সম্বন্ধ আছে, তাহা নির্ণীত হইয়া থাকে; সুতরাং এইরূপে শব্দ-শক্তি নিরূপণ করাই উহার প্রধান বা মুখ্য ফল। (১) উপমা, তুলনা ও সাদৃশ্য প্রভৃতি শব্দগুলি এক পর্য্যায়ভুক্ত। অতঃপর শব্দপ্রমাণের অবতারণা করা যাইতেছে—

---

(১) সাংখ্যবাদীরা উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহারা উহার কিয়দংশ প্রত্যক্ষে, কিয়দংশ অনুমানে, আর কিয়দংশ শব্দপ্রমাণে অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন। যথা—'গোসদৃশ প্রাণীর নাম গবয়', এইযে বৃদ্ধবচন, তাহাত শব্দপ্রমাণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহার পর, অরণ্যে যে, গবয়দর্শন এবং তাহাতে যে, গোর আকৃতি দর্শন, তাহাও

[শব্দ প্রমাণ।]

প্রমাণ-পর্য্যায়ে শব্দ হইতেছে অন্তিম প্রমাণ। যেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরাভূত, অনুমান প্রমাণ তিরস্কৃত (তত্ত্ব-নিরূপণে অসমর্থ), এবং উপমান প্রমাণও প্রতিহত, সেখানে—সেই দুরপনেয় অজ্ঞান-সঙ্কুলস্থলে শব্দই (আপ্তবাক্যই) অন্ধকার অপনয়নে বা সত্যপথপ্রদর্শনে একমাত্র সহায় হয়। এইজন্যই শব্দপ্রমাণকে চরম প্রমাণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর শব্দপ্রমাণের গৌরব-খ্যাপনের উদ্দেশ্যে বহুস্থলে শব্দকে 'অন্ত্যমিদং প্রমাণম্' (অন্তিম প্রমাণ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শব্দপ্রমাণের অলোকসামান্য মহিমা প্রাচীন আচার্য্যগণ সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। (১)

'শব্দ' অর্থে এখানে বর্ণময় পদমাত্র বুঝিতে হইবে, কিন্তু

প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। অনন্তর গোসাদৃশ্য নিবন্ধন সম্মুখস্থ প্রাণীতে যে, গবয় বোধ, অর্থাৎ ইহা নিশ্চয়ই 'গবয়'-পদবাচ্য, এইরূপ অবধারণ, তাহাও অনুমানেরই অন্তর্গত; সুতরাং এখানে এমন কোন অংশ অবশিষ্ট রহিল না, যাহার জন্য 'উপমান' নামে আর একটী স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার করা আবশ্যক হয়।

(১) আচার্য্য দণ্ডী বলিয়াছেন—

"ইদমন্ধং জগৎ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ং। যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে।" (কাব্যদর্শ)

মর্ম্মার্থ—এই ত্রিজগৎ অন্ধ (ব্যবহারে অক্ষম) থাকিত, যদি সৃষ্টির প্রথম হইতে জগদ্ব্যাপী শব্দনামক জ্যোতি প্রকাশমান না থাকিত।

ধ্বনিরূপ শব্দ নহে; (কারণ, ধ্বনিরূপ শব্দের অর্থ-বোধনে শক্তি নাই)। 'প্রত্যেক পদেই ভিন্নভিন্ন অর্থবোধক শক্তি নিহিত আছে। ন্যায়শাস্ত্রে ঐ শক্তিকে 'ঈশ্বরীয় ইচ্ছাবিশেষ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। শব্দগত ঐপ্রকার শক্তি সাধারণতঃ প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও, শব্দে যে, অর্থ-বোধক শক্তি নিহিত আছে, তাহা বৃদ্ধ-ব্যবহারপ্রভৃতি হইতে জানিতে হয় (১)। যেমন—

একস্থানে তিনটী লোক দাঁড়াইয়া আছে—একজন বৃদ্ধ, দ্বিতীয়জন যুবক (পদ ও পদার্থবিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন), তৃতীয় জন বালক; এখনও তাহার পদ পদার্থবোধ জন্মে নাই। ইহাদের মধ্যে বৃদ্ধ লোকটী যুবাকে বলিল—'গাং আনয়' (একটী গো আনয়ন কর)। যুবক তৎক্ষণাৎ যাইয়া একটী প্রাণী লইয়া আসিল। সন্নিহিত বালকটী বৃদ্ধের কথা শুনিল, যুবকের কার্য্যও দেখিল, কিন্তু কথার অর্থ বুঝিল না। বৃদ্ধ পুনশ্চ যুবকের প্রতি আদেশ করিল যে, 'গাং বধান; অশ্বম্ আনয়'। যুবক আদেশের সঙ্গেসঙ্গেই

---

(১) "শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমানাৎ কোষাপ্তবাক্যাদ্ব্যবহারতশ্চ।
শব্দস্য শেষাদ্বিবৃতের্বদন্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্য বৃদ্ধাঃ॥"

অপভ্রংস (গাছমাছ প্রভৃতি) শব্দে ঐরূপ শক্তি স্বীকৃত হয় না।

সংকেত দ্বিবিধ—আজানিক ও আধুনিক। যাহা ঈশ্বরকৃত সংকেত, তাহা আজানিক, আর যাহা আমাদের কৃত সংকেত—যেমন পুত্রাদির নাম, তাহা আধুনিক। "আজানিকশ্চাধুনিকঃ সংকেতো দ্বিবিধো মতঃ"। (জগদীশ)।

গরুটী বন্ধন করিল এবং একটী অশ্ব আনয়ন করিল। এখন বালক বিচার করিতে লাগিল—'গাং' ও 'আনয়' বলিলে পর যুবক ঐ জন্তুটী লইয়া আসিল; আবার 'গাং' পদ ঠিক রাখিয়া 'আনয়'পদের পরিবর্ত্তে 'বধান' বলিলে পর, ঐ প্রাণীটীকেই বাঁধিয়া রাখিল। পুনশ্চ 'আনয়' পদ ঠিক রাখিয়া 'গাং' এর পরিবর্ত্তে 'অশ্বম্' (অশ্ব) বলিবামাত্র—এইরূপ আর একটা জন্তু লইয়া আসিল।

ইহা হইতে বেশ বোঝা যাইতেছে যে, 'গাং' অর্থ—গো; 'আনয়' অর্থ— আনয়ন; 'বধান' অর্থ—বেঁধে রাখ', এবং 'অশ্ব' অর্থ—সম্মুখস্থ এই প্রাণী। শব্দরাশির এবংবিধ আবাপোদ্বাপ বা অদলবদল ভাব দ্বারাই প্রথমে অপরিজ্ঞাত শব্দার্থের সহিত লোকের পরিচয় (বোধ) জন্মে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক পদেই অর্থবোধনোপযোগী শক্তি বা ক্ষমতা আছে। সেই শক্তি কোথাও স্বাভাবিক, কোথাও আগন্তুক বা অপরিচিত, কোথাওবা যৌগিক অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের সম্বন্ধজনিত, কোথাও আবার প্রকৃতি প্রত্যয়ের সংযোগ ও স্বভাব, এতদুভয়-প্রসূত, উহার নাম যোগরূঢ়ি। তন্মধ্যে স্বাভাবিক শক্তিকে বলে রূঢ়ি, আরোপিত শক্তিকে বলে লক্ষণা, প্রকৃতি-প্রত্যয়ের যোগলব্ধ শক্তিকে বলে যৌগিক, আর অবশিষ্ট শক্তিকে বলে যোগরূঢ়ি। এতদনুসারে অর্থবোধক শব্দও সাধারণতঃ রূঢ়, লক্ষক, যোগরূঢ় ও যৌগিক, এই চারিভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে—

যে শক্তি অপর কাহারো অপেক্ষা না করিয়া শব্দোচ্চারণমাত্র

অর্থ-প্রতীতি জন্মায়, তাহাই শব্দের মুখ্য শক্তি, ইহার অপর নাম অভিধা ও রূঢ়ি। যেমন—মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ, ঘট প্রভৃতি শব্দের শক্তি। বৃক্ষ ও গো প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র ঐ সমুদয় বস্তু বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু ঐ সকল শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়ার্থ বিশ্লেষণ করিলে যেরূপ অর্থ বুঝায়, তাহা ঐ সমুদয় অর্থ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতএব ঐ সকল বস্তুবোধক বৃক্ষ, মনুষ্য ও গো প্রভৃতি শব্দকে 'রূঢ়' বলা হইয়া থাকে। (১)

যেখানে উক্ত অভিধা শক্তিদ্বারা অর্থ বুঝাইলে বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য রক্ষিত হয় না, অথবা প্রকরণাদির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, সেখানে বাধ্য হইয়া শব্দের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া আরোপিত শক্তির (লক্ষণার) আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। লক্ষণা অর্থ—যে শব্দের যাহা মুখ্য অর্থ, সেই শব্দ যদি কোন কারণে সেই মুখ্যার্থ প্রতিপাদনে বাধা প্রাপ্ত হইয়া, সেই মুখ্যার্থ সম্পর্কিত অন্য কোনও অর্থ বুঝায়, তবে, ঐ শব্দ যাহার প্রভাবে ঐরূপ দ্বিতীয় অর্থ বুঝায়, তাহার নাম লক্ষণা। যেমন—'গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি' (গঙ্গায় গোপপল্লী বাস করিতেছে) ইত্যাদি।

লক্ষণা

উক্ত উদাহরণে গঙ্গা-শব্দের মুখ্য অর্থ জলপ্রবাহ; কিন্তু জল-

---

(১) 'বৃক্ষ' শব্দটী বৃশ্চ্ ধাতু হইতে 'শক' প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৃশ্চ্ ধাতুর অর্থ ছেদন, আর 'শক' প্রত্যয়ের অর্থ কর্তৃত্ব; সুতরাং উহার যৌগিক অর্থ ধরা হইলে 'ছেদনকর্ত্তা'কে বুঝাইতে পারে। অথচ তাহা কোথাও বুঝায় না।

প্রবাহে গোপপল্লীর বাস করা কখনই সম্ভবপর হয় না; এবং বক্তারও ঐরূপ অভিপ্রায় বোধ হয় না, পরন্তু শৈত্য ও পবিত্রতাদির বাহুল্য-বোধনেই তাহার তাৎপর্য্য; অতএব বক্তার তাৎপর্য্যানুরোধে এবং মুখ্যার্থের অসম্ভাবনার ফলে গঙ্গাপদের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া তৎসংস্পৃষ্ট তীরে লক্ষণা করিতে হয়। সুতরাং গঙ্গাপদ হইতেছে লক্ষক, তীর হইতেছে তাহার লক্ষ্য, আর যাহা দ্বারা ঐ তীর অর্থ বুঝাইতেছে, তাহার নাম লক্ষণা। লক্ষণাকে কল্পিত বা আরোপিত শক্তি বলে। লক্ষণা আবার জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা, জহদজহৎস্বার্থা প্রভৃতি বহুভাগে বিভক্ত। (১)

আর যে শব্দ স্বীয় প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থযোগে একটী বিশেষ অর্থ বুঝায়, সেই শব্দের নাম যৌগিক। যেমন—পাচক, গায়ক

---

(১) জহৎস্বার্থা লক্ষণা—যেখানে বাচকশব্দ নিজের মুখ্যার্থ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া অন্য অর্থ বুঝায়, সেখানে হয়—জহৎস্বার্থা। যেখানে শব্দটী নিজের মুখ্য অর্থ বুঝাইয়া অতিরিক্ত অর্থও বুঝায়, সেখানে অজহৎস্বার্থা। আর যেখানে শব্দটী নিজের মুখ্যার্থের কিয়দংশে ত্যাগ করে, এবং কতকটা অর্থান্তরও বুঝায়, সেখানে জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণা। তন্মধ্যে প্রথম উদাহরণ 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি'। দ্বিতীয় উদাহরণ 'নীলং উৎপলম্'। নীল অর্থ নীলগুণ; কিন্তু এখানে বুঝাইতেছে—নীলগুণবিশিষ্ট উৎপলকে। তৃতীয় উদাহরণ—'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' এই সেই দেবদত্ত। এখানে একই দেবদত্ত একই সময়ে অতীত ও বর্ত্তমান কালে থাকিতে পারে না, এইজন্য অতীত ও বর্ত্তমান কালসম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ দেবদত্ত অর্থে লক্ষণা।

প্রভৃতি শব্দ। পাচক পদটী পচ্ ধাতুর পর 'ণক' প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে। পচ্ অর্থ—পাক; আর 'ণক' প্রত্যয়ের অর্থ কর্ত্তৃত্ব; সুতরাং ঐ উভয়ের সম্মেলনে নিষ্পন্ন 'পাচক' শব্দের অর্থ হইতেছে পাককর্ত্তা—যিনি পাক করেন। গায়ক প্রভৃতি শব্দের অবস্থাও তদ্রূপ। অতঃপর 'যোগ-রূঢ়' পদের কথা বলা হইতেছে।

যে সমুদয় শব্দ প্রকৃতি-প্রত্যয়ের সহযোগে ও রূঢ়ির সাহায্যে অর্থবিশেষ বুঝায়, সেই সমুদয় শব্দকে যোগরূঢ় বলে। যেমন 'পঙ্কজ ও উদ্ভিদ্' প্রভৃতি শব্দ। 'পঙ্ক+জন্' ধাতুর উত্তর 'ড' প্রত্যয়যোগে 'পঙ্কজ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উহার যৌগিকার্থ হইতেছে—যাহা পঙ্কে জন্মে। কিন্তু পঙ্ক মধ্যে শালুক শৈবাল প্রভৃতি যত পদার্থ জন্মে, পঙ্কজ পদে সে সমস্তকেই বুঝায় না; কেবল পদ্মকেই বুঝায়; সুতরাং পঙ্কজ পদের 'পঙ্কে জাত' অংশে যেমন যৌগিকতা আছে, তেমনই শুদ্ধ পদ্ম মাত্র বুঝায় বলিয়া সেই অংশে রূঢ়িও স্থান পাইয়াছে; অতএব এই জাতীয় শব্দসমূহ 'যোগরূঢ়' নামে অভিহিত হয়। অর্থবোধক শব্দ মাত্রই এইরূপে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। (১) এখন কিরূপ শব্দ প্রমাণরূপে

---

(১) কেহ কেহ 'রূঢ়যৌগিক' নামে আরও একটা শব্দ-বিভাগ কল্পনা করিয়া থাকেন। যে শব্দ কোথাও রূঢ্যর্থ বুঝায়, আবার কোথাও কেবল যোগার্থ মাত্র বুঝায়, তাহার নাম রূঢ়যৌগিক। রূঢ়যৌগিকের উদাহরণ—'মণ্ডপ' প্রভৃতি। 'মণ্ডপ' শব্দে কোথাও চতুষ্কোণ গৃহ বুঝায়, কোথাও আবার (মণ্ডং পিবতি) মণ্ড পান করে, এইরূপ যোগার্থ ধরিয়া

পরিগণিত হইবার যোগ্য, তাহা বুঝাইবার জন্য মহর্ষি গোতম বলিতেছেন— আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ ॥ ১।১।৭ ॥

আপ্ত পুরুষের উপদেশ বাক্যের নাম শব্দ প্রমাণ। আপ্ত অর্থ—যিনি ধর্ম্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি বক্তব্য বিষয়ের যথার্থ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া তৎপ্রচারের ইচ্ছায় উপদেশে প্রবৃত্ত হন, তিনিই 'আপ্ত' নামে অভিহিত; সুতরাং ঋষি, আর্য্য ও ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সকলেই আপ্ত-সংজ্ঞায় অভিহিত হইবার যোগ্য। কারণ, ব্যবহার জগতে তাহাদের উপদিষ্ট শব্দও লোকের হিতাহিত-বিবেকে এবং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিসাধনে সহায়তা করিয়া থাকে। (২)

এখানে বলা আবশ্যক যে, যে সকল শব্দ দৃষ্টার্থক—ইহলোকেই যে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ হইবার যোগ্য, কেবল তদ্বোধক শব্দই যে,

---

মন্ত-পানকারী লোককেও বুঝায়। অপর সকলে এই জাতীয় শব্দকে—উক্ত রূঢ় ও যৌগিক শব্দের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট করেন;—রূঢ্যর্থ বুঝাইলে রূঢ়, আর যৌগিকার্থ বুঝাইলে যৌগিক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

(২) সাক্ষাৎকরণমর্থস্যাপ্তিঃ, তয়া প্রবর্ত্তত্তে ইত্যাপ্তাঃ। ঋষ্যার্য্যম্লেচ্ছানাং সমানং লক্ষণম্। তথাচ সর্ব্বেষাং ব্যবহারাঃ প্রবর্ত্তন্তে ইতি। (বাৎস্যায়নভাষ্যম্) ১। ১। ৭ ॥—

অর্থ এই যে, আপ্তি অর্থ—শব্দার্থের সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষ করা। সেই আপ্তি (প্রত্যক্ষ) অনুসারে যিনি বাক্য ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন, তিনিই আপ্ত। ঋষি, আর্য্য ও ম্লেচ্ছ সকলেই উক্ত প্রকার আপ্ত লক্ষণে লক্ষিত হন; সুতরাং তথাবিধ ম্লেচ্ছাদির উচ্চারিত শব্দও প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত হইবে। লোকব্যবহারও একথার সমর্থন করিতেছে।

প্রমাণমধ্যে পরিগণিত হইবে, তাহা নহে ; পরন্তু যে সকল শব্দ অদৃষ্টার্থক অর্থাৎ যে সকল শব্দের অর্থ কেবল পরলোকেই প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে, সেই সকল অর্থের বোধক শব্দও আপ্তোচ্চারিত হইলে প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইবে। অধিকন্তু, যে সকল শব্দের বক্তা নিজে আপ্ত না হইয়াও, আপ্তোপদেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া উপদেশ প্রদান করেন, আপ্তোপদেশ-মূলক সে সকল শব্দও প্রমাণরূপে অবশ্য গ্রহণীয়। এবংবিধ শব্দ-প্রমাণ হইতেই মানুষ অতীন্দ্রিয় অলৌকিক বিবিধ বিষয়েও জ্ঞানসঞ্চয় করিতে সমর্থ হয়।

কণাদ প্রভৃতি দার্শনিকের মতে শব্দ একটী স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে পরিগণিত হয় নাই। তাঁহারা শব্দের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণ করিয়া কতক অনুমানের মধ্যে, কতক বা প্রত্যক্ষের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া লইয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে সে কথার অবতারণা করা যাইবে।

কথিত শব্দ প্রমাণ সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত—দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক। তন্মধ্যে যে সমুদয় শব্দ লোকপ্রসিদ্ধ বিষয়ের প্রতিপাদক, অর্থাৎ যে সব শব্দের প্রতিপাদ্য বিষয় (বস্তু) ইহলোকেই সময় ও অবস্থাভেদে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, সেই সমুদয় শব্দই দৃষ্টার্থক। যেমন—ব্যবহারিক শব্দসমূহ। আর যে সমুদয় শব্দের প্রতিপাদ্য বিষয় (বস্তু) সাধারণ মানবের পক্ষে ইহকালে প্রত্যক্ষযোগ্য হয় না ; যেমন—স্বর্গ ও অপূর্ব্ব প্রভৃতি (ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রভৃতি), সেরূপ অর্থ-প্রতিপাদক শব্দ সমুদয় অদৃষ্টার্থক। সাধারণতঃ বৈদিক শব্দসমূহ এই শ্রেণীরই অন্তর্গত। এইপ্রকারে

ন্যায়দর্শনে উক্ত প্রমাণের সমষ্টি-সংখ্যা হইতেছে চারি প্রকার। ন্যায়মতে প্রমাণ-সংখ্যা ইহার অধিকও নহে, কমও নহে। অন্যান্য বাদিগণ এতদ্ব্যতিরিক্ত যে সমুদয় প্রমাণ স্বীকার করেন, নৈয়ায়িকগণ সে সমুদয় প্রমাণকে উক্ত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণের মধ্যেই সন্নিবেশিত করিয়া থাকেন; সুতরাং তাহাদের মতে অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। (১) তাহার পর, উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ প্রমাণ অস্বীকার করিলে যে, লোক-ব্যবহারই অচল হইয়া পড়ে, তাহাও যথাস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব এখানে সে কথার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। অতঃপর প্রমেয়ের কথা আরব্ধ হইতেছে।—

প্রমেয় পরিচ্ছেদ।

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, প্রমাণ নিরূপণের উদ্দেশ্য প্রমেয় নিরূপণ করা। আমরা দৈনন্দিন ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য যে সমুদয় পদার্থ অপেক্ষা করিয়া থাকি; এবং জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই ব্যবহারকালে, যে সমুদয় পদার্থ বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন

---

(১) কাহার মতে প্রমাণসংখ্যা কত, তাহা এইরূপ—

"প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদ-সুগতৌ পুনঃ।
অনুমানং চ তচ্চাপি, সাংখ্যাঃ শব্দং:চ তে উভে।
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানং চ কেচন।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহুঃ প্রভাকরাঃ।
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ॥"

আকারে আমাদের বুদ্ধি-পথে আপতিত হইয়া থাকে; সে সমুদয় পদার্থের সংখ্যা, স্বরূপ, গুণ ও নামাদি নির্ণয়পূর্ব্বক লোক-ব্যবহারের সৌকর্য্য ও শৃঙ্খলা সম্পাদন করাই সাধারণতঃ প্রমাণ নিরূপণের প্রধান ফল বা প্রয়োজন। ন্যায়মতে লৌকিক ও অলৌকিক প্রমেয় পদার্থের সমষ্টি-সংখ্যা দ্বাদশ—

"আত্ম-শরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ-প্রবৃত্তি-দোষ-প্রেত্যভাব-ফল-দুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্॥ ১ ১ ৯॥

অর্থ:—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়), বুদ্ধি, মনঃ, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ, এই দ্বাদশ প্রকার পদার্থ প্রমেয় নামে অভিহিত। তন্মধ্যে আত্মা অর্থ—দেহের অধিষ্ঠাতা (পরিচালক) কর্ত্তা ও ভোক্তা। নৈয়ায়িকগণ বলেন, জীবাত্মা যদিও সাধারণ প্রত্যক্ষের অগোচর—অপ্রত্যক্ষ, তথাপি তাহার অস্তিত্ব একেবারে অবিজ্ঞেয় নহে। অনুমান প্রমাণ দ্বারাই আত্মার সদ্ভাব জানিতে পারা যায়। ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন (চেষ্টা), সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান, এই ছয়টী গুণই সেই আত্মানুমিতির সাধন লিঙ্গ বা হেতু (১)।

অভিপ্রায় এই যে, দেহবর্ত্তী চেতন আত্মা সাধারণ প্রত্যক্ষের অবিষয় হইলেও, ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতি গুণ নিচয়ের সাহায্যে দেহাধিষ্ঠাতৃ-রূপে তাহার অনুমান করা যাইতে পারে। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন;—

---

(১) "ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম্॥" ১।১।৯ সূত্র। অর্থাৎ ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান, এই ছয়টী গুণই আত্ম-সদ্ভাবের অনুমাপক।

"প্রবৃত্ত্যাদ্যনুমেয়োঽয়ং রথগত্যেব সারথিঃ।"

অর্থাৎ অচেতন রথের গতি-দর্শনে যেমন তৎপরিচালক চেতন সারথির সদ্ভাব অনুমিত হয়, তেমনি অচেতন দেহের চেষ্টা প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা তদধিষ্ঠাতা একটী চেতনের সদ্ভাব নিশ্চয়ই অনুমিত হয়। সেই চেতন পদার্থই আত্মা। (১)

এখন কথা হইতেছে এই যে, জগতে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারো বিসংবাদ বা সংশয়মাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না; আপামর সাধারণ সকলেই সাধারণভাবে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। 'আমি নাই' কিংবা 'আমি আছি কিনা' এরূপ ভ্রান্তি বা সংশয় অতি উন্মত্তের পক্ষেও সম্ভবপর মনে হয় না। অতএব আত্মার অস্তিত্ব সর্ব্ববাদি-সম্মত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ আত্মার অস্তিত্ব বা সদ্ভাব সম্বন্ধে কোনও সংশয় বা বিপ্রতিপত্তি না থাকিলেও, উহার স্বরূপ ও স্বভাবাদি বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ ও বিতর্ক পরিদৃষ্ট হয় (২)।

---

(১) অত্রত্য অনুমানের জন্য এইরূপ একটী ব্যাপ্তি নির্দ্ধারণ করিতে হয়। যথা—'অচেতন-প্রবৃত্তিঃ চেতনাধিষ্ঠানপূর্ব্বিকা' অচেতন পদার্থের বৃত্তিমাত্রই চেতনের প্রেরণাজন্য হইয়া থাকে। সারথি-পরিচালিত অচেতন রথের প্রবৃত্তি (চেষ্টা) ইহার দৃষ্টান্ত। এস্থলে দেহও অচেতন; সুতরাং তাহার প্রবৃত্তিও চেতনের অধিষ্ঠানপূর্ব্বকই হইবে। আলোচ্য চেতন আত্মাই সেই অধিষ্ঠাতা বা প্রেরক।

(২) নাস্তিকগণ দেহাতিরিক্ত চেতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন—জড়স্বভাব ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু, এই

কেহ দেহাতিক্ত আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না, কেহ বা ইন্দ্রিয় ও তদতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করেন না;

ভূতচতুষ্টয়ের সমবায়ে যেমন দেহের উৎপত্তি হয়, তেমনি তৎসঙ্গে চৈতন্যেরও অভিব্যক্তি হয়। দৈহিক চৈতন্য উক্ত দেহোপাদান ভূতচতুষ্টয়েরই সংযোগের ফল। যদিও ক্ষিতি জলাদি প্রত্যেক ভূতে চৈতন্য নাই সত্য, তথাপি স্বভাবশুভ্র চূণ ও পীতবর্ণ হরিদ্রার সংযোগে যেরূপ স্বতন্ত্র এক লালবর্ণের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, অথচ চূণ ও হরিদ্রা কেহই রক্তবর্ণ নহে, তদ্রূপ প্রত্যেক ভূতে চৈতন্য না থাকিলেও উহাদের সংযোগবিশেষে একটা অভিনব চৈতন্যের সঞ্চার হওয়া অসম্ভব বা দোষাবহ নহে। ইহাদের মতে দেহের সঙ্গেই চৈতন্যের উৎপত্তি এবং দেহের সঙ্গেই বিলয়।

হিরণ্যগর্ভের উপাসক একটী সম্প্রদায় আছে। তাহার ইন্দ্রিয় ও মনকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন। তাহারা বলেন—ছান্দোগ্যোপনিষদে—"তে হ প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুঃ—কো নঃ শ্রেষ্ঠ ইতি।" অর্থাৎ সেই প্রাণ সমূহ (ইন্দ্রিয় প্রভৃতি) নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ করিতে করিতে পিতা প্রজাপতির সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে; আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ইত্যাদি বাক্যে ইন্দ্রিয়গণের সচেতনতা প্রমাণিত হইতেছে; সুতরাং ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত স্বতন্ত্র চেতন আত্মা স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই; ইন্দ্রিয়ই আত্মা।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বলেন—আমাদের অনুভবসিদ্ধ বুদ্ধি-বিজ্ঞানই (প্রতিক্ষণ জায়মান বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবাহই) আত্মা; তদতিরিক্ত নিত্য চৈতন্য-সম্পন্ন আত্মা স্বীকারের কোনই প্রয়োজন নাই।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদিগণ বলেন—আত্মা নিত্য, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, এক অখণ্ড

কেহ আবার জড়া বুদ্ধিকেই আত্মা না বলিয়া সন্তোষ লাভ করেন না। কেহ আত্মার একত্ব নিত্যত্ব ও নির্গুণত্ব পক্ষ সমর্থন করেন; কেহ আবার তদ্বিরুদ্ধে বিপুল তর্ক যুক্তির অবতারণা করিয়া বিরুদ্ধ মত স্থাপন করেন। এইরূপ বিতর্ক-বাহুল্য নিবন্ধন সাধারণের পক্ষে আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া অসম্ভব বিবেচনায় মহর্ষি গোতম আপনার অভিমত সিদ্ধান্ত সংস্থাপন প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থ-গ্রহণাৎ ॥" ৩।১ ১।

চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলা যাইতে পারে না; কারণ, আমরা চক্ষুদ্বারা কোন বস্তু দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার যখন ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা সেই বস্তুই স্পর্শ করিয়া থাকি, তখন দেখাযায় যে, দর্শনের কর্ত্তা ছিল চক্ষু, আর এখন স্পার্শনের কর্ত্তা হইতেছে ত্বক্; উহারা উভয়ে স্বরূপতঃ ও কার্য্যতঃ বিভিন্ন হইলেও অনুভব হয় তাহার বিপরীত—যে 'আমি' দর্শনের কর্ত্তা, সেই 'আমিই' স্পার্শনেরও কর্ত্তা। বিভিন্নস্বভাব ইন্দ্রিয় আত্মা হইলে কখনই ঐ উভয় ক্রিয়ার কর্ত্তা আত্মার অভেদ প্রতীতি হইতে পারিত না।

তাহার পর, দৃশ্যমান স্থূল দেহও আত্মা হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে, শরীরকেই সমস্ত পাপ পুণ্যের কর্ত্তা বলিতে

ব্রহ্মস্বরূপ। উপনিষদ্ ও তদনুগত যুক্তি দ্বারা ইহাই সমর্থিত হয়। সাংখ্য সম্প্রদায় বলেন—আত্মা নিত্য ও নির্গুণ সত্য, কিন্তু প্রতিদেহে ভিন্ন ভিন্ন স্থতরাং অনেক—এক নহে। অধিক কি, অতি প্রাকৃত লোকেরা "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" ইত্যাদি শ্রুতির দোহাই দিয়া পুত্রকেই আপনার আত্মা বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে, ইত্যাদি।

হয়। পাপ পুণ্যের ফল কর্ত্তাকেই ভোগ করিতে হয়; এ কথা অস্বীকার করিলে জাগতিক সমস্ত ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে। অথচ স্থূল দেহ নিত্য নহে,—বিনাশশীল; সুতরাং—

"শরীরদাহে পাতকাভাবাৎ ॥" ৩।১ ৪।

পাপ পুণ্যের অনুষ্ঠাতা শরীরের বিনাশ যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন তৎকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিবে কে? ভোক্তার অভাবে পুণ্য পাপ ও তৎফল স্বর্গ নরকাদি-ভোগ একান্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, একের কর্ম্মফল অপরকে ভোগ করিতে হইলে, জগতে কার্য্য কারণ-ব্যবস্থার কোনই সার্থকতা থাকে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, যে আত্মা যে কর্ম্মের কর্ত্তা, সেই আত্মাই কালান্তরে স্বকৃত সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। আত্মা অনিত্য বা দেহস্বরূপ হইলে, উক্ত নিয়ম কিছুতেই রক্ষা করা যাইতে পারে না। (১)

তাহার পর, দেহেন্দ্রিয়াদির ন্যায় মনকেও আত্মা বলিতে পারা যায় না; কারণ,—

(১) প্রধানতঃ চার্ব্বাক বা লোকায়তিক সম্প্রদায়ই দেহাত্মবাদী নামে প্রসিদ্ধ। তাহারা পঞ্চভূতোৎপন্ন স্থূল দেহকেই 'আত্মা' বলিয়া স্বীকার করেন। তাহারা বলেন—গুড় ও তণ্ডুলের সম্মিশ্রণে যেরূপ মদশক্তি প্রাদুর্ভূত হয়, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের সমবায়ে সমুৎপন্ন স্থূল দেহেও তদ্রূপ চেতনাশক্তির আবির্ভাব হয়। কিন্তু ঐ চেতনাশক্তির যখন এই দেহের সঙ্গেই উৎপত্তি ও ধ্বংস হয়, তখন মৃত্যুর পর তার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ভোগের সম্ভাবনা থাকে না, তাহা হইলে কর্ম্মের আনর্থক্য ও জগদ্বৈচিত্র্যের অসঙ্গতি হইয়া পড়ে। তাহা ত কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে।

"জ্ঞাতুর্জ্ঞানসাধনোপপত্তেঃ সংজ্ঞাভেদমাত্রম্" ॥ ৩। ১।১৭ ॥

জ্ঞাতার অভাবে যেমন জ্ঞান হইতে পারে না, তেমনি জ্ঞান-সাধনের (যাহার সাহায্যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার) অভাবেও জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্ব (জ্ঞানকর্তৃত্ব) সিদ্ধ হইতে পারে না ; সুতরাং জ্ঞানোৎপত্তির জন্য কর্ত্তা (জ্ঞাতা) ও করণ (জ্ঞানসাধন) উভয় থাকাই আবশ্যক হয়। এখন মনকেই যদি জ্ঞানের কর্ত্তা জ্ঞাতা—বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও, সংজ্ঞা যাহাই হউক না কেন, মনের স্থলবর্ত্তী অপর একটী জ্ঞান-সাধন অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে, যাহার সাহায্যে মনোরূপী কর্ত্তা জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারে। অতএব অতিরিক্ত পদার্থের কল্পনা করা যখন উভয় পক্ষেই সমান, তখন কেবল সংজ্ঞা লইয়া বিবাদ করা যে, অতি অকিঞ্চিৎকর উপেক্ষার যোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। (১)

---

(১) ন্যায়মতে আত্মা যেমন দেহেন্দ্রিয়াদির অতীত, তেমনি নিত্য চেতনও বটে। আত্মা নিত্য না হইলে, সদ্যোজাত শিশুর স্তন্যপানে প্রবৃত্তি ও হর্ষবিষাদাদি ভাব কখনই হইতে পারে না। কারণ, যে লোক কখনও যে বিষয় অনুভব করে নাই, সে লোকের কখনও সে বিষয়ে প্রবৃত্তি বা তদ্দর্শনে হর্ষবিষাদাদি উপস্থিত হইতে পারে না। অথচ শিশুগণের ঐসকল বিষয়ে ঐরূপ অবস্থাভেদ সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়; সুতরাং তাহা হইতে আত্মার জন্মান্তরীণ সংস্কার অনুমিত হয়। আত্মা অনিত্য হইলে—দেহের সঙ্গেই বিনষ্ট হইলে জন্মান্তরীণ সংস্কার তাহাতে আসিতে পারে না। কাজেই আত্মার নিত্যত্বস্বীকার করিতে হয়। সূত্রকারও—"পূর্ব্বাভ্যস্ত-স্মৃত্যনুবন্ধাৎ জাতস্য হর্ষভয়শোক-সম্প্রতিপত্তেঃ ॥" ৩।১।১৯। ইত্যাদিসূত্রে উক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

আত্ম-চিন্তার পরই দেহচিন্তা স্বাভাবিক। মানুষ যতক্ষণ প্রকৃত আত্মার খবর জানিতে পারে না, ততক্ষণ ভ্রান্তিবশে নশ্বর দেহকেই আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করে, এবং সমধিক আদর যত্নে তাহারই সেবায় আত্ম-নিয়োগ করে; কিন্তু যখন তাহার সে ভ্রান্তি ভাঙ্গিয়া যায়—বুঝিতে পারে যে, এই নশ্বর দেহ কখনই অমর আত্মা হইতে পারে না; আত্মা নিশ্চয়ই দেহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তখন প্রথমেই দৃশ্যমান দেহের স্বরূপ পরিচয়াদি জানিবার জন্য, তাহার অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি স্বতই জাগিয়া উঠে। তখন সে জানিতে চাহে—এতদিন যে দেহের এত আদর যত্ন করিয়াছি, সেই দেহের প্রকৃত পরিচয় কি প্রকার? এইরূপ চিন্তার ক্রমবিকাশানুসারেই আত্ম-চিন্তার পর শরীরচিন্তার অবতারণা করা হইয়াছে। শরীর কি?

"চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্ ॥" ১।১।১১ ॥

যাহা চেষ্টা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের (প্রয়োজনের) আশ্রয়, তাহার নাম শরীর। অভিপ্রায় এই যে, যাহাতে মানসিক প্রযত্নের ফলে চেষ্টা উপস্থিত হয়, কিংবা যাহাতে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়, অথবা সুখ-দুঃখরূপ অর্থ (প্রয়োজন) বিদ্যমান থাকে, তাহাই দৃশ্যমান স্থূল শরীর নামে পরিচিত। অর্থাৎ যাহা চেষ্টাশ্রয় বা ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়, কিংবা সুখ দুঃখরূপ অর্থের আশ্রয়, তাহাই শরীর (১)।

---

(১) এটী স্থূল শরীরের লক্ষণ। এখানে চেষ্টা অর্থ—অন্তঃকরণের প্রযত্নফলে, যে ব্যাপার উৎপন্ন হয়, তাহা। ইন্দ্রিয়াশ্রয় অর্থ—ইন্দ্রিয়গণ যাহার মধ্যে থাকিয়া ক্রিয়াশীল প্রতীত হয়। অর্থাশ্রয়—অর্থ—সুখ ও দুঃখ; তাহার আশ্রয়—অর্থাশ্রয়। সুখ ও দুঃখ যদিও মনেরই ধর্ম্ম, তথাপি

এখানে ইন্দ্রিয়পদে জ্ঞানেন্দ্রিয় বুঝিতে হইবে। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার—ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, ত্বক্ ও শ্রোত্র। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই ভৌতিক, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন। (৮) পৃথিবী হইতে ঘ্রাণ (নাসিকা), জল হইতে রসনা (জিহ্বা), তেজ হইতে চক্ষুঃ,,

শরীর ব্যতীত অন্যত্র তাহার উপলব্ধি হয় না ; এইজন্য শরীরকে 'অর্থাশ্রয়" বলা হইয়াছে।

(৮) ইন্দ্রিয়গণের ভৌতিকত্ব অবিসংবাদিত নহে। বেদান্তমতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ সকলেই ভৌতিক। বিশেষ এই যে, পঞ্চভূতের পৃথক্ পৃথক্ সাত্ত্বিক অংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পৃথক্ পৃথক্ রজোভাগ হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, আর পঞ্চভূতের মিলিত সাত্ত্বিক ভাগ হইতে মনের,এবং মিলিত রজোভাগ হইতে প্রাণের উৎপত্তি বর্ণিত আছে।

সাংখ্যমতে ইন্দ্রিয় ও মন ভৌতিক নহে,—আহঙ্কারিক। মূল প্রকৃতি হইতে প্রথমে বুদ্ধিতত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব, সেই অহঙ্কারের সাত্ত্বিকাংশ হইতেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন উৎপন্ন—কথিত আছে।

ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকতা পক্ষে যুক্তি এই যে, সাধারণতঃ এক একটী ইন্দ্রিয় কেবল এক একটী ভূতের গুণবিশেষ মাত্র গ্রহণ করে, কিন্তু অবিশেষে সকল ইন্দ্রিয়ই সকল ভূতের গুণ গ্রহণ করে না। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, যে ইন্দ্রিয় যে ভূত হইতে উৎপন্ন, সেই ইন্দ্রিয় সেই ভূতেরই গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে। আচার্য্যগণ বলেন—"স্বোপাদান-গুণগ্রহণপক্ষপাতো হীন্দ্রিয়ানাম্।"

এইরূপ পক্ষপাত নিবন্ধনই ঘ্রাণেন্দ্রিয় পৃথিবীর গুণ গ্রহণ করে ; জিহ্বা জলের গুণ রস, চক্ষু তেজের গুণ রূপ, ত্বক্ বায়ুর স্পর্শগুণ এবং শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশের শব্দ গুণ মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপ কার্য্য-

এবং আকাশ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। কেন যে, এরূপ কার্য্য-কারণভাব কল্পনা করা হইল, তদুত্তরে বলিতেছেন—

"ভূতগুণবিশেষোপলব্ধেস্তাদাত্ম্যম্ ॥" ৩।১ ৬৩।

যে ইন্দ্রিয় যে ভূত হইতে উৎপন্ন, সেই ইন্দ্রিয় প্রধানতঃ সেই ভূতেরই বিশেষ গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে। মনও একটী জ্ঞানেন্দ্রিয় সত্য ; কিন্তু উহা ভৌতিক বা জন্য পদার্থ নহে, নিত্য পদার্থ (৯)।

আলোচ্য ইন্দ্রিয়মাত্রই অতীন্দ্রিয় ; চক্ষুরাদি গোলক (কৃষ্ণসার প্রভৃতি) ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় মাত্র। ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ গোলকে থাকিয়া স্বস্ব বিষয় গন্ধাদি গ্রহণ করে ; এইজন্য বৌদ্ধসম্প্রদায় ঐ সমস্ত গোলককেই ইন্দ্রিয় বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন গোলক কখনও ইন্দ্রিয় হইতে পারে না ; গোলকই ইন্দ্রিয় হইলে দূরস্থ অতি বৃহৎ বা অতি সূক্ষ্ম পদার্থ গ্রহণ করা কোন

বৈচিত্র্য দর্শনেই ইন্দ্রিয়গণের ভৌতিকতা অনুমিত হইয়া থাকে। অবশ্য, বিরুদ্ধবাদীরা এ সকল যুক্তি মানেন না।

(৯) "পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশমিতি ভূতানি ॥" ১।১।১৩ ॥

"ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি ভূতেভ্যঃ ॥ ১।১।১৩ ॥

ন্যায়মতে মন একটী বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় ; অথচ সূত্র মধ্যে মনের নামটী পর্য্যন্ত নাই। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, এ সূত্র কেবল বহিরিন্দ্রিয়ের জন্যই রচিত হইয়াছে ; সূত্র মধ্যে কেবল পাঁচটী বহিরিন্দ্রিয়েরই উল্লেখ করা হইয়াছে। মন ইন্দ্রিয় হইলেও অন্তরিন্দ্রিয় ; সুতরাং তাহার উল্লেখ এখানে হইতেই পারে না। নচেৎ সূত্রমধ্যে 'ভূতেভ্যঃ' বলাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, মন ত কোন ভূত হইতেই উৎপন্ন নহে ; উহা নিত্য পদার্থ।

ইন্দ্রিয়ের পক্ষেই সম্ভব হইত না। ক্ষুদ্র আলোক কখনই অতিবড় হিমাচলকে প্রকাশ করিতে পারে না; সুতরাং পরিচ্ছিন্ন গোলকই ইন্দ্রিয় হইলে ঐ জাতীয় আরও অনেক দোষ উপস্থিত হইতে পারে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আলোচ্য ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা এক কি অনেক? যদি বিভিন্ন গোলকের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ এক ইন্দ্রিয় দ্বারাই সমস্ত কাজ চলিতে পারে, তাহা হইলে অনেক ইন্দ্রিয়-স্বীকারে কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। এই কারণে কেহ কেহ বলেন— "ত্বগব্যতিরেকাৎ ॥ ৩।১।৫৫।

ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয়, তদতিরিক্ত অপর ইন্দ্রিয় স্বীকারে কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, ত্বকের সহিত সম্বন্ধরহিত এমন কোন গোলকই (ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান স্থানই) নাই, যাহার জন্য ত্বগতিরিক্ত ইন্দ্রিয় স্বীকার করা আবশ্যক হইতে পারে; সুতরাং একমাত্র ত্বগিন্দ্রিয়ই বিভিন্ন গোলকের সাহায্যে শব্দ স্পর্শাদি বিভিন্ন বিষয় গ্রহণপূর্ব্বক বিচিত্র ব্যবহার নিষ্পাদন করিতে সমর্থ হয়। তদুত্তরে আচার্য্য গৌতম বলিতেছেন—

"ন, যুগপদর্থানুপলব্ধেঃ ॥" ৩।১।৫৬।

না, ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে; কারণ, তাহা হইলে একই সময়ে শব্দ স্পর্শাদি বহু বিষয়ের উপলব্ধি হইতে পারিত; তাহা যখন হয় না, তখন ইন্দ্রিয়ও এক নহে—বিষয়ের প্রভেদানুসারে ইন্দ্রিয় অনেক (১০)। ইহা ছাড়া, বিশেষতঃ—

(১০) তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বদেহব্যাপী ত্বক্ই যদি একমাত্র ইন্দ্রিয় হইত, তাহা হইলে ত্বগিন্দ্রিয় যে সময় স্পর্শ গ্রহণ করে, ঠিক সেই সময়েই

"বিপ্রতিষেধাচ্চ ন ত্বগেকা ॥" ৩।১।৫৭।

বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নিবন্ধনও ত্বক্ই যে, একমাত্র ইন্দ্রিয়, এ কথা বলা যায় না। কারণ, [একেন্দ্রিয় পক্ষে] ত্বক্ যখন রূপ দর্শন করে, তখন সেই রূপের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের ত. প্রাপ্তি সম্বন্ধ থাকে না, রূপ ও ত্বকের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধানই থাকে ; সেই ত্বক্ই আবার যখন স্পর্শগুণ গ্রহণ করে, তখন সেই স্পর্শের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের প্রাপ্তি থাকা আবশ্যক হয়। অথচ একই ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে এইরূপ ব্যবস্থাভেদ কথনই সমর্থন করা যাইতে পারে না ; কারণ, বস্তুর স্বভাব একই প্রকার হইয়া থাকে, নানাপ্রকার হয় না। ত্বগিন্দ্রিয়কে, হয় সংবন্ধ-পূর্ব্বক, না হয় অসংবন্ধ-পূর্ব্বক বিষয়-গ্রাহক বলিতে হইবে, কিন্তু এক স্থানে বিষয় দেশে গমন, অন্যত্র তাহার ব্যতিক্রম, এরূপ অনিয়মিত স্বভাব কল্পনা করা ন্যায় ও যুক্তিবিরুদ্ধ (১১)। অতএব পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় কল্পনা করাই যুক্তিসম্মত।

শব্দ ও গন্ধ প্রভৃতি বিষয় গ্রহণ করাও তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে ; কারণ, বিষয় সন্নিহিত থাকিলে তাহা গ্রহণ না করিবার কোনই কারণ নাই ; অথচ একই সময়ে বহু বিষয়ের গ্রহণ কোথাও দৃষ্ট হয় না। বলা আবশ্যক যে, উল্লিখিত যুক্তিটী বিশেষ বিচারসহ নহে ; কারণ, একই সময়ে বহু বিষয়ের গ্রহণ করা স্বীকার করিলে উক্ত আপত্তির কোনই মূল্য থাকে না ; কারণ, সাংখ্যশাস্ত্রে একই সময়ে বহু বিষয়ের গ্রহণও স্বীকৃত হইয়াছে।

(১১) তাৎপর্য্য—প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে ত্বগিন্দ্রিয়ের স্বভাব

উল্লিখিত পঞ্চপ্রকার ইন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় বা ভোগ্য—

"গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণা স্তদর্থাঃ ॥" ১।১।১৪ ॥

গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, এই পাঁচটী পৃথিবীপ্রভৃতি পঞ্চ ভূতের নিজস্ব গুণ (বিশেষ ধর্ম্ম) ; এবং এই পাঁচটী গুণই যথাক্রমে উক্ত পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের বিষয় ; এই কারণে উহারা 'অর্থ' নামক চতুর্থ প্রমেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

উল্লিখিত ইন্দ্রিয়ার্থ (শব্দাদি বিষয়), ইন্দ্রিয় ও চেষ্টা যাহাকে আশ্রয় করিয়া ব্যবহার নিষ্পাদন করিয়া থাকে, তাহার নাম শরীর। ইহাই ন্যায়মতে শরীরের সম্পূর্ণ লক্ষণ বা পরিচয়। এই শরীরের ঔপাদানিক সত্তা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ থাকিলেও মনুষ্যশরীরের সম্বন্ধে মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন—

"পার্থিবং গুণান্তরোপলব্ধেঃ ॥" ৩।১ ২৮ ॥

কিরূপ ? বিষয়দেশে যাইয়া বিষয় গ্রহণ করাই তাহার স্বভাব ? না, স্বস্থানে থাকিয়া বিষয় গ্রহণ করা ? তন্মধ্যে প্রথম পক্ষ স্বীকার করা যায় না ; কারণ, রস ও স্পর্শ গ্রহণের সময় ত্বগিন্দ্রিয়কে বিষয়ক্ষেত্রে যাইতে হয় না ; বিষয়ই আসিয়া ইন্দ্রিয়ের নিকট উপস্থিত হয়। এই কারণেই দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত হয় না। কেন না, শব্দ গন্ধ ও রূপ গ্রহণের সময়েও ইন্দ্রিয়কে আর বাহিরে যাইতে হইবে না ; সুতরাং দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত হয় না। আর যে, কখনও গমন, আবার কখনও অগমন, এরূপ বিরুদ্ধ স্বভাব কল্পনা করা, অচেতন পদার্থের সম্বন্ধে তাহা কখনও যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। অতএব একেন্দ্রিয় পক্ষ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য ; এবং শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচ প্রকার বিষয় গ্রহণের জন্য পৃথক্ পৃথক্ পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের সদ্ভাব স্বীকার করাই আবশ্যক।

মনুষ্য-শরীর সাধারণতঃ পার্থিব—পৃথিবী উপাদানে নির্ম্মিত ; কারণ, মনুষ্যদেহে—পৃথিবীগত গন্ধ, কঠিন স্পর্শ ও নীলরূপাদি কতিপয় বিশিষ্ট গুণ অনুভূত হইয়া থাকে। ঐ সমুদয় পার্থিব গুণ থাকায় বুঝা যায় যে, বস্তুতঃ পৃথিবীই মনুষ্য-শরীরের উপাদান কারণ ; অন্যান্য ভূতসকল তাহার সহকারীরূপে সাহায্য করে মাত্র।

এইরূপ জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় দেহও বরুণাদি লোকে বিদ্যমান আছে, বুঝিতে হইবে। সে সকল স্থানেও এক একটী ভূতই প্রধানতঃ শরীরারম্ভক উপাদান কারণ ; অপর ভূতচতুষ্টয় তাহারই সহায়করূপে সম্মিলিত থাকে (১)।

প্রত্যেক শরীরে এইরূপে পঞ্চভূতের সম্বন্ধ থাকায় শরীর সম্বন্ধে ত্রিভৌতিকত্ব, চাতুর্ভৌতিকত্ব ও পাঞ্চভৌতিকত্ব প্রভৃতি মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে (২)। কিন্তু যতই মতভেদ থাকুক

---

(১) সূর্য্যমণ্ডলে তেজোময়, বরুণলোকে ও চন্দ্রমণ্ডলে জলময় ও বায়ুলোকে বায়বীয় দেহ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। ফলকথা, দেহমাত্রই পাঞ্চভৌতিক। তন্মধ্যে একটী উপাদান, অপরগুলি তাহার সহায়ক। বাৎস্যায়ন মুনি বলিয়াছেন—

"পঞ্চানাং ভূতানাং সংযোগে সতি শরীরং ভবতি, ভূতসংযোগো হি মিথঃ পঞ্চানাং ন নিষিদ্ধ ইতি, আপ্য-তৈজস-বায়ব্যানি লোকান্তরে শরীরাণি। তেষপি ভূতসংযোগঃ পুরুষার্থতন্ত্র ইতি।" ভাষ্যম্ ৩।১।২৮

অর্থাৎ পঞ্চভূতের সংযোগ ব্যতীত শরীর নিষ্পন্ন হয় না। পঞ্চভূতের পরস্পর সংযোগ কোথাও নিষিদ্ধ হয় নাই। বিশেষতঃ অন্যান্য লোকেও জলীয় তৈজস ও বায়বীয় শরীর প্রসিদ্ধ আছে। ইত্যাদি

(২) কেহ কেহ বলেন—"পার্থিবাপ্যতৈজসং তদ্‌গুণোপলব্ধেঃ।"

না কেন, আকাশকে কেহই দেহোপাদান বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কারণ, আকাশ নিজে অপ্রত্যক্ষ্য; সুতরাং তদারব্ধ বস্তু কখনও প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারে না; অতএব আকাশও যদি পৃথিব্যাদির ন্যায় দেহের উপাদান হইত, তবে নিশ্চয়ই আকাশারব্ধ দেহও অপ্রত্যক্ষই থাকিত। এইজন্য কোন মতেই দেহের পাঞ্চভৌতিকত্ব স্বীকৃত হয় নাই।

দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের মধ্যে এপর্য্যন্ত আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ, এই চারিটী মাত্র বাহ্য প্রমেয়ের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং তৎসম্পর্কে সংক্ষেপতঃ কিঞ্চিৎ আলোচনাও করা হইয়াছে। অতঃপর অবশিষ্ট প্রমেয়ের মধ্যে আন্তর প্রমেয় বুদ্ধি ও মনের কথা বলিতে হইবে। মহর্ষি গোতম 'বুদ্ধি'র পরিচয়

অর্থাৎ পৃথিবী জল ও তেজঃ, এই ভূতত্রয়ই শরীরের উপাদান; যেহেতু ভূতত্রয়েরই গুণ—গন্ধ, রস ও উত্তাপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অপরে বলেন—শরীর চাতুর্ভৌতিক;

"নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসোপলব্ধেশ্চাতুর্ভৌতিকম্॥"

অর্থাৎ শরীরে উক্ত গন্ধাদির ন্যায় বায়ুধর্ম্ম নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও যখন দৃষ্ট হয়, তখন পৃথিবী প্রভৃতির ন্যায় বায়ুকেও উহার উপাদান বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অপর পণ্ডিতগণ—

"গন্ধ-ক্লেদ-পাক-ব্যূহাবকাশদানেভ্যঃ পাঞ্চভৌতিকম্॥" ৩।১।১২৯,১৩১॥

অর্থাৎ 'পৃথিবীর গন্ধ, জলের আর্দ্রীভাব, তেজের পাক (উষ্মা), বায়ুর সংশোধন ও আকাশের অবকাশ দান দৃষ্টে দেহকে পাঞ্চভৌতিক বলিয়া স্বীকার করেন।

দিতে যাইয়া বড় বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই; তিনি বলিয়াছেন—

"বুদ্ধিরুপলব্ধির্জ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্ ॥" ১।১।১৫ ॥

বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান, এই তিনই সমানার্থক পর্য্যায় শব্দ। শুদ্ধ এই কথা বলিয়াই তিনি নিরস্ত হইয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বুদ্ধির একটুকু পরিচয় দিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহাতেও তিনি বড় বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—'বুদ্ধি' শব্দ উচ্চারণ করিলে লোকে যাহা বোঝে, তাহাই 'বুদ্ধি', অথবা 'জ্ঞানত্ব' এক প্রকার জাতি (ধর্ম্ম), সেই জাতিবিশিষ্ট পদার্থই 'বুদ্ধি'। ইহার অধিক আর কিছু তিনি বলিতে পারেন নাই (৩)

অতঃপর মনের লক্ষণ বলা হইতেছে—ঘ্রাণ রসনা প্রভৃতি যেমন পাঁচটী বহিরিন্দ্রিয় আছে, তেমনি অন্তরিন্দ্রিয়ও আর একটী আছে; তাহার নাম মনঃ। অদৃশ্য অন্তরিন্দ্রিয়ের অস্তিত্বে প্রমাণ কি? এতদুত্তরে বলিতেছেন—

"যুগপদ্ জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্ ॥" ১।১।১৬ ॥

অর্থাৎ রূপরসাদি বহু বিষয়ের সহিত চক্ষুঃপ্রভৃতি অনেক ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ সত্ত্বেও, একই সময়ে যে, রূপাদি বহু বিষয়ের

---

(৩) "তথাচ, বুদ্ধ্যাদিপদবাচ্যত্বম্, অনুভবসিদ্ধ-জ্ঞানত্বজাতিরেব বা লক্ষণম্ ইতি"।

সাংখ্যমতে বুদ্ধিকে মনের মত একটী স্বতন্ত্র অন্তঃকরণ, বলিয়া স্বীকার করা হয়। সেই বুদ্ধির বৃত্তির নাম জ্ঞান ও উপলব্ধি।

উপলব্ধি বা জ্ঞান হয় না, তাহা দ্বারা চক্ষুঃ প্রভৃতির অতিরিক্ত জ্ঞানসাধন মনের অস্তিত্ব অনুমিত হয় (৪)। কেন না, মন অতি সূক্ষ্ম পদার্থ—অণুপরিমাণ; সুতরাং সে এক সঙ্গে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইতে পারে না; মনের সম্বন্ধ না থাকায় তদ্দ্বারা তদ্বিষয়ে জ্ঞানও হইতে পারে না; এই জন্যই জ্ঞানের যৌগপদ্য দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, মন যদি অণুপরিমাণ না

(৪) অভিপ্রায় এই যে, কেবল চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই যদি রূপাদি বিষয়ে জ্ঞান হইত, তাহা হইলে, যখন বহু বিষয়ের সহিত বহু ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ উপস্থিত হয়, তখন সেই একই সময়ে সেই, সকল বিষয়েরই জ্ঞান হইতে পারে; কেন না, উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান সত্ত্বে কার্য্য না হইবার কোন কারণ দেখা যায় না, অথচ এক সঙ্গে কখনও দুইটী মাত্র জ্ঞানও উৎপন্ন হয় না। এক্ষেত্রে যদি বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগের ন্যায় মনঃসংযোগও জ্ঞানোৎপত্তির কারণ হয়, তাহা হইলেই উক্ত দোষ সম্ভাবিত হয় না! কারণ, মন অতি সূক্ষ্ম; এক সঙ্গে দুইটী ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিতে পারে না; এইজন্য এক সঙ্গে বহু বিষয়ে জ্ঞানও হয় না।

কখন কখন যে, একই সঙ্গে বহু বিষয়ে জ্ঞান হইতেছে বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ তাহা ভুল। এক সঙ্গে একশত পদ্মপত্রকে সূচীবিদ্ধ করিলে যেরূপ মনে হয় যে, একই সময়ে যেন সমস্ত পত্রগুলি সূচীবিদ্ধ হইয়াছে; প্রকৃত-পক্ষে কিন্তু একই সময়ে উহারা বিদ্ধ হয় নাই, পরন্তু পর পর এক একটী করিয়া বিদ্ধ হইয়াছে। খুব অল্প সময়ে বোধ হওয়ায় যেরূপ উহাদের বোধে ক্ষণভেদ প্রতীত হয় না, তদ্রূপ খুব সূক্ষ্ম বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান হয় বলিয়াই ক্ষণভেদ বুঝিতে পারা যায় না; সেইজন্যই জ্ঞানের যৌগপদ্য-ভ্রম হইয়া থাকে।

হইয়া বিভু—সর্ব্বব্যাপী হইত, তাহা হইলে জ্ঞানের যৌগপদ্যও অনিবার্য্য হইত।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে,—অন্তঃকরণরূপী মন এক কি অনেক? তদুত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন—

"স্ফটিকান্যত্বাভিমানবৎ তদন্যত্বাভিমানঃ॥" ৩।১।৯॥

অন্তঃকরণরূপী মন স্বরূপতঃ একই বটে; কিন্তু সেই একই মন—একই স্ফটিক যেমন নানাবিধ উপাধিযোগে নানা বর্ণে রঞ্জিত হওয়ায় নানা বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনি বিভিন্নপ্রকার বৃত্তিসহযোগে নানাকারে চিত্রিত হইয়া অনেকাকারে প্রতিভাত হয় মাত্র। বস্তুতঃ অন্তঃকরণরূপী মন একই—নানা নহে (৫)।

এই প্রসঙ্গে মহর্ষি গোতম বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের সিদ্ধান্ত উত্থাপনপূর্ব্বক প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, বৌদ্ধসম্মত ক্ষণিক বিজ্ঞান ও আমাদের অভিমত মন এক পদার্থ নহে; এবং জ্ঞান কখনও মনের গুণ নহে, পরন্তু আত্মারই ধর্ম্ম; কেবল মনের সহিত আত্মার সংযোগের

(৫) কোন কোন বৈদান্তিক একই অন্তঃকরণের চারি প্রকার বিভাগ কল্পনা করিয়া থাকেন। যথা—

"মনো বুদ্ধিরহংকারশ্চিত্তং করণমান্তরম্।
সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে॥"

অর্থাৎ অন্তঃকরণ চারিপ্রকার—মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত। তন্মধ্যে মনের কার্য্য সংশয়—সংকল্প বিকল্প, বুদ্ধির কার্য্য নিশ্চয়, অহঙ্কারের কার্য্য গর্ব্ব—অভিমান। চিত্তের কার্য্য—স্মরণ, এইরূপে চারি প্রকার ভেদ স্বীকার করেন।

ফলে জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; কাজেই মনকে জ্ঞানোৎপত্তির সাধন বলা হইয়া থাকে। অতঃপর প্রবৃত্তির কথা বলা হইতেছে। প্রবৃত্তির পরিচয় দিতে যাইয়া মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন—

"প্রবৃত্তির্বাগ্বুদ্ধি-শরীরারম্ভঃ" ॥ ১।১ ১৭ ॥

অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও শরীর দ্বারা যে চেষ্টা বা যত্ন সমুৎপাদিত হয়, তাহার নাম প্রবৃত্তি। আমাদের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা সাধারণতঃ তিন রকমে সম্পন্ন হইয়া থাকে—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। তন্মধ্যে কায়িক প্রবৃত্তির ফল—গমনাগমন প্রভৃতি, বাচিক প্রবৃত্তি হইতে শব্দোচ্চারণ, এবং মানসিক প্রবৃত্তি হইতে ধ্যান ধারণা দয়া প্রভৃতি কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। মনুষ্যকৃত পুণ্য পাপও উক্ত ত্রিবিধ প্রবৃত্তির ফল। শরীরসাধ্য দানাদি কার্য্য পুণ্যের, আর হিংসা বা পরপীড়নাদি কার্য্য পাপের জনক। বাগিন্দ্রিয়-নিষ্পাদ্য সত্যবচন পুণ্যের, আর অসত্যাদি ভাষণ পাপের কারণ; এইরূপ মানসিক ধ্যানাদি কার্য্যে পুণ্যের, আর পরানিষ্টচিন্তনাদি কার্য্য পাপের জনক। দোষই উল্লিখিত ত্রিবিধ প্রবৃত্তির প্রযোজক। দোষ কি?

"প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষাঃ ॥" ১।১।১৮ ॥

"তৎ-ত্রৈরাশ্যং রাগ-দ্বেষ-মোহার্থান্তরভাবাৎ ॥" ৪।১ ৩ ॥

যাহা প্রবৃত্তির কারণ, অর্থাৎ লোক যাহার প্রেরণায় ভাল-মন্দ বা পাপ পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহার নাম দোষ। সেই দোষ তিন ভাগে বিভক্ত—রাগ, দ্বেষ ও মোহ। রাগ অর্থ—আসক্তি বা অনুরাগ। দ্বেষ অর্থ—অমর্ষ বা বিদ্বেষ। আর মোহ

অর্থ—ভ্রান্তিজ্ঞান—এক বস্তুকে অন্য বস্তুরূপে অথবা অসম্পূর্ণরূপে জানা (৬)।

আমরা যখনই যে কার্য্য করিয়া থাকি, রাগ বা দ্বেষই তাহার মূল। কখনও অনুরাগের বশে কাহারও অনুগ্রহ করিয়া থাকি, কখনও বা দ্বেষবশে কাহারো প্রতি নিগ্রহের চেষ্টা করিয়া থাকি। যাহার রাগ বা দ্বেষ নাই, তাহার ইষ্টানিষ্টবুদ্ধিও থাকে না; থাকে কেবল—ঔদাসীন্য। উক্ত রাগ ও দ্বেষের মূল হইতেছে মোহ; সুতরাং মোহই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দোষ। সূত্রকার বলিয়াছেন—

"তেষাং মোহঃ পাপীয়ান্ নামূঢ়স্যেতরোৎপত্তেঃ॥" ৪।১।৪॥

মোহ বা মিথ্যাজ্ঞান ব্যতিরেকে যখন রাগ ও দ্বেষ উপস্থিতই হইতে পারে না, তখন দোষের মধ্যে মোহকেই সর্ব্বাপেক্ষা অনর্থকর দোষ বলিয়া জানিতে হইবে। অতএব সর্ব্বানর্থের নিদান এই মোহ-সমুচ্ছেদে সচেষ্ট হওয়া সকলের পক্ষেই আবশ্যক (৭)।

---

(৬) মানসিক অপরাপর যে সকল বৃত্তি লোককে কার্য্য-বিশেষে প্রবৃত্ত করে, সে সমুদয় বৃত্তিও উক্ত রাগ, দ্বেষ ও মোহেরই অন্তর্গত বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেমন—কাম, স্পৃহা, লোভ ও মাৎসর্য্য রাগের অন্তর্গত। ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া, দ্রোহ প্রভৃতি দ্বেষের, ও সংশয়, বিপর্য্যয়, মান, প্রমাদ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি মোহের অন্তর্ভূত। এই জাতীয় আরও যে সকল মনোবৃত্তি মানুষকে কার্য্যবিশেষে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে, সেগুলিকেও যথাযোগ্যরূপে উক্ত তিন প্রকার দোষেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হইবে।

(৭) অভিপ্রায় এই যে, সকল লোকই নিজ নিজ দেহকে আত্মা

উল্লিখিত দোষবশতঃ জীবগণ নিরন্তর প্রেত্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রেত্যভাব কি ?—

"পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ ॥" ১।১।১৯ ॥

জীবগণের যে, পুনরুৎপত্তি অর্থাৎ বারংবার জন্ম-মরণসম্বন্ধ, তাহার নাম প্রেত্যভাব। প্রেত্যভাব অর্থ—প্রয়াণ বা মৃত্যুর পরেও বর্তমান থাকা—উৎপত্তি বা জন্মগ্রহণ করা। এইরূপে শরীর গ্রহণের ফল কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—

"প্রবৃত্তি-দোষজনিতোঽর্থঃ ফলম্ ॥" ১।১।২০ ॥

দোষবশে লোকের শুভাশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে; সেই প্রবৃত্তি অনুসারে আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম সঞ্চয় করে; সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে যাহা সমুৎপন্ন হয়; সেই সুখ ও দুঃখের উপভোগই প্রেত্যভাবের ফল। অভিপ্রায় এই যে, প্রথমে মোহ বা মিথ্যাজ্ঞান আসিয়া লোকের জ্ঞানশক্তিকে কলুষিত করিয়া রাখে, তাহার ফলে—লোকে সত্যকে অসত্য, অসত্যকে সত্য এবং অনাত্মাকে আত্মা, আর আত্মাকে অনাত্মা বলিয়া গ্রহণ করে।

বাসে, এবং যাহা দ্বারা সেই দেহের কোনরূপ অপকার হয় বা হইতে পারে, তাহার প্রতি বিদ্বেষ করিয়া থাকে। অনাত্মা দেহের উপর যে, আত্মবুদ্ধি বা 'আমি আমার' ইত্যাকার মোহ (ভ্রম), তাহা হইতেই উক্ত রাগ ও দ্বেষের আবির্ভাব হইয়া থাকে। দেহ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি (আত্মা) নয়, তথাপি দেহেতে যে, 'অহংবুদ্ধি' (আমি বলিয়া জ্ঞান) তাহা নিশ্চয়ই ভ্রম বা মিথ্যাজ্ঞান; এই মিথ্যা জ্ঞানরূপী মোহ উপস্থিত হইবার পরেই দেহের উপর একটা অনুরাগ উপস্থিত হয়, এবং দেহাপকারীর প্রতি বিদ্বেষ আসিয়া দেখা দেয়। তৃতীয় সূত্রে (দুঃখজন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাম্') সূত্রেই একথা স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে।

এইরূপ ভ্রান্তি বা মোহ বশতঃ স্বভাবে রাগ-দ্বেষাদি দোষের পুনরাবির্ভাব হয়; এবং সেই দোষের প্রেরণায় লোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম-জনক কর্ম্মে—প্রবৃত্ত হয়। ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল সুখ-দুঃখভোগ; সেই সুখ-দুঃখ-ভোগের জন্যই জীব শরীরান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। জগতে সুখ দুঃখ সকলেরই পরিচিত; সুতরাং বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা উহাদের পরিচয় প্রদান করা অনাবশ্যক। এইজন্য সূত্রকার সহজ কথায় দুঃখের পরিচয় দিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

"বাধনালক্ষণং দুঃখম্।" ১।১।২১॥

দুঃখ কি? না, বাধনা—পীড়া। পীড়াই দুঃখের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক; এতদতিরিক্ত দুঃখের আর লক্ষণ হইতে পারে না। জন্মই দুঃখের নিদান; সুতরাং দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই দুঃখভোগের উপায়স্বরূপ (৮)। প্রচলিত বৈষয়িক সুখও প্রকৃতপক্ষে দুঃখের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত; সুতরাং বিবেকী জনের নিকট

---

(৮) সূত্রকার বলিয়াছেন— বিবিধবাধনাযোগাৎ দুঃখমেব জন্মোৎপত্তিঃ॥" শরীর ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধরূপ উৎপত্তিই সর্ব্বপ্রকার বাধনা বা দুঃখসম্বন্ধের কারণ; এই কারণে মুমুক্ষুগণ শরীরেন্দ্রিয় প্রভৃতি ভোগ-সাধনগুলি 'দুঃখ' বলিয়া ভাবনা করিবেন। মহর্ষি পতঞ্জলিও ঠিক এতদনুরূপ কথা বলিয়াছেন—

"পরিণাম-তাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বম্॥
বিবেকিনঃ॥" ২।১৫।

অতএব বৈরাগ্য সম্পাদনের জন্য মুমুক্ষুর পক্ষে এরূপ ভাবনা খুবই আবশ্যক।

ঐ সমস্তই দুঃখপক্ষে নিক্ষিপ্ত, অর্থাৎ দুঃখেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। এই দুঃখের আত্যন্তিক অবসানই জীবের অপবর্গ এবং চরম লক্ষ্য।

'তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ॥" ১।১।২২॥

এখানে বলা আবশ্যক যে, অপবর্গদশায় জীবের যেমন দুঃখ থাকে না, তেমনি কোনপ্রকার সুখবোধও থাকে না। বস্তুতঃ সে সময় অজ্ঞান-জনিত দেহেন্দ্রিয়াদিগত আত্মবুদ্ধি ও বর্ণাশ্রমাদি বিশেষভাবঘটিত স্বগত অহঙ্কার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন জীব প্রকৃত পক্ষে পাষাণখণ্ডের মত নিস্পন্দ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে মাত্র; কোন প্রকার অনুভূতিই তাহার থাকে না। এই জন্য দার্শনিক কবি শ্রীহর্ষ স্বকৃত 'নৈষধচরিতে' কলির মুখে মহর্ষি গোতমের নিন্দাচ্ছলে বলিয়াছেন—

"মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমাহ সচেতসাম্।
গোতমং তমবেত্যৈব যথা বিত্থ তথৈব সঃ॥"

অর্থাৎ যে মহামুনি শিলাভাবপ্রাপ্তির ন্যায় মুক্তিলাভের উপায় প্রদর্শনের নিমিত্ত শাস্ত্র (ন্যায় দর্শন) রচনা করিয়াছেন, তাঁহাকে গো-তম জানিয়া যেরূপ বোঝ, তিনি সেইরূপই বটে, অর্থাৎ তোমাদের বুদ্ধিতে তিনি যেরূপই হন, সেই রূপই থাকুন; আমরা কিন্তু তাঁহাকে 'গো-তম' (শ্রেষ্ঠ গো) বলিয়াই মনে করি। বস্তুতঃ মুক্তিতে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি সম্বন্ধে কাহারো বিবাদ না থাকিলেও আত্মার তদানীন্তন অবস্থা বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এখানে সে কথার আর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি কখনও সম্ভবপর হয় কি না? আপাততঃ কিন্তু উহা অসম্ভবই মনে হয়; কেন না;—

"ঋণক্লেশ-প্রবৃত্ত্যনুবন্ধাদ্ অপবর্গাভাবঃ॥" ৪।১।৫৯॥

দুরপনেয় ক্লেশকর ত্রিবিধ ঋণ পরিশোধের জন্য পাপপুণ্যময় কর্ম্মপ্রবৃত্তির উচ্ছেদ যখন কখনও সম্ভবপর হয় না, তখন দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ অপবর্গও কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না।

শ্রুতি বলিতেছেন, "জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঃ ঋণৈঃ ঋণবান্ জায়তে।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জন্মসময়েই তিনপ্রকার (ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ) ঋণগ্রস্ত হইয়া জন্ম লাভ করেন। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিঋণ, যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ ও সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া তাঁহাকে মুক্ত হইতে হয় (১)। এইরূপ ঋণপরিশোধ করিতে হইলে, প্রকৃতপক্ষে সারাজীবনই তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের অনুষ্ঠানে লিপ্ত থাকিতে হয়। কর্ম্মানুষ্ঠানমাত্রই ক্লেশসাধ্য; সুতরাং জীবদবস্থায় ত দুঃখনিবৃত্তির সম্ভবই হয় না; দেহত্যাগের পরেও হয় না; কারণ, দীর্ঘজীবনব্যাপী ক্লেশকর কর্ম্মানুষ্ঠানে যে, পুণ্য-পাপ উপার্জ্জিত হয়, সেই পুণ্য-পাপের

---

(১) মনু বলিয়াছেন—"ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষং তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥"

অর্থাৎ অগ্রে ত্রিবিধ ঋণ পরিশোধ করিবে; পরে মুক্তির দিকে মনোনিবেশ করিবে। যে লোক উক্ত ঋণত্রয় পরিশোধ না করিয়া মোক্ষপথের সেবা করে, সে লোক অধোগামী হয়।

ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ ত তাহাকে পরলোকেও ভোগ করিতেই হইবে; অতএব কোন জীবেরই অপবর্গ বা আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি সম্ভবপর হয় না। এতদুত্তরে সূত্রকার গোতম বলিতেছেন যে, না, এরূপ আশঙ্কা সমীচীন হয় না; কারণ—

"প্রধানশব্দানুপপত্তেগুর্ণশব্দেনানুবাদঃ, নিন্দাপ্রশংসোপপত্তেঃ ॥"

এবং—" সমারোপণাদাত্মন্যপ্রতিষেধঃ ॥" ৪।১।৬০,৬১।

'জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণঃ ত্রিভিঃ ঋণৈঃ ঋণবান্ জায়তে।'

এই বাক্যে 'ঋণ' শব্দটী গৌণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, মুখ্যার্থে নহে। উত্তমর্ণ-অধমর্ণরূপে যে, অর্থের আদান-প্রদান, তাহাই ঋণ-শব্দের মুখ্য অর্থ। এখানে সেরূপ অর্থ একেবারেই অসম্ভব; কাজেই উহা গৌণার্থক, ঋণ-পরিশোধ যেরূপ অবশ্য করণীয়, ইহাও তেমনই অবশ্য পরিশোধ্য, এবং ঋণ পরিশোধন যেরূপ প্রশংসার কারণ, আর তাহা না করা যেমন নিন্দার কারণ, ইহাও ঠিক তেমনই প্রশংসা ও নিন্দার কারণ হইয়া থাকে। এই জন্য উক্ত ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ ও সন্তানোৎপাদনকে 'ঋণ' শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ উহা ঋণ নহে, এবং তদ্বিষয়ে বিধিও নাই; অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি ঐ সমুদয় কার্য্য না করিলেও প্রত্যবায়ভাগী হইবেন না; কাজেই সকলের পক্ষে সকল অবস্থায় উহার অনুষ্ঠানজনিত ক্লেশানুবৃত্তির সম্ভাবনা নাই।

বিশেষতঃ ঐ শ্রুতির অন্য প্রকার অর্থও হইতে পারে। যথা—ব্রাহ্মণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-বালক উপনীত

হইবামাত্র উল্লিখিত তিনপ্রকার ঋণ প্রাপ্ত হয়, তৎপূর্ব্বে নহে। উপনয়নের পর হইতে জরাপ্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ আয়ুর চতুর্থভাগ আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই কর্ম্মের বিধি; পরে আর ঋণ-সম্পর্ক নাই; সুতরাং সে সময় তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তিলাভ করা অসম্ভব হয় না।

[মুক্তি]

আরও এক কথা, অর্থিত্ব (কামনা), সমর্থত্ব (শক্তি) ও অনিষিদ্ধত্ব (শাস্ত্রীয় নিষেধের অভাব), এই তিনটীই লোকের কর্ম্ম-প্রবৃত্তির প্রযোজক। স্বর্গার্থী লোক অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু স্বর্গলাভের অভিলাষী লোকও যদি জরা বা বার্দ্ধক্যবশতঃ অনুষ্ঠানে অশক্ত হয়, তবে তাহার পক্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না। তাহার পর, কোন ব্রাহ্মণ যদি শক্তিমান্ ও স্বর্গার্থী হন, তাহা হইলেও, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে পারেন না; কেন না, শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের পক্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

অতএব, বার্দ্ধক্যবশতই হউক, কিংবা স্বর্গাদি-ভোগে কামনার অভাব বশতই হউক, যে লোক কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তিশূন্য, তাহার পক্ষে মুক্তি-পথে অগ্রসর হওয়া কখনই অসম্ভব নহে।

তাহার যাবজ্জীবন অনুষ্ঠেয়রূপে বিহিত 'অগ্নিহোত্র' বা যজ্ঞাদি কর্ম্মও মুক্তিপথের বাধক হইতে পারে না। কারণ, যে শাস্ত্র যাবজ্জীবন 'অগ্নিহোত্র' কর্ম্মের বিধান দিয়াছেন, সেই শাস্ত্রই

আবার পুরুষের বীতরাগ অবস্থায় অগ্নিত্যাগের উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন—

"প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ব্ববেদস-দক্ষিণাম্।
আত্মন্যগ্নিং সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বীতরাগ দশায় 'প্রাজাপত্য' নামক যজ্ঞ সমাপন করিয়া এবং তাহাতে সমস্ত সম্পত্তি দক্ষিণারূপে দান করিয়া, পূর্ব্বগৃহীত অগ্নি আত্মাতে অর্পণ করত গৃহাশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবেন। যাহারা পুত্র, বিত্ত বা স্বর্গাদি লাভের প্রত্যাশী, কর্ম্মপথ তাহাদের জন্যই বিহিত, মুমুক্ষুর জন্য নহে; একথা বহু শ্রুতিবাক্য ও সুধীগণের দ্বারাই অনুমোদিত ও সমর্থিত হইয়াছে (১)।

যাহারা বলেন, মুক্তি-অবস্থায়ও পূর্ব্বাভ্যাসবশে যখন কর্ম্ম-প্রবৃত্তির অনুবৃত্তি ও ক্লেশানুভব অবশ্যম্ভাবী, তখন আর আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির সম্ভাবনা কোথায়? সে কথাও সঙ্গত হয় না।

(১) বাৎস্যায়ন ভাষ্যে মুক্তির অনুকূলে উদ্ধৃত শ্রুতিসমূহ এই—
"কর্ম্মভির্মৃত্যুমৃষয়ো নিষেদুঃ প্রজাবন্তো দ্রবিণমীহমানাঃ।
অথাপরে ঋষয়ো মনীষিণঃ পরং কর্ম্মভ্যোঽমৃতত্বমানশুঃ॥"
"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুঃ॥" ইত্যাদি
অর্থাৎ 'পুত্রবান্ ও ধনাভিলাষী ঋষিগণ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু মনস্বী অপর ঋষিগণ কর্ম্মের অলভ্য অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করিয়াছিলেন।' 'কোন ঋষিই কর্ম্ম, সন্তান বা ধনদ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন নাই; একমাত্র ত্যাগ বা সন্ন্যাসদ্বারাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।'

কারণ, স্বপ্নদর্শী লোক স্বপ্নে যে সমুদয় বিচিত্র ভোগ্য বস্তু দ্বারা পরমানন্দ উপভোগ করে; এবং স্বপ্নভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমুদয় ভোগ্য বস্তুর অভাবেও সে যেমন দুঃখ বোধ করে না; কারণ, তখন তুচ্ছত্ববোধে সে সমুদয় বস্তুতে তাহার অনুরাগ থাকে না; তেমনি মুক্ত পুরুষেরও রাগাদি দোষ বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় পূর্ব্ব-ভুক্ত বিষয়ের অভাবেও তখন কোন প্রকার দুঃখানুভূতি হয় না।

বিশেষতঃ—

"সংকল্পনিমিত্তত্বাচ্চ রাগাদীনাম্॥" ৪।১।৬৮॥

সংকল্প অর্থ—মিথ্যাজ্ঞান; মিথ্যাজ্ঞানই লোকের বিষয়-বিশেষে অনুরাগ, বিদ্বেষ বা মোহ সমুৎপাদন করিয়া থাকে। যাঁহার মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রম আদৌ নাই; রাগ, দ্বেষ বা মোহ কখনও তাহার নিকটে আসিতে পারে না; এইজন্য মহর্ষি পতঞ্জলিও অবিদ্যাকেই (মিথ্যাজ্ঞানকেই) রাগ-দ্বেষাদির উৎপত্তি-ক্ষেত্র বলিয়া বর্ণনা

এখানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস দ্বারাই প্রাচীন ঋষিগণ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর, ছান্দোগ্যোপনিষদেও কথিত আছে—

"ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ—যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমঃ, তপ এব দ্বিতীয়ঃ, ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যকুলবাসীতি তৃতীয়ঃ—অত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্; সর্ব্ব এবৈতে পুণ্যলোকা ভবন্তি, ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি" (২।২৩।১)।

ধর্ম্মময় বৃক্ষের তিনটী কাণ্ড—প্রথম কাণ্ড—যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান। দ্বিতীয় স্কন্ধ—তপস্যা। তৃতীয় স্কন্ধ—ব্রহ্মচর্য্য। এই ত্রিবিধ ধর্ম্মযাজী সকলেই পুণ্যলোকে যান, কেবল ব্রহ্মসংস্থ পুরুষ মুক্তিলাভ করেন। এখানেও শুদ্ধ কর্ম্মদ্বারা মুক্তি হয় না বলা হইয়াছে।

করিয়াছেন (১)। যোগশাস্ত্রে মিথ্যাজ্ঞান ও রাগাদি দোষগুলি 'ক্লেশ' নামে অভিহিত হইয়াছে। এইজন্য মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন,—

"ন প্রবৃত্তিঃ প্রতিসন্ধানায় হীনক্লেশস্য ॥" ৪।১।৬৪ ॥

মিথ্যাজ্ঞানের অভাবে যাহার রাগ, দ্বেষ ও মোহনামক দোষ-রাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কোন প্রকার প্রবৃত্তি বা কার্য্যারম্ভই তাহার জন্মান্তর-প্রাপ্তির কারণ হয় না। কেন না, তাহার তাৎকালিক কর্ম্মানুষ্ঠানে পুণ্য বা পাপ কিছুই হয় না; পুণ্য-পাপের অভাবে ফলভোগের জন্য শরীরধারণরূপ জন্মেরও আবশ্যক হয় না; কাজেই, তাঁহার প্রবৃত্তি বা কর্ম্ম অপবর্গ-লাভের প্রতিবন্ধক হয় না (২)। অতএব "দুঃখ-জন্মপ্রবৃত্তি-দোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরা-পায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।"

---

(১) "অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ ॥" (২।২)
"অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাম্—॥" (পাতঞ্জল দর্শন—২।৪ সূত্র)।

অবিদ্যা (মিথ্যাজ্ঞান), অস্মিতা (অহংভাব), রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (মরণত্রাস) এই পাঁচটীর নাম 'ক্লেশ'। 'তন্মধ্যে অবিদ্যা হইতেছে পরবর্ত্তী অস্মিতাদি ক্লেশের ক্ষেত্র—উৎপত্তিস্থান, অর্থাৎ অবিদ্যার অভাবে কোন ক্লেশই থাকে না বা থাকিতে পারে না। অতএব তত্ত্বজ্ঞানে মিথ্যাজ্ঞান বিদূরিত হইলে রাগ, দ্বেষ বা মোহ থাকে না বলিয়াই গোতম ঋষি পরসূত্রে ক্লেশহীন লোকের প্রবৃত্তিকে জন্মলাভের অ-কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(২) মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ঃ—।" (২।১২)
"সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥" পাতঞ্জল দর্শন (২।১৩)
'কর্ম্ম হইতে যে, পাপ-পুণ্যের সংস্কার জন্মে, ক্লেশই তাহার মূল, অর্থাৎ

এই দ্বিতীয় সূত্রে যে, তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে মিথ্যাজ্ঞানের নাশ, তন্নাশে দোষধ্বংস, দোষের অভাবে, প্রবৃত্তির অভাব, তদভাবে জন্মের অভাব, জন্মের অভাবে দুঃখের অভাব, এবং তখনই জীবের প্রকৃত অপবর্গলাভ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছিল, এখন তাহাই শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত ও সমর্থিত হইল।

এ পর্য্যন্ত কথিত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে, চতুর্ব্বিধ প্রমাণ ও দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় পদার্থের লক্ষণ ও তদানুষঙ্গিক প্রায় সকল কথাই বিবৃত করা হইল; অতঃপর অবশিষ্ট পদার্থগুলির লক্ষণাদি নিরূপণ করা আবশ্যক হইতেছে। তন্মধ্যে সংশয়ই প্রথম; এই জন্য অগ্রে সংশয়ের লক্ষণ প্রদর্শিত হইতেছে।—

"সমানানেকধর্ম্মোপপত্তের্বিপ্রতিপত্তেরুপলব্ধ্য-
নুপলব্ধ্যব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ।" ১।১।২৩॥

সূত্রের অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের নাম সংশয়। সংশয়ের কারণ প্রধানতঃ পাঁচটী—১। সাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞান, ২। অসাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞান, ৩। বিপ্রতিপত্তি, ৪। উপলব্ধি, ও ৫। অনুপলব্ধি। উক্ত পাঁচপ্রকার কারণে সংশয়

রাগদ্বেষাদি ক্লেশের অভাবে, কর্ম্ম হইতে পাপ-পুণ্য জন্মে না।' আবার 'সেই মূলীভূত ক্লেশ বিদ্যমান থাকিলেই, কর্ম্মের বিপাক বা পরিণাম-ফল—জন্ম, আয়ু ও ভোগ নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু রাগাদি ক্লেশের অভাবে হয় না।'

এখানে দেখা যায়, রাগাভাবে যে, পাপপুণ্যের অভাব এবং তন্মূলক জন্মেরও অভাব হয়, তদ্বিষয়ে পতঞ্জলির সহিত মহর্ষি গোতম একমত হইয়াছেন।

সমুৎপন্ন হয় বলিয়া সংশয়জ্ঞানও পাঁচপ্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে সাধারণ ধর্ম্ম-জ্ঞানমূলক সংশয় যথা—'ইহা কি স্থাণু (গাছের গুড়ি) অথবা মনুষ্য?' ইত্যাদি। অসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞানে সংশয়—'প্রসিদ্ধ শব্দ নিত্য কি অনিত্য?' বিপ্রতিপত্তিমূলক সংশয়ের উদাহরণ যথা,—'কেহ বলেন, এই স্থূল দেহই আত্মা; দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, না, স্থূল দেহের অতিরিক্ত নিত্য নিরবয়ব স্বতন্ত্র আত্মা আছে।' এইরূপ বিরুদ্ধ মতভেদ দর্শনে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকের সংশয় হইয়া থাকে যে, দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে কি না? উপলব্ধি বা জ্ঞান-বিশেষ হইতেও সংশয়ের উৎপত্তি হয়। যেমন—জলাশয়ে সত্য জলের উপলব্ধি হয়, আবার মরুভূমিতে অসত্য জলেরও উপলব্ধি হয়; সুতরাং উপলব্ধিকে কেবলই সত্য বস্তুর প্রকাশক বলা যাইতে পারে না; অতএব উপলব্ধির বিষয়ীভূত কোন বস্তুতে যে, সত্তা ও অসত্তাদি সম্বন্ধে সংশয়, তাহাই উপলব্ধিমূলক সংশয়। উপলব্ধির ন্যায় অনুপলব্ধিও সংশয়ের কারণ। যেমন—মন্দান্ধকারমধ্যে পতিত কোন বস্তু উপলব্ধি-গোচর না হইলেও, তাহার সত্তা-অসত্তা, বা আদৌ থাকা-না-থাকা বিষয়ে, যে সংশয়, তাহাই অনুপলব্ধিমূলক সংশয় (১)।

---

(১) কোন বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে, সেই বিজ্ঞেয় বস্তুর ধর্ম্মবিষয়েও জ্ঞান হইয়া থাকে। সেই ধর্ম্মকেই বিশেষণ ও 'প্রকার' বলে। জ্ঞানের উক্ত 'প্রকারকে' 'কোটি' ও বলে। সাধারণতঃ সত্য বস্তু-বিষয়ক জ্ঞানের স্থলে একটী মাত্র 'প্রকার' (কোটি) থাকে; কিন্তু সংশয়স্থলে জ্ঞানের একাধিক 'প্রকার' বা 'কোটি' থাকা আবশ্যক হয়।

উপরিউক্ত পাঁচটী উদাহরণের মধ্যেই একাধিক প্রকার বিদ্যমান থাকিয়া সংশয় উৎপাদন করে, তন্মধ্যে প্রথম উদাহরণের বিবৃতি এইরূপ—উচ্চতা ধর্ম্মটী স্থাণুতেও আছে, মনুষ্যেতেও আছে; সুতরাং উহা স্থাণু ও মনুষ্য উভয়ের সাধারণ ধর্ম্ম। দর্শক যখন দূরত্বাদি কারণে স্থাণু ও মনুষ্যগত বিশেষ ধর্ম্মগুলি না দেখিয়া কেবল উচ্চতারূপ সাধারণ ধর্ম্মমাত্র দর্শন করে, তখনই তাহার 'ইহা স্থাণু কি মনুষ্য ?' বলিয়া সংশয় উপস্থিত হয়। স্থাণু ও মনুষ্যের মধ্যে যে বিশেষ ধর্ম্ম আছে, তদ্দর্শনেই ঐ সংশয় নিবারিত হয়। শুক্তি-রজত প্রভৃতিবিষয়ক সংশয়স্থলেও এই নিয়ম জানিতে হইবে।

দ্বিতীয় উদাহারণে—শব্দত্ব ধর্ম্মটী শব্দেরই অসাধারণ ধর্ম্ম; উহা শব্দ ভিন্ন নিত্য বা অনিত্য অন্য কোন পদার্থেই থাকে না; সুতরাং শব্দত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম্মদ্বারা শব্দের নিত্যত্ব বা অনিত্যত্ব কিছুই নির্দ্ধারণ করা যায় না। অথচ জাগতিক পদার্থমাত্রই যখন, হয় নিত্য, না হয় অনিত্য হইয়া থাকে, তখন শব্দ সম্বন্ধেও নিত্যত্ব-অনিত্যত্ব চিন্তা অবশ্যই আসিতে পারে; কাজেই লোকের মনে সংশয় হইয়া থাকে যে, শব্দ নিত্য কি অনিত্য ? এস্থলে প্রথমে নিত্য ও অনিত্য এই দুই প্রকার চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হয়, পশ্চাৎ প্রসিদ্ধ নিত্য ও অনিত্য পদার্থে অবিদ্যমান শব্দত্বরূপ একটী অসাধারণ ধর্ম্মদৃষ্টে ঐরূপ সংশয়ের উদয় হয়।

তৃতীয় উদাহরণ বিপ্রতিপত্তিমূলক সংশয়—বি অর্থ বিরুদ্ধ, প্রতিপত্তি অর্থ জ্ঞান; সুতরাং উহার অর্থ হইতেছে বিরুদ্ধ জ্ঞান। সেই জ্ঞান হইতে যে সংশয়, তাহাই বিপ্রতিপত্তিমূলক সংশয়। যেমন কেহ বলেন, দৃশ্যমান স্থূল দেহই আত্মা; দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, না, দেহ আত্মা নহে—আত্মার অধিষ্ঠান মাত্র; আত্মা বস্তুতঃ দেহ হইতে স্বতন্ত্র নিত্যবস্তু। এইপ্রকার বিরুদ্ধ মতদর্শনে সাধারণ লোকের মনে সহজেই সংশয় উপস্থিত হয় যে, 'দেহের অতিরিক্ত আত্মা আছে কিনা ?'

[প্রয়োজন।]

অতঃপর প্রয়োজন কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত সূত্রকার বলিতেছেন—

"যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে, তৎ প্রয়োজনম্।" ১।১।২৪ ॥

অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রই উদ্দেশ্যবিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া বিভিন্ন-প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যে বিষয়টী উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য

চতুর্থ উপলব্ধিমূলক সংশয়ের উদাহরণে বক্তব্য এই যে, আমরা জগতে সচরাচর যে সকল পদার্থ উপলব্ধি করিয়া থাকি, উপলব্ধিগোচর সেই সমুদয় পদার্থই সৎ বা অসৎ শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া থাকে। অতএব যখন আমরা মরীচিকা উপলব্ধি করিয়া থাকি, তখন উপলব্ধিগোচর সেই মরীচিকা—মরুভূমিতে দৃষ্ট জলও 'সত্য কি অসত্য' এইরূপ সংশয় আমাদের অনিবার্য্য হইয়া থাকে। অতএব ঐ জাতীয় সংশয়কে উপলব্ধি-মূলক সংশয় বলা হইয়া থাকে।

পঞ্চম অনুপলব্ধিমূলক সংশয়—যে পদার্থ জগতে সম্পূর্ণ অসত্য বা অলীক, সেরূপ পদার্থও আমরা দেখিতে পাই না; আবার প্রকৃত সত্য বস্তুও সময় বিশেষে কোন কারণে দেখিতে পাই না। অতএব ঈষৎ অন্ধকার মধ্যে যখন কোন একটী বস্তু অনুসন্ধান করিয়াও আমরা দেখিতে না পাই, তখন সে বস্তুর অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব সম্বন্ধে অর্থাৎ সেই বস্তুটী এখানে নাই বলিয়াই কি দেখিতে পাইতেছি না, অথবা থাকা সত্ত্বেও কেবল অন্ধকারের দোষে দেখিতেছি না, এই প্রকার সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাই অনুপলব্ধিমূলক সংশয়। এই জাতীয় আরও বহু উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে, অনাবশ্যক বোধে এই কয়েকটীমাত্র উদাহরণ লইয়াই বিষয়টী বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম।

করিয়া লোক প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম প্রয়োজন। জগতে আনন্দ ও দুঃখনিবৃত্তি, এই দুইটী বিষয়ই জীবগণের প্রধান উদ্দেশ্য বা চরম লক্ষ্য ; অতএব ঐ দুইটীই জীবগণের প্রধান প্রয়োজন ; তদ্ভিন্ন অপর যাহা কিছু প্রয়োজন বলিয়া উল্লেখ করা হয়, প্রকৃত পক্ষে, সে সমস্তই গৌণ প্রয়োজন, মুখ্য নহে। উন্মত্ত ব্যতীত অতি বড় মূর্খেরিও বিনা প্রয়োজনে কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না, বা হইতে পারে না ; এইজন্য আচার্য্যগণ বলেন—

"প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে।" ইতি।

[দৃষ্টান্ত।]

প্রয়োজনের পর দৃষ্টান্তের পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক। সূত্রকার বলিতেছেন—

"লৌকিক-পরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ॥" ১।১।২৫॥

জগতে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোক আছে ; এক লৌকিক, অপর পরীক্ষক। যাহারা কেবল ব্যবহারসিদ্ধ বিষয়সমূহ জানে, মানে ও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে; তন্নিমিত্ত কোনরূপ তর্ক বা প্রমাণাদি-প্রয়োগের অপেক্ষা রাখে না, তাহারা লৌকিক ; আর যাহারা কেবল লোকব্যবহারের উপর নির্ভর না করিয়া তর্কসহকৃত প্রমাণদ্বারা বস্তুর তত্ত্বনির্ণয় করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরীক্ষক। এই উভয়বিধ লোকই যে বিষয়ে সমবুদ্ধি-সম্পন্ন, অর্থাৎ যে বস্তুর অস্তিত্ব ও স্বভাবাদি সম্বন্ধে লৌকিক ও পরীক্ষক উভয়বিধ লোকই একমত, সেরূপ বিষয়ই যথার্থ দৃষ্টান্ত। দৃষ্টান্ত দুই প্রকার—(১) সাধর্ম্ম্যমূলক ও (২) বৈধর্ম্ম্যমূলক। সাধর্ম্ম্যমূলক দৃষ্টান্ত যেমন

—মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত রামচন্দ্রের ন্যায় ধার্ম্মিক ছিলেন। বৈধর্ম্ম্য-মূলক দৃষ্টান্ত যথা—তিনি রামচন্দ্রের ন্যায় কার্য্য করেন না, রাবণের ন্যায় করেন, ইত্যাদি।

[সিদ্ধান্ত]

দৃষ্টান্তের উপযোগিতা সিদ্ধান্তে। কোন বিষয়ে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিতে হইলেই বিশুদ্ধ দৃষ্টান্তের সাহায্য লইতে হয়। বিশেষতঃ দৃষ্টান্ত ব্যতীত অলৌকিক কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তই হইতে পারে না। এই জন্য দৃষ্টান্তনিরূপণের পর সূত্রকার সিদ্ধান্ত ও তাহার প্রকারভেদ নিরূপণার্থ বলিতেছেন—

"তন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগম-সংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ।" ১।১।২৬॥

তন্ত্র অর্থ—শাস্ত্র। অধিকরণ অর্থ আশ্রয় (জ্ঞাপক)। অভ্যুপগম অর্থ—অঙ্গীকার। সংস্থিতি অর্থ—ভ্রম ও সংশয়শূন্যরূপে নিশ্চয়। ইহার সম্মিলিত অর্থ এই যে, শাস্ত্রেতে ভ্রম ও সংশয়-শূন্যরূপে যে, কোন বিষয়ের অভ্যুপগম বা নির্ণয়, তাহার নাম সিদ্ধান্ত। ভ্রম বা সংশয় না থাকিলে সিদ্ধান্তেরই আবশ্যক হয় না; পক্ষান্তরে, যে বিষয়ে লোকের ভ্রম বা সংশয় থাকে, শাস্ত্র কেবল সেই বিষয়েই ভ্রম ও সংশয় বিদূরিত করিয়া 'ইহা এই প্রকারই বটে, অন্যপ্রকার নহে' এইভাবে যে, একটা নিশ্চয়বুদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া দেয়, তাহাই সিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। এই সিদ্ধান্ত সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত—

"সর্ব্বতন্ত্র-প্রতিতন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগম-সংস্থিত্যর্থান্তর-ভাবাৎ।" ১।১।২৭॥

১। সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত, ২। প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত, ৩। অধিকরণ-সিদ্ধান্ত, ও ৪। অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত। তন্মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রের অবিরুদ্ধ যে সিদ্ধান্ত শাস্ত্রমধ্যে সংস্থাপিত হয়, তাহা সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও তদ্বিষয় রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থ, এবং পদার্থ-নিরূপণের জন্য প্রমাণভেদস্বীকার, এ সমস্তই 'সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত' মধ্যে পরিগণিত।

যে সিদ্ধান্ত সমান তন্ত্রে প্রসিদ্ধ, কিংবা কেবল স্বশাস্ত্রমাত্রসিদ্ধ এবং পরতন্ত্র-বিরুদ্ধ, সেই সিদ্ধান্তের নাম প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত। ফল কথা, বাদী প্রতিবাদী, উভয়ের মধ্যে কেবল একজনের মাত্র (হয় বাদীর, না হয় প্রতিবাদীর) অভিমত সিদ্ধান্তই প্রতিতন্ত্র-সিদ্ধান্ত। যেমন জৈমিনির মতে শব্দের নিত্যত্ব-সিদ্ধান্ত। শব্দ যে নিত্য, তাহা জৈমিনিকৃত মীমাংসায় স্বীকৃত হইলেও, অন্য কোনও দর্শন শাস্ত্রে স্বীকৃত হয় নাই। অথবা, যেমন সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষগত বৈশিষ্ট্য-সিদ্ধান্ত। উহা সাংখ্যের সমানতন্ত্র পাতঞ্জলের অভিমত হইলেও, অপরাপর শাস্ত্রের অভিমত নহে ; অতএব উহা 'প্রতিতন্ত্র' সিদ্ধান্ত মধ্যে পরিগণিত।

যে সিদ্ধান্ত-সংস্থাপনের ফলে প্রসঙ্গতঃ অপর বিষয়েরও (যাহা প্রমাণ করা আবশ্যক, তাহারও) সিদ্ধি হইয়া যায়, তাহার নাম অধিকরণ-সিদ্ধান্ত। যেমন ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব সংস্থাপন। কেন না, ঈশ্বরকে জগৎ-সৃষ্টির কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলেই, সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মও সিদ্ধ হইয়া পড়ে। অতএব উহা অধিকরণ-সিদ্ধান্ত (১)।

---

(১) যিনি যে বস্তু রচনা করেন, তাহার তদুপাদান বিষয়ে জ্ঞান থাকা

বাদী ও প্রতিবাদী এতদুভয়ের মধ্যে, একের উদ্ভাবিত কোন সিদ্ধান্ত অপরকর্ত্তৃক বিনা পরীক্ষায় (উহা সঙ্গত, কি অসঙ্গত, ইহা বিচার না করিয়া) স্বীকার করিয়া লইয়া যে, তৎ-সম্পাদিত অন্য বিষয়ের বিচার, তাহার নাম অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত।

অভিপ্রায় এই যে, কোন একটী তত্ত্বনিরূপণের জন্য বাদী-প্রতিবাদীরূপে দুইজনে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে একজন একটী নূতন কথার বা সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়া স্বপক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। এমত অবস্থায় অপর ব্যক্তি যদি উক্ত সিদ্ধান্ত ভুল, কি সত্য, 'ইহা পরীক্ষা না করিয়াই তদনু-সারে বিচার্য্য বিষয়ের তত্ত্ব-নির্দ্ধারণার্থ বিচার করিতে থাকেন, তাহা হইলেই, বুঝিতে হইবে যে, উক্ত সিদ্ধান্ত তাহার অভিমত হউক বা নাই হউক, সে সময়ের জন্য তিনি উহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; নচেৎ তাহার পরীক্ষা করা উচিত ছিল। ইহার উদাহরণ—মীমাংসকগণ বলেন—শব্দ একটী

আবশ্যক। যে কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করে, সে নিশ্চয়ই ঘটের উপাদান (মৃত্তিকা) বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন থাকে। কিসের দ্বারা ঘট বানাইতে হয়, ইহা যে লোক জানে না, সে কখনই ঘট বানাইতে পারে না। ঈশ্বর যে, এই বিশাল জগৎ রচনা করিয়াছেন, ইহার উপাদান হইতেছে পরমাণু বা দ্ব্যণুক। পরমাণু অসংখ্য; এই অসংখ্য পরমাণু বিষয়ে ঈশ্বরের নিশ্চয়ই জ্ঞান থাকা আবশ্যক; নচেৎ তিনি রচনা করিতে পারিতেন না। তিনি এই অসংখ্য জগদুপাদন-বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন, এই সিদ্ধান্ত দ্বারাই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তাও প্রমাণিত হয়।

দ্রব্যপদার্থ ও নিত্য। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ বলেন—শব্দ, গুণপদার্থ ও অনিত্য। এখন ইঁহারা উভয়ে যদি কখনও কোন বিশেষ বিষয় লইয়া তর্কে প্রবৃত্ত হন, এবং সে সময়ে যদি মীমাংসক স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য শব্দের নিত্যত্ব ও দ্রব্যত্বের কথা বলেন, আর নৈয়ায়িক যদি তাহার প্রতিবাদ না করিয়াই বিচারে অগ্রসর হন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, মীমাংসকের উপস্থাপিত শব্দের নিত্যদ্রব্যত্ববাদটী তাহার পক্ষে 'অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত'। অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত সাধারণতঃ প্রতিপক্ষের প্রতি অনাদরপ্রকাশনার্থ এবং নিজের তর্কনৈপুণ্য প্রদর্শনার্থই অবলম্বিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ উহা স্বীকারকারীর অভিমত সিদ্ধান্ত বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে।

সূত্রোক্ত নির্দ্দেশের ক্রমানুসারে এখন 'অবয়বের' লক্ষণ বলিতে হইবে। 'অবয়ব' অর্থ অংশ। কিসের অংশ? না, ন্যায়ের অংশ। 'ন্যায়' কি? না, যে বাক্য বা শব্দসমূহের সাহায্যে সন্দিগ্ধ বিষয়ের সাধন করা হয়, অর্থাৎ সন্দিগ্ধ বিষয়ের অনুমিতি সিদ্ধ হয়, তাহার নাম ন্যায়। ন্যায়ের অবয়ব পাঁচ প্রকার—

"প্রতিজ্ঞা-হেতূদাহরণোপনয়-নিগমনান্যবয়বাঃ ॥" ১।১।৩২ ॥

প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, এই পাঁচটী ন্যায়ের অবয়ব। এই পাঁচটী অবয়ব লইয়াই ন্যায়ের সৃষ্টি হইয়াছে (১)।

---

(১) এই প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি ন্যায়াবয়বের পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে; সুতরাং এখানে তাহার পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

মীমাংসকমতে উক্ত অবয়বের সংখ্যা পাঁচ নহে, তিন—১। প্রতিজ্ঞা, ২। হেতু ও ৩। উদাহরণ। অথবা, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। তাঁহারা বলেন, তিনটীমাত্র অবয়ব দ্বারাই যখন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তখন অতিরিক্ত (পঞ্চ প্রকার) অবয়ব স্বীকার করা অনাবশ্যক।

অতঃপর লক্ষণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক তর্কের পরিচয়-প্রদানপ্রসঙ্গে সূত্রকার বলিতেছেন—

"অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ ॥" ১।১।৪০॥

'তর্ক' কাহাকে বলে? না, যে বিষয়ের তত্ত্ব অর্থাৎ যথার্থ স্বরূপ নির্ণীত হয় নাই, অথচ নির্ণয় করা আবশ্যক, সেই বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ যে, উপযুক্ত কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক একতর পক্ষের সম্ভাবিতত্বস্থাপন, তাহার নাম তর্ক।

অভিপ্রায় এই যে, যে বিষয়ের তত্ত্ব জানা নাই, তাহার তত্ত্ব জানিবার জন্য লোকের স্বতই আগ্রহ হইয়া থাকে। তদনুসারে জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে প্রবৃত্ত জিজ্ঞাসু ব্যক্তির হৃদয়ে, স্বতই পরস্পর বিরুদ্ধ একাধিক ধর্ম্মের (ভাবের) আলোচনা হইতে থাকে,—ইহা এই প্রকারই বটে? না, অন্য প্রকার? ইহা শ্বেত? কি পীত? ইত্যাদি। তখন তাহার একতর পক্ষ নির্ণয়ার্থ কারণানুসন্ধান করা আবশ্যক হয়। সেই অনুসন্ধানের ফলে সন্দিগ্ধ পক্ষদ্বয়ের মধ্যে, যে পক্ষের অনুকূলে সমর্থনক্ষম কারণ দৃষ্ট হয়, সেই পক্ষেরই সত্যতা সম্ভাবিত হয়। এই যে,

সম্ভাবনা, ইহারই নাম—তর্ক। ইহার উদাহরণ এইরূপ—কোন লোক আত্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইলে, প্রথমেই তাহার একটী সংশয় উপস্থিত হয় যে, আমার জিজ্ঞাস্য আত্মা উৎপত্তিশীল (অনিত্য)? না, অনুৎপত্তিশীল (নিত্য)? উক্ত উভয় পক্ষের কারণানুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, আত্মা যদি দেহের ন্যায় উৎপত্তিশীল হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান দেহের সঙ্গেই তাহার উৎপত্তি-বিনাশ সংঘটিত হইত; কেন না, উৎপন্ন পদার্থমাত্রেই ধ্বংসশীল; সুতরাং বর্ত্তমান জন্মই তাহার প্রথম ও শেষ; পূর্ব্ব-জন্ম বা পরজন্ম তাহার নাই, বা থাকাও সম্ভব হইত না। কাজেই সুখ-দুঃখময় সংসার-ভোগও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইত; কারণ, বর্ত্তমান জন্মে যে সুখ-দুঃখভোগ, তাহা প্রাক্তন কর্ম্মেরই ফল বলিতে হইবে; নচেৎ সদ্যোজাত শিশুর সুখ-দুঃখভোগ কিছুতেই উপপন্ন হইতে পারে না। কেন না, সে ত ইহ জন্মে ভাল মন্দ কোন কর্ম্মই করে নাই, যাহার ফলে তাহাকে ঐরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। অতএব আত্মাকে উৎপত্তিশীল বলা যাইতে পারে না।

পক্ষান্তরে, আত্মা যদি অনুৎপত্তিশীল 'নিত্য' হয়, তাহা হইলেই তাহার পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম সিদ্ধ হয়, এবং পূর্ব্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলে পরজন্মে সুখ-দুঃখ ভোগ ও ভোগের তারতম্য উপপন্ন হয়। অধিকন্তু, তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞান-বন্ধনের নিবৃত্তি ও তদনুগত শরীর-নিবৃত্তিতে অপবর্গও সম্ভবপর হইতে পারে। অতএব আত্মা যে, উৎপত্তিরহিত ও নিত্য, ইহাই সম্ভবপর ও যুক্তিসহ।

ন্যায় সূত্রের বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—তর্ক অর্থ একপ্রকার আপত্তি। এ কথার অভিপ্রায় এই যে, যে স্থানে ব্যাপ্য ও ব্যাপকের অভাব নিশ্চিতরূপে জানা আছে; সেই স্থানে ব্যাপ্য-ধর্ম্মের অভাবও নিশ্চয়ই জানা আছে; কিন্তু এইরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান সত্ত্বেও তথায় যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যাপ্য-ধর্ম্মের আরোপ দ্বারা, তদ্ব্যাপক পদার্থের আহার্য্য আরোপ অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বক আরোপ, তাহার নাম তর্ক; ইহার উদাহরণ—"হ্রদো যদি ধূমবান্ স্যাৎ, তদা বহ্নিমান্ স্যাৎ" অর্থাৎ জলহ্রদ যদি ধূমবান্ হইত, তবে বহ্নিমান্ও হইত। এস্থানে বহ্নি হইতেছে ব্যাপক, আর ধূম হইতেছে তাহার ব্যাপ্য। যেখানে ব্যাপ্য পদার্থ থাকে, সেখানে তদ্ব্যাপক পদার্থও অবশ্যই থাকে। জলহ্রদে ব্যাপ্য ধূম ও তদ্ব্যাপক বহ্নি, এই উভয়েরই অভাব পূর্ব্বে নিশ্চিতরূপে জানা আছে; কিন্তু সেরূপ জানা সত্ত্বেও ইচ্ছাপূর্ব্বক জলহ্রদে ধূমের আরোপ করিয়া তদ্ব্যাপক বহ্নির আরোপ করা হইতেছে। এই প্রকার আরোপই যথার্থ তর্ক (১)। তর্ক নিজে প্রমাণ না হইলেও, প্রমাণের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

উল্লিখিত 'তর্ক' পাঁচ প্রকারে বিভক্ত—১। আত্মাশ্রয়, ২। অন্যোন্যাশ্রয়, ৩। চক্রক, ৪। অনবস্থা ও ৫। তদন্যবাধি-

---

(১) কেহ কেহ বলেন, ইহাই তর্কের যথার্থ লক্ষণ, অন্যান্য অংশ কেবল তাহার পরিচায়ক মাত্র। ব্যভিচারাশঙ্কা দূর করিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতির নির্দ্দোষতা বা সত্যতা সংস্থাপন করাই তর্কের প্রধান কার্য্য, তাহাদ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় করাই উহার চরম লক্ষ্য।

ত্যার্থপ্রসঙ্গ। তন্মধ্যে, নিজের দ্বারা নিজের পরিচয় দেওয়ার নাম আত্মাশ্রয়। যথা—'অভাব' কি? না ভাবভিন্ন। ভিন্ন অর্থ—ভেদযুক্ত; ভেদ একপ্রকার অভাব। অতএব এখানে অভাবের দ্বারা অভাবের পরিচয় দেওয়ায় আত্মাশ্রয় দোষ ঘটিল। যাহা দ্বারা যাহার পরিচয় দিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে যদি পরস্পর অপেক্ষাপেক্ষিভাব থাকে, তবে তাহাকে 'অন্যোন্যাশ্রয়' বলে। যেমন—(কাহারও মতে) সুখের অভাব দুঃখ, আবার দুঃখের অভাব সুখ। এখানে অগ্রে সুখ না জানিলে দুঃখ জানিতে পারা যায় না, আবার দুঃখ না জানিলেও সুখ চেনা যায় না; সুতরাং উভয়ের জ্ঞানই পরস্পরাপেক্ষিত হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইল। কোন একটী বস্তুর পরিচয় দিতে হইলে অপর যে বস্তুর পরিচয় বা জ্ঞানের অপেক্ষা করে, এবং তাহার পরিচয়ের জন্যও আবার তৃতীয় একটী বস্তু জানা আবশ্যক হয়, এবং তাহা জানিতে হইলেও যদি সেই প্রথমোক্ত বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে 'চক্রক' নামক দোষ হয়। জানিতে হইবে যে, আরো অধিক দূর অগ্রসর হইয়াও যদি সেই প্রথমোক্ত বস্তুর জ্ঞান ব্যতীত পরিচয় প্রদান করা অসম্ভব হয়, তাহা হইলেও 'চক্রক' দোষ ঘটিবে। যেখানে উত্তরোত্তর যতই কল্পনা করা যাউক, কিছুতেই তাহার শেষ হয় না, তাহাকে অনবস্থা বলে। যেমন, সাংখ্যমতে জগতের মূলকারণ হইতেছে নিত্য প্রকৃতি। প্রকৃতিরও কারণান্তর কল্পনা করিলে, সেই কারণেরও আবার অপর কারণ কল্পনা করিতে হইবে এবং তাহার পরও পরম্পর

কারণ-কল্পনার প্রবাহ বহিতে থাকিবে; কোথাও এইরূপ তর্কের বিশ্রাম না হওয়ায় 'অনবস্থা' দোষ ঘটে; এই ভয়ে প্রকৃতিকে নিত্য ও মূলকারণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। আর যেরূপ কল্পনা করিলে উদ্দেশ্য ত সিদ্ধ হয়ই না, পরন্তু বিষয়টীই প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে; তাহাকে 'তদন্যবাধিতার্থ প্রসঙ্গ' বলে। কেহ যদি মনে করেন, বহ্নি না থাকিলেও ধূম থাকে; সুতরাং ধূম বহ্নির ব্যভিচারী; কাজেই ধূমদর্শনে সর্ব্বত্র বহ্নির অনুমান হইতে পারে না; তন্নিবারণার্থ এইরূপ তর্কের অবতারণা করিতে হয় যে, 'ধূমো যদি বহ্নিব্যভিচারী স্যাৎ, তদা বহ্নিজন্যোঽপি ন স্যাৎ' অর্থাৎ ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হইত, বহ্নির অন্যত্রও থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ধূম বহ্নি-জন্য হইত না, ইত্যাদি (১)। তর্কের উদ্দেশ্য তত্ত্বনির্ণয়। এইজন্য তর্কের পর নির্ণয়ের লক্ষণ প্রদর্শিত হইতেছে।—

"বিমৃশ্য পক্ষ-প্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ॥" ১।১।৪১॥

বিচারপূর্ব্বক পরপক্ষখণ্ডন ও স্বপক্ষ সংস্থাপনদ্বারা যে, অভিমত অর্থের (বিষয়ের) নির্দ্ধারণ, তাহার নাম নির্ণয়। সাধারণতঃ সংশয়-নিরসনের নিমিত্তই নির্ণয়ের আবশ্যক হয়, স্থলবিশেষে আবার সংশয় না থাকিলেও নির্ণয়ের আবশ্যক হইয়া থাকে; উহার উদাহরণ প্রদর্শন অনাবশ্যক। নির্ণয়ই পূর্ব্বকথিত

(১) এই যে, আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয় ও চক্রক নামক দোষ, এ সকল সাধারণতঃ উৎপত্তি, স্থিতি ও জ্ঞান সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হইয়া থাকে।

তর্ক ও প্রমাণসমূহের চরম ফল। এবংবিধ তত্ত্বনির্ণয় বা পরপক্ষ-খণ্ডনের উদ্দেশ্যে যে, ন্যায়যুক্ত বচনপরম্পরা প্রযুক্ত হয়, তাহার নাম 'কথা'।

[কথা।]

কথা তিন প্রকার—বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। অতঃপর বাদ কথার স্বরূপ নিরূপণার্থ লক্ষণ প্রদর্শিত হইতেছে—

"প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষ-প্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ ॥" ১।২।১ ॥

ত্রিবিধ কথার মধ্যে 'বাদ' কথাই শ্রেষ্ঠ; কারণ. তত্ত্ব নির্ণয়ই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য, জয় পরাজয় নহে। সেইজন্য প্রথমতঃ পক্ষ ও প্রতিপক্ষ কল্পনা করিয়া বাদী প্রতিবাদীরূপে একজন পক্ষ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিবেন, এবং অপরে তাহা খণ্ডনের প্রয়াস পাইবেন। তদুদ্দেশ্যে উভয়েই যে সমুদয় তর্ক ও প্রমাণের উপন্যাস করিবেন, জ্ঞানতঃ সে সমুদয় ভ্রান্ত বা দোষদুষ্ট হইবে না; দোষদর্শন মাত্র পরিত্যক্ত হইবে। নিজের সুবিধার জন্য কেহই সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা কহিবেন না; পরন্তু পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাবয়ব ন্যায়যুক্ত বাক্যের অবতারণা করিবেন। ফল কথা, বাদী ও প্রতি-বাদী কেহই জয়-পরাজয়ের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া এবং কোন প্রকার অপসিদ্ধান্তের আশ্রয় না করিয়া, কেবল তত্ত্ব-নির্ণয়ের জন্য যথাশক্তি ন্যায়ানুমোদিত কথার অবতারণা করিবেন। এরূপ হইলেই সে কথা 'বাদ' নামে অভিহিত হয়, অন্যথা নহে। এই

জন্য আচার্য্যগণ মনে করেন যে, জয়-পরাজয়ে কামনাবিহীন বীতরাগ পুরুষগণই 'বাদ' কথার যথার্থ অধিকারী, অন্যে নহে। বাদ কথার পরই 'জল্প' কথার স্থান; এইজন্য বাদের পরই জল্পের লক্ষণ বলা হইতেছে—

"যথোক্তোপপন্নঃ ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভো জল্পঃ" ॥১।২।২॥

'জল্প' কথা ঠিক 'বাদ' কথার ন্যায় কেবল তত্ত্ব-নির্ণয়ার্থ প্রযুক্ত হয় না; পরন্তু বিজিগীষার উদ্দেশ্যেই প্রবর্ত্তিত হয়; সুতরাং ইহাতেও বাদী প্রতিবাদী উভয়েই যথাসম্ভব তর্ক ও প্রমাণের সাহায্যে স্ব স্ব-পক্ষ সংরক্ষণের চেষ্টা করেন; এবং নিজের উপস্থাপিত তর্ক বা প্রমাণে কোনপ্রকার দোষ-দর্শন সত্ত্বেও ইচ্ছা-পূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন না; এবং অপসিদ্ধান্ত প্রয়োগেও কুণ্ঠিত হন না; অধিকন্তু, পরপক্ষ খণ্ডনের জন্য বক্ষ্যমাণ ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানেরও যথাসাধ্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন; সুতরাং জল্প কথা যে, বাদ কথা অপেক্ষা হীন, তাহা আর বলিতে হয় না। কথার মধ্যে বিতণ্ডা কথা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট; এইজন্য সর্ব্বশেষে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে—

"স প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্ডা" ॥১।২।৩॥

জল্প কথায় বাদী প্রতিবাদী উভয়েই নিজ নিজ পক্ষ স্থাপনে সচেষ্ট থাকেন; কিন্তু বিতণ্ডায় সেরূপ থাকেন না। বাদীর নিজের কোনও পক্ষ বা লক্ষ্য নাই; কেবল প্রতিবাদীর সিদ্ধান্ত খণ্ডন করাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য; সুতরাং নিজের কোনও পক্ষ না

থাকায় পরপক্ষ-খণ্ডনের জন্য উদ্দামভাবে যথেচ্ছ প্রমাণাদি প্রয়োগ করিতে তাহার কোন দিকেই ব্যাঘাত ঘটে না; এইজন্য বিতণ্ডা-বাদীকে নিরস্ত করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। শাস্ত্রে বিতণ্ডাবাদীর যথেষ্ট নিন্দা দৃষ্ট হয় (১)।

জল্প ও বিতণ্ডাস্থলে তত্ত্বনির্ণয়ের দিকে আদৌ লক্ষ্য থাকে না; সুতরাং প্রতিপক্ষের পরাজয়ের জন্য যথেচ্ছভাবে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানগুলির আশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারে। ফল কথা, প্রতিপক্ষের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করাই প্রধান লক্ষ্য থাকে; কিন্তু বাদ কথায় সেরূপ করা সম্ভবপর হয় না; কারণ, সে স্থানে উভয়েরই লক্ষ্য তত্ত্ব-নির্ণয় করা; সুতরাং ছল, জাতি প্রভৃতি অসৎ তর্ক সে স্থানে মোটেই স্থান পাইতে পারে না।

এই জন্য যাঁহারা বস্তুতই তত্ত্বজিজ্ঞাসু প্রতিভাসম্পন্ন ও সদ্‌যুক্তির পক্ষপাতী, এবং পরাবজ্ঞাবিমুখ সত্যপ্রিয় ও সত্যবাদী, তাহারাই প্রকৃত 'বাদ' কথার অধিকারী; এই কারণেই স্বয়ং ভগবান্‌ও 'বাদঃ প্রবদতামহম্' বলিয়া বাদকথার গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। বাদ কথায় মধ্যস্থের আবশ্যক হয় না; কিন্তু জল্প ও বিতণ্ডা কথা মধ্যস্থ ব্যতীত হইতেই পারে না।

এই প্রসঙ্গে, পূর্ব্বকালে কথা বা শাস্ত্রার্থবিচারের প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহার একটুকু নমুনা প্রদর্শন করা যাইতেছে—

১। "বৈতণ্ডিকাঃ পানরতাঃ পাষণ্ডা ধর্ম্মকঞ্চুকাঃ।
নাস্তিকা বেদবাহ্যাশ্চ দৈবে পৈত্র্যেচ তাংস্ত্যজেৎ॥"

কোন একটী বিচার্য্য বিষয় স্থির করিয়া বাদী প্রথমতঃ উপযুক্ত প্রমাণপ্রদর্শনপূর্ব্বক স্বমত সংস্থাপনে যত্ন করিবেন; এবং স্বমতের উপর যে সকল দোষের আশঙ্কা হইতে পারে, সে সমস্ত দোষ খণ্ডন করিয়া নিজের বক্তব্য বিষয় জ্ঞাপন করিবেন। অনন্তর প্রতিবাদী বাদীর কথাগুলি ঠিকমত বুঝিয়াছেন কি না, ইহা জ্ঞাপনের জন্য বাদীর কথিত মতের অনুবাদ বা পুনরুল্লেখ করিবেন। পরে উপযুক্ত প্রমাণের সাহায্যে প্রদর্শিত দোষ-রাশির খণ্ডনপূর্ব্বক বাদিমতের অসারতা প্রমাণ করিবেন। অতঃপর বাদীও প্রতিবাদীর কথাগুলি উল্লেখ বা আবৃত্তি করিয়া তদুদ্ভাবিত দোষরাশি নিরসনপূর্ব্বক প্রতিবাদীর সিদ্ধান্তপক্ষ খণ্ডন করিবেন। এই প্রণালী অনুসারে বাদী ও প্রতিবাদী বিচার করিতে করিতে, যখন একজন অপরের উপস্থাপিত প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত খণ্ডনে অসমর্থ হইবেন, তখনই তিনি পরাজিত বলিয়া গণ্য হইবেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কেহ যদি উক্ত প্রকার বিচার-প্রণালী উল্লঙ্ঘন করেন, কিংবা অযথাকালে পর-পক্ষে দোষ উত্থাপন করেন, তাহা হইলে তিনি নিগৃহীত বা পরাজিত বলিয়া গণ্য হইবেন। বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমানে বিদ্বৎসভায় যেরূপ শাস্ত্রীয় বিচারপদ্ধতি প্রচলিত আছে, ইহা পূর্ব্বতন প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও নিতান্ত নীরস।

নির্দ্দেশের ক্রমানুসারে অতঃপর হেত্বাভাসের কথা আলোচনা করা আবশ্যক; কিন্তু 'হেত্বাভাস' অনুমান প্রমাণের সহিতই ঘনিষ্টভাবে সম্বদ্ধ; এইজন্য আমরা ইতঃপূর্ব্বে অনুমানের প্রসঙ্গেই

হেত্বাভাসের পরিচয় ও বিভাগাদি আলোচনা করিয়াছি; সুতরাং এখানে তাহার পুনরালোচনা রহিত করিয়া পরবর্ত্তী ছল প্রভৃতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। 'ছল' কি?—

"বচনবিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যাচ্ছলম্" ॥১।২।১০॥

বাদী যে অর্থ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বাক্য প্রয়োগ করে, প্রতিবাদী যদি যুক্তি দ্বারা তদ্বিরুদ্ধ অর্থ কল্পনাদ্বারা বাদীর উক্তির ব্যাঘাত ঘটায়, তাহা হইলে সেই বচন-ব্যাঘাতকে 'ছল' নামে অভিহিত করা হয়। ফল কথা, প্রতিবাদী যদি বাদীর অনভিমত তাৎপর্য্য পরিকল্পনা করিয়া বাদীর বাক্যে দোষ প্রদর্শন করে, তাহা হইলেই 'ছল' নামক দোষ উপস্থিত হয়। উক্ত ছল যে, কত রকমে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া সূত্রকার বলিতেছেন—

"তৎ ত্রিবিধং বাক্‌ছলং সামান্যচ্ছলমুপচারচ্ছলং চেতি॥" ১।২।১১॥

বাদীর কথায় দোষক্ষেপণ করাই ছলের উদ্দেশ্য। সেই দোষ-ক্ষেপণ তিন প্রকারে হইতে পারে; এইজন্য ছলও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে—বাক্‌ছল, সামান্যচ্ছল ও উপচারচ্ছল। বাদীর কথার অনভিপ্রেত অর্থ কল্পনার নাম 'বাক্‌ছল'। বাক্‌ছল অর্থ কথার ছল মাত্র—বক্তার কথার বিকৃত অর্থ করিয়া বক্তাকে উপহাসাস্পদ করা মাত্র। যেমন, একজন বলিল 'অমুক ব্যক্তি নব কম্বলযুক্ত'। ইহা শুনিয়া অপর ব্যক্তি 'নব' কথার ছল ধরিয়া বলিল, কৈ, ইহার ত একখানি মাত্র কম্বল দেখিতেছি, নয়খানি

কোথায় ? এখানে বক্তা 'নূতন' অর্থে 'নব' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রোতা সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া 'নয়' সংখ্যা অর্থ গ্রহণ করিলেন। বক্তাকে বিব্রত করিবার জন্য এই জাতীয় যে কোন প্রকার কথার ছল হইবে, তাহাই 'বাক্‌ছল' নামে অভিহিত হইবে। বাক্‌ছলের পর 'সামান্যচ্ছলের' কথা বলা হইতেছে ঃ—

একস্থলে কোন বিষয় সম্ভবপর দেখিয়া, তৎসজাতীয় অন্যত্র অসম্ভব হইলেও, কেবল সামান্য বা সাদৃশ্য নিবন্ধন যে, তাহার সম্ভবপরত্ব কল্পনা, তাহার নাম 'সামান্যচ্ছল।' যেমন কুলবিত্ত ব্রাহ্মণে বিদ্যার সদ্ভাব দেখিয়া বা শুনিয়া, কেহ যদি 'ব্রাহ্মণ হইলেই তাহাতে বিদ্যা থাকা 'সম্ভব' মনে করিয়া ব্রাহ্মণবালকে বা ব্রাত্য ব্রাহ্মণেও বেদবিদ্যার সম্ভবপরত্ব কল্পনা করেন, তবে তাহা 'সামান্যচ্ছল' বলিয়া পরিগণিত হইবে (১)। ইহা ছাড়া আরও একপ্রকার ছল আছে, তাহার নাম উপচারচ্ছল।

সাধারণতঃ শব্দের বৃত্তি (অর্থবোধন ক্ষমতা) দুই প্রকার— মুখ্য (শক্তি) ও গৌণ (লক্ষণা)। প্রত্যেক বক্তাকেই মুখ্য বা গৌণ বৃত্তি ধরিয়া শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়। এখন বক্তা যে অর্থ লক্ষ্য করিয়া শব্দ প্রয়োগ করে, অন্যে যদি তাহার বিপরীত

---

(১) ব্রাহ্মণবালক উপনীত হইবার পূর্ব্বে বেদবিদ্যায় অধিকারী হয় না। উপনয়নের কাল গর্ভাষ্টম হইতে যোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত, আর ব্রাহ্মণ্য-শক্তি লাভের জন্য পঞ্চম বৎসরও বিহিত আছে। যোড়শবর্ষ মধ্যে যাহার উপনয়ন না হয়, তাহাকে ব্রাত্য বলে। ব্রাত্যের উপনয়নে অধিকার নাই; সুতরাং বেদবিদ্যায়ও অধিকার থাকে না।

অর্থ গ্রহণ করিয়া কোন প্রকার দোষ উদ্ভাবন করে, তবে তাহাকে 'উপচারচ্ছল' বলে। যেমন, কেহ বলিল 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি', অর্থাৎ মাঁচাগুলি শব্দ করিতেছে। মাঁচা যে, শব্দ করিতে পারে না, বক্তা তাহা বিলক্ষণ জানেন; সুতরাং বলিতে হইবে যে, এখানে মুখ্যার্থ মাঁচা তাহার অভিপ্রেত অর্থই নহে, পরন্তু মঞ্চস্থ লোকসমূহই তাহার অভিপ্রেত। এমত অবস্থায়, অপর ব্যক্তি যদি ছল করিয়া—মঞ্চ শব্দের মুখ্যার্থ ধরিয়া বলে যে, এখানে মঞ্চ ত শব্দ করিতেছে না, মঞ্চস্থ লোকেরাই শব্দ করিতেছে; এবং শব্দ-শক্তিও মাঁচার নাই। তবে ইহা 'উপচারচ্ছল' হইবে। উপচারচ্ছলে—বক্তা মুখ্যার্থে শব্দ প্রয়োগ করিলে, তথায় গৌণার্থের কল্পনা, আর গৌণার্থে শব্দ প্রয়োগ করিলে, তথায় মুখ্যার্থ কল্পনা করিতে হয়।

এখানে বলা আবশ্যক যে, বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারস্থলেই সাধারণতঃ এইরূপ 'ছল' অবলম্বিত হইয়া থাকে; কিন্তু যতক্ষণ একে অপরের উপস্থাপিত পক্ষের খণ্ডনোপযোগী নির্দোষ প্রমাণ প্রদর্শন করিতে না পারেন, ততক্ষণ এই সকল 'ছল' প্রয়োগে পরপক্ষের প্রকৃত পরাজয় স্থির হয় না। এ সকল কেবল নিজ নিজ প্রতিভার পরিচায়ক হয় মাত্র; তত্ত্বনির্ণায়ক হয় না। ছলের সঙ্গে 'জাতির' যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে; এইজন্য সূত্রকার 'ছল' নিরূপণের পর জাতির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন—

"সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ ॥" ১।২।১৮ ॥

ব্যাপ্তি বা কোন প্রকার নিয়ম গ্রহণ না করিয়া কেবলই

সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য দ্বারা যে, প্রত্যবস্থান—প্রতিপক্ষরূপে অবস্থান, অর্থাৎ পরপক্ষে দোষ উদ্ভাবন, তাহার নাম 'জাতি'। অভিপ্রায় এই যে, অপরের সিদ্ধান্তের উপর দোষ প্রদর্শন করিতে হইলে, প্রথমেই ব্যাপ্তি বা কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম গঠন করিয়া লইতে হয়, কিন্তু জাতিস্থলে দোষপ্রদর্শককে সেরূপ কোন ব্যাপ্তির ভিতর দিয়া যাইতে হয় না; কেবল অন্যান্য প্রসিদ্ধ পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য মাত্রের অনুসরণ করিতে হয়। উল্লিখিত জাতির বিভাগ চতুর্ব্বিংশতি প্রকার,—

"সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যোৎকর্ষাপকর্ষ-বর্ণ্যাবর্ণ্য-বিকল্প-সাধ্য-প্রাপ্ত্যপ্রাপ্তি-প্রসঙ্গ-প্রতিদৃষ্টান্তানুৎপত্তি-সংশয়-প্রকরণাহেত্বর্থাপত্ত্যবিশেষোপপত্ত্যুপলব্ধ্যনুপলব্ধি-নিত্যানিত্য-কার্য্যসমাঃ" ॥ ৫।১।১ ॥

সূত্রের শেষস্থিত 'সম' শব্দের সহিত সূত্রস্থ প্রত্যেক শব্দের সম্বন্ধ আছে; সুতরাং জাতির বিভাগ এইরূপ হইবে—সাধর্ম্ম্য-সমা, বৈধর্ম্ম্যসমা, উৎকর্ষসমা, অপকর্ষসমা, বর্ণ্যসমা, অবর্ণ্যসমা, বিকল্পসমা, সাধ্যসমা, প্রাপ্তিসমা, অপ্রাপ্তিসমা, প্রসঙ্গসমা, প্রতি-দৃষ্টান্তসমা, অনুৎপত্তিসমা, সংশয়সমা, প্রকরণসমা, অহেতুসমা, অর্থাপত্তিসমা, অবিশেষসমা, উপপত্তিসমা, উপলব্ধিসমা, অনুপ-লব্ধিসমা, নিত্যসমা, অনিত্যসমা ও কার্য্যসমা।

উক্ত চব্বিশ প্রকার জাতির এক একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে,—সাধর্ম্ম্যসমা জাতি যথা—এইরূপ একটী সাধারণ ব্যাপ্তি বা নিয়ম আছে যে, "যৎ কৃতং তদনিত্যম্" অর্থাৎ যাহা

কিছু উৎপত্তিশীল পদার্থ, সে সমুদয়ই অনিত্য। ঘট পটাদির ন্যায় শব্দও উৎপন্ন পদার্থ; সুতরাং উহাও অনিত্য। জাতিবাদী এস্থলে উক্ত ব্যাপ্তির দিকে লক্ষ্য না করিয়া, কেবল দৃষ্টান্তানুসারে বলিলেন যে, ভাল, ঘট পটাদি দৃষ্টান্তানুসারে শব্দ যদি অনিত্য হইতে পারে, তাহা হইলে অমূর্ত্ত আকাশের দৃষ্টান্তবলে অমূর্ত্ত শব্দের ত নিত্যত্বও হইতে পারে; কারণ, আকাশ যেমন অমূর্ত্ত (মূর্ত্তিহীন) অথচ নিত্য, তেমনি শব্দও যখন মূর্ত্তিশূন্য, তখন উহাও নিত্য হইতে পারে। বৈধর্ম্ম্যসমা জাতি যথা—ঘট বস্তুটী জন্য, অথচ অনিত্য; শব্দও জন্য; সুতরাং অনিত্য। এই সিদ্ধান্তের উপর জাতিবাদী যদি বলেন যে, ভাল, ঘট জন্য হইলেও মূর্ত্ত বস্তু, শব্দে তাহার বৈধর্ম্ম্য—অমূর্ত্তত্ব রহিয়াছে; অতএব শব্দ নিত্যইবা হইবে না কেন? উৎকর্ষসমা জাতি যথা—জন্যত্ব নিবন্ধন অনিত্য যে ঘট, তাহা রূপবিশিষ্ট; কিন্তু জন্যত্ব নিবন্ধন যে শব্দের অনিত্যতা স্থাপন করা হইতেছে, সেই শব্দ কিন্তু রূপবান্ নহে; পক্ষান্তরে, জন্য অথচ অনিত্য শব্দেরও ঘট-দৃষ্টান্তানুসারে রূপবিশিষ্টতা হওয়া উচিত? ইত্যাদি।

অপকর্ষসমা জাতি যথা—ঘটে যেমন জন্যত্ব ও অনিত্যত্ব আছে, তেমনি তৎসহচরভাবে রূপও তাহাতে আছে; এদিকে ঘটদৃষ্টান্ত দ্বারা যে, শব্দের জন্যত্ব ও অনিত্যত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই শব্দে যখন রূপ নাই, তখন তৎসহচর জন্যত্ব এবং অনিত্যত্বও না থাকিতে পারে? ইত্যাদি।

বঙ্গীয় পাঠকবর্গ এইজাতীয় তর্ক-বিতর্কের আলোচনায় অভ্যস্ত

নহেন; সুতরাং এইজাতীয় উদাহরণে তাহাদের আমোদের পরিবর্ত্তে ধৈর্য্যচ্যুতিরই সম্ভাবনা সমধিক। অতএব আর অধিক উদাহরণ প্রদর্শনে তাহাদের ধৈর্য্যহানি করা সঙ্গত নহে। এইজন্য এখানেই জাতির আলোচনা শেষ করিয়া অবশিষ্ট 'নিগ্রহস্থান' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। মহর্ষি গোতম নিগ্রহ-স্থানের লক্ষণ করিয়াছেন এইরূপ—

"বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানম্" ॥ ১।২।১৯ ॥

বাদী ও প্রতিবাদীর উপস্থাপিত বিচারস্থলে, যাহাদ্বারা উভয়ের মধ্যে একের, আলোচ্য বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান (উল্টা বোঝা) কিংবা অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ অজ্ঞতা প্রকটিত হয়, তাহার নাম নিগ্রহস্থান। নিহগ্রস্থান দ্বাবিংশতি প্রকার—

"প্রতিজ্ঞাহানিঃ প্রতিজ্ঞান্তরং প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসো হেত্বন্তরমর্থান্তরং নিরর্থকমবিজ্ঞাতার্থমপার্থকমপ্রাপ্তকালং ন্যূনমধিকং পুন-রুক্তমননুভাষণমজ্ঞানমপ্রতিভা বিক্ষেপো মতানুজ্ঞা, পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণং নিরনুযোজ্যানুযোগোঽপসিদ্ধান্তো হেত্বাভাসাশ্চ নিগ্রহস্থানানি" ॥ ৫।২।১॥

প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক; অবিজ্ঞাতার্থ, অপার্থক, অপ্রাপ্তকাল, ন্যূন, অধিক, পুনরুক্ত, অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা, পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ, নিরনুযোজ্যানুযোগ, অপসিদ্ধান্ত ও হেত্বাভাস, এই দ্বাবিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সংক্ষেপে এ সকলের বিবৃতি বা ব্যাখ্যা প্রদান করা যাইতেছে—

বাদী কোন বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া প্রথমে, যে প্রতিজ্ঞা নির্দ্দেশ করে, পরে যদি প্রতিপক্ষের প্রদর্শিত দোষ-সংশোধনে অসামর্থ্য বশতঃ তাহা পরিত্যাগ করে, তবে তাহার নাম হয় 'প্রতিজ্ঞাহানি'। যেমন, বাদী প্রতিজ্ঞা করিল—'শব্দ' অনিত্য; কারণ, উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। বাদীর প্রতিজ্ঞা শ্রবণে প্রতিবাদী বলিল—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেই যদি অনিত্য হয়, তবে মনুষ্যাদিগত জাতিও (মনুষ্যত্ব প্রভৃতিও) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; সুতরাং তাহাও অনিত্য হইতে পারে? এই আপত্তির সমাধান করিতে না পারিয়া বাদী যদি, 'আচ্ছা শব্দ নিত্যই হউক' বলে, তবে—এখানে প্রথমে শব্দকে অনিত্য বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া, পরে নিত্য বলিয়া স্বীকার করায় 'প্রতিজ্ঞাহানি' নামক 'নিগ্রহস্থান' হইবে।

এইরূপ প্রথমে একরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, পরে যদি অন্য প্রকার প্রতিজ্ঞা করা হয়, তবে তাহাকে 'প্রতিজ্ঞান্তর' বলে। প্রতিজ্ঞাত পদার্থ সংস্থাপনের নিমিত্ত, যে হেতুর উল্লেখ করা হয়, তাহা যদি প্রতিজ্ঞার বিরোধী হয়, তবে তাহার নাম 'প্রতিজ্ঞা-বিরোধ'। স্বপক্ষে পরোদ্ভাবিত দোষক্ষালনে অসামর্থ্যবশতঃ যে, প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পরিবর্ত্তন, তাহার নাম 'প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস'। প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির জন্য প্রথমে সামান্যভাবে, যে হেতুর উল্লেখ করা হয়, প্রতিপক্ষের দোষাক্ষেপ বশতঃ তাহাকে বিশেষণদ্বারা বিশেষিত করিলে 'হেত্বন্তর' নামক নিগ্রহস্থান ঘটে। যে বিষয়টী সাধনের জন্য প্রতিজ্ঞা করা হয়, বাদী যদি তদানুষঙ্গিক বিষয়ের (যাহা সে স্থানের উপযোগী নহে,) অবতারণা করেন; তাহা হইলে

'অর্থান্তর' নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির অনুপযোগী অর্থহীন শব্দ (যেমন ক, চ, ট, ত, প প্রভৃতি) প্রয়োগ করিলে 'নিরর্থক' নামক নিগ্রহস্থান হয়। বার বাদী তিনবার বলিলেও যদি শ্লেষ বা অস্পষ্টার্থক শব্দের প্রয়োগ কিংবা অতিদ্রুত উচ্চারণ বশতঃ সভাসদ্গণ ও প্রতিবাদী সে কথার অর্থ বুঝিতে না পারে, তবে তাহাকে 'অবিজ্ঞাতার্থ' বলে। যে সকল পদ বা বাক্য পরস্পর সম্মিলিত হইয়া কোনরূপ অর্থের প্রতীতি জন্মায় না, তাদৃশ বাক্য-প্রয়োগের নাম 'অপার্থক'। পূর্ব্বকথিত প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি ন্যায়াবয়বগুলির যেভাবে প্রয়োগ করিবার নিয়ম, তাহার বিপরীতক্রমে প্রয়োগ করিলেই, তাহাকে 'অপ্রাপ্তকাল' বলে। অনুমানস্থলে ন্যায়ের পাঁচটী অবয়বেরই প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার কোন একটী অবয়বের অপ্রয়োগেই 'ন্যূনতা' নামক নিগ্রহ স্থান হয়। প্রতিজ্ঞাত বিষয় সাধনের জন্য একটী হেতুর স্থলে অনেক হেতুর কিংবা বহু উদাহরণ প্রয়োগ করিলে 'অধিক' নামক নিগ্রহস্থান হয়। শব্দ ও অর্থের অকারণ পুনরুল্লেখ করা, কিংবা প্রকারান্তরে যাহা পাওয়া যাইতে পারে, শব্দদ্বারা তাহার উল্লেখ করার নাম 'পুনরুক্ত' নিগ্রহস্থান। বাদী তিনবার বলিয়াছে, সভাসদ্গণও তাহার অর্থ বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু প্রতিবাদী যদি অর্থ বোঝা দূরে থাকুক, তাহার প্রত্যুচ্চারণও করিতে না পারে, তবে তাহাকে 'অননুভাষণ' বলে। বাদী তিনবার বলিয়াছে, সভ্য-গণও তাহার অর্থ বুঝিয়াছেন, এমত অবস্থায় প্রতিবাদী যদি সেই অর্থ বুঝিতে না পারে, তবে তাহাকে 'অজ্ঞান' বলে। প্রতিবাদী

থোপযুক্ত সময়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলে, তাহার নাম হয় 'অপ্রতিভা' নিগ্রহস্থান। যে সময় বিচার চলিতেছে, সে সময় কার্য্যান্তরচ্ছলে কথা বলার নাম 'বিক্ষেপ'। স্বপক্ষে পরোদ্ভাবিত দোষের সমাধান না করিয়াই যদি পরপক্ষে দোষের সদ্ভাব প্রদর্শন করা হয়, তবে তাহাকে বলে 'মতানুজ্ঞা' নিগ্রহস্থান। এক-পক্ষে নিগ্রহস্থান উপস্থিত সত্ত্বেও যদি তাহার উল্লেখ না করা হয়, তবে তাহাকে 'পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ' বলা হয়। আর যেখানে বাস্তবিক পক্ষে নিগ্রহস্থান সংঘটিত না হইলেও ভ্রান্তিবশে নিগ্রহ-স্থানের উদ্ভাবন করা হয়, তাহাকে বলে 'নিরনুযোজ্যানুযোগ'। বিচারস্থলে নিজের স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিপরীত বা বিরুদ্ধ কথা বলিলে, তাহাকে বলে 'অপসিদ্ধান্ত'। 'হেত্বাভাস' নামক নিগ্রহস্থানের বিশেষ বিবৃতি পূর্ব্বে অনুমান-প্রকরণেই প্রদত্ত হইয়াছে; সুতরাং এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন ও অনাবশ্যক।

উল্লিখিত দ্বাবিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থানের এক একটী পৃথক্ উদাহরণ দিলে অনেক কথা বলিতে হয়, অথচ সে সকল উদাহরণ শ্রোতৃগণের মোটেই ব্যবহারোপযোগী নহে, অধিকন্তু অত্যন্ত নীরস ও জটিল হইবে, মনে করিয়া সে চিন্তা পরিত্যাগ করা হইল।

[আলোচনা।]

মহর্ষি গোতমের মতে জগতে যত প্রকার পদার্থ আছে, সে সমুদয়ের সমষ্টিসংখ্যা ষোড়শ; এতদপেক্ষা ন্যূন বা অধিক সংখ্যা হইতে পারে না। তন্মধ্যে প্রমাণের সমষ্টি সংখ্যা চার,—প্রত্যক্ষ,

অনুমান. উপমান ও শব্দ। আর প্রমেয়ের সংখ্যা দ্বাদশ—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মনঃ, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ বা মুক্তি। এই দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের তত্ত্ব নিরূপণের উদ্দেশ্যেই উক্ত চতুর্ব্বিধ প্রমাণের অবতারণা। জীবগণ ঐ সকল প্রমাণের সাহায্যে বুঝিতে পারে যে, আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্ ও দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন; এবং নিত্য ও চৈতন্য সম্পন্ন। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেই আত্মাতে জ্ঞান ও সুখ দুঃখাদি সমুৎপন্ন হয়। অনাত্মা দেহেতে আত্ম-ভ্রান্তিই সুখ-দুঃখের নিদান। তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে সেই ভ্রান্তির নিবৃত্তি হয়, এবং ভ্রান্তির নিবৃত্তিতে সর্ব্ব দুঃখের অবসানরূপ অপবর্গ লাভ হয়। এই অপবর্গ-লাভের জন্যই জীবগণকে বিবিধ সাধনের সাহায্য লইতে হয়। এই প্রসঙ্গে তত্ত্বজ্ঞান-লাভের উপযোগী সমাধি ও সংযম-প্রভৃতি সাধন-নিচয়ের উপদেশ প্রদান করিয়া ঋষি গোতম আপনার কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত করিয়াছেন।

আমরা অতঃপর বৈশেষিক দর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

[বৈশেষিক দর্শন।]

পূর্ব্বপ্রদর্শিত ক্রমানুসারে ন্যায়দর্শনের পর বৈশেষিক দর্শনের আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে। বৈশেষিক দর্শন-রচয়িতার নাম কণাদ। কণাদের অপর নাম উলূক বা ঔলূক্য। মহাভারতে ভীষ্মকৃত স্তবরাজে উলূক নামে এক মুনির কথা উল্লিখিত আছে। সেই উলূক আর এই দার্শনিক কণাদ একই ব্যক্তি বলিয়া বুঝা যায়। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, কৃষকেরা জমী হইতে গ্রহণ-যোগ্য শস্যরাশি লইয়া গেলে পর, জমীতে যাহা কিছু অবশিষ্ট শস্যকণা পড়িয়া থাকিত, তিনি তাহা এক একটী করিয়া তুলিয়া লইতেন এবং তদ্দ্বারা আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। এই প্রকার কঠোর তপস্যায় নিরত থাকায় বৈশেষিক দর্শনের রচয়িতা 'কণাদ' নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, এইরূপ কিংবদন্তীর প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কোন কোন দার্শনিক 'কণভক্ষ' ও 'কণভুক্' প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগে তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার কণাদ নামটী ঐরূপ যৌগিক হইলেই ঐপ্রকার বিদ্রূপবাক্য কথঞ্চিৎ শোভন হইতে পারে।

মহামতি মাধবাচার্য্য স্বপ্রণীত 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ' নামক গ্রন্থে বৈশেষিক দর্শনকে 'ঔলূক্যদর্শন' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই দর্শনে 'বিশেষ' নামে একটী পদার্থ উত্তমরূপে নিরূপিত ও সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া ইহার 'বৈশেষিক দর্শন' নাম হইয়াছে;

এবং গ্রন্থকারের নামানুসারে ইহার আরও দুইটী নাম প্রসিদ্ধ আছে—১—'কণাদ দর্শন' ও ২—ঔলূক্য দর্শন।

কণাদ, মুনি ছিলেন, কি ঋষি ছিলেন, তাহা নিরূপণ করা বড় কঠিন। আচার্য্য প্রশস্তপাদ 'পদার্থসংগ্রহ' নামক গ্রন্থের প্রারম্ভে কণাদকে মুনি বলিয়াই প্রণাম করিয়াছেন (১)। তিনি ঋষিই হউন বা মুনিই হউন, তাঁহার গ্রন্থ যে, এক সময় দেশমধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি ও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, মহামুনি কণাদ তীব্র তপস্যায় মহেশ্বরের প্রসাদলাভ করেন, এবং তাঁহারই আদেশে বৈশেষিক দর্শন প্রণয়ন করেন। মহামতি উদয়নাচার্য্যও উক্ত ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

কণাদকৃত বৈশেষিক দর্শন যে, এক সময়ে এদেশে সমধিক সমাদৃত ও আলোচিত হইত, ইহার ব্যাখ্যাগ্রন্থ দৃষ্টেই তাহা অনুমিত হয়। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে উহার সমস্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ পাওয়া যায় না; কেবল নাম শুনিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। বেদান্তের শাঙ্করভাষ্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, লঙ্কেশ্বর রাবণ এই বৈশেষিক দর্শনের উপর একটী ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন (২)। এখন অনেকে তাহার নাম পর্য্যন্তও জানেন না; সুতরাং তাহা যে, কত বড় ও কিরূপ ছিল, এখন জানিবার

---

(১) "প্রণম্য হেতুমীশ্বরং মুনিং কণাদমাদরাৎ।
পদার্থ-ধর্ম্ম-সংগ্রহঃ প্রবক্ষ্যতে মহোদয়ঃ॥"

(২) বেদান্ত দর্শন—২য় অঃ। ২য় পাদঃ। তৃতীয় অধিকরণ।

কোন উপায় নাই। বোধ হয়, উহা চিরদিনের তরে অতল কাল-সাগরে ডুবিয়াছে, পুনরুদ্ধার হইবে কি না, কে বলিতে পারে? আচার্য্য প্রশস্তপাদ বৈশেষিক দর্শন অবলম্বনে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে বৈশেষিক দর্শনের কোন সূত্রই ব্যাখ্যাত হয় নাই; কেবল সূত্র তাৎপর্য্যমাত্র সংগৃহীত ও আলোচিত হইয়াছে। কেহ কেহ ঐ গ্রন্থখানিকে বৈশেষিক দর্শনের ভাষ্য-ব্যাখ্যা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা ভাষ্য নহে; বৈশেষিক দর্শনের তাৎপর্য্য-প্রকাশক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থমাত্র। কেন না, ভাষ্য-লক্ষণের সঙ্গে উহার কিছুমাত্র মিল নাই (১), অধিকন্তু প্রশস্তপাদাচার্য্য নিজেও উহাকে ভাষ্য-ব্যাখ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই; বরং নমস্কার শ্লোকে 'পদার্থ-ধর্ম্ম-সংগ্রহ' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের টীকাকার উদয়নাচার্য্যও উহাকে টীকা ও ভাষ্যের অতিরিক্ত একখানি প্রকরণ গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (২)। ঐ গ্রন্থে বৈশেষিক দর্শনের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য অতি সংক্ষেপে ও বিশদভাবে সংকলিত হইয়াছে; অধিকন্তু বৈশেষিক দর্শনে অনুক্ত

---

(১) ভাষ্যের লক্ষণ—"সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যেন পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥"

যাহা দ্বারা সূত্রের অনুরূপ পদ দ্বারা সূত্রস্থ পদ ব্যাখ্যাত হয়, এবং সূত্রানুরূপ সেই পদসমূহও আবার ব্যাখ্যাত হয়, ভাষ্যবিদ্‌গণ তাহাকে 'ভাষ্য' বলিয়া জানেন।

(২) "শাস্ত্রৈকদেশসম্বন্ধং শাস্ত্রকার্য্যান্তরে স্থিতম্।
আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ॥"

সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ও অতি উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই 'পদার্থ-ধর্ম্ম-সংগ্রহে'র উপর উদয়নাচার্য্য ও শ্রীধরাচার্য্য যথাক্রমে কিরণাবলী ও ন্যায়কন্দলী নামে দুইখানি উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ উভয় টীকাই এখনও প্রচলিত আছে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ প্রশস্তপাদাচার্য্যের গ্রন্থকে মূল গ্রন্থের ন্যায়ই প্রামাণিক মনে করিতেন; এবং ঐ গ্রন্থ অবলম্বনপূর্ব্বক কোন কোন পণ্ডিত বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে বল্লভাচার্য্য-প্রণীত 'ন্যায়লীলাবতী' নামক গ্রন্থখানি বিশেষ প্রশংসনীয়; তদুপরি প্রসিদ্ধ বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ের কৃত কিরণাবলী-প্রকাশ ও লীলাবতী-প্রকাশ এবং মথুরানাথ তর্কবাগীশের কিরণা-বলী-রহস্য ও লীলাবতী-রহস্য নামক গ্রন্থদ্বয়ও অতি উত্তম এবং বিদ্বৎসমাজে প্রশংসিত। তাহার পর অনতিপ্রাচীন শঙ্করমিশ্রও বৈশেষিক দর্শনের উপর সূত্রোপস্কার নামে একখানি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখিয়াছেন; খুব প্রাচীন না হইলেও উহা সুধীসমাজে বিশেষ সমাদৃত। আধুনিকের মধ্যে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকৃত 'কণাদ-সূত্রবৃত্তি' নামে একখানি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে, তাহাতে প্রধানতঃ বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চাননকৃত সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীরই ছায়া অবলম্বিত হইয়াছে। তাঁহার পরে নানাশাস্ত্রপারদর্শী ও বহুগ্রন্থপ্রণেতা স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে বৈশেষিক দর্শনের একখানি উৎকৃষ্ট ভাষ্য রচনা করিয়াছেন; তাহাতে যথেষ্ট মৌলিকতা ও চিন্তাশীলতার নিদর্শন আছে। আশা করা যায়, কালে উহার

সমধিক সমাদর বৃদ্ধি পাইবে। সাংখ্য-ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুও বৈশেষিক দর্শনের উপর একখানা 'বার্ত্তিক' গ্রন্থ(১) প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, শঙ্করমিশ্র উপস্কারগ্রন্থে প্রাচীন বৃত্তি-গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু বর্ত্তমানে সে গ্রন্থের অস্তিত্ব আছে, কি নাই, বলিতে পারা যায় না। উপরে যে সমুদয় টীকা, ভাষ্য, বার্ত্তিক ও প্রকরণ গ্রন্থের নাম করা হইল, তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এককালে এদেশে বৈশেষিক দর্শনের কিরূপ প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রচলিত ছিল। এখন মহাকালের করাল নিষ্পেষনে তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; বিশেষতঃ প্রচলিত নব্য ন্যায়ের প্রচারবাহুল্যে উল্লিখিত সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থেরই সমাদর ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনা কমিয়া গিয়াছে এবং কোন কোন গ্রন্থ চিরদিনের জন্য অনন্ত কালসাগরে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন চিন্তাপদ্ধতির বিলোপ যে, বিশেষ পরিতাপের কারণ, তাহাতে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন এক-জাতীয় শাস্ত্র—সমান তন্ত্র বলিয়া পরিচিত; সুতরাং ঐ উভয় দর্শনের মধ্যে যে, একটা সমতার ছায়া বিদ্যমান আছে, তাহা না বলিলেও বুঝিতে বাকী থাকে না। উভয়ের লক্ষ্য ও বিচার-পদ্ধতি প্রায় অনেকাংশেই তুল্য, কেবল পদার্থ সংকলনে ও তদুপ-

---

(১) বার্ত্তিকের লক্ষণ—"উক্তানুক্তদুরুক্তার্থ-ব্যক্তকারি তু বার্ত্তিকম্।"
অর্থাৎ যে ব্যাখ্যায় মূলের উক্ত, অনুক্ত বা অসমঞ্জসরূপে উক্ত বিষয়কে পরিস্ফুট করিয়া বুঝাইয়া দেয়, তাহার নাম বার্ত্তিক।

যোগী প্রমাণ নির্ব্বাচনাংশেই উভয়ের মধ্যে প্রধানতঃ মতভেদ দৃষ্ট হয়, তদ্ভিন্ন আনুষঙ্গিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলি ছাড়িয়া দিলে, প্রায় সমস্ত প্রধান বিষয়েই উভয় দর্শনের ঐক্যমত দেখিতে পাওয়া যায়।

পদার্থ সংকলনকালে গোতম ষোড়শ পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, কণাদ সে স্থলে সাতটীমাত্র পদার্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গোতমোক্ত অন্যান্য পদার্থগুলি উক্ত সপ্ত পদার্থের মধ্যেই সন্নিবেশিত করিয়াছেন (১)। প্রচলৎ ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য গোতম চারিটী প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন; কণাদ সে স্থলে তিনটীমাত্র প্রমাণ দ্বারাই সেই সমুদয় ব্যবহারের উপপত্তি করিয়াছেন। এই দুইটী অংশ ত্যাগ করিলে আর প্রায় সকল বিষয়েই উভয়ের যথেষ্ট ঐক্য দেখা যায়।

ন্যায় দর্শনের ন্যায় বৈশেষিক দর্শনেও অবিদ্যাই সর্ব্ববিধ দুঃখোদ্ভয়ের নিদানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উভয় দর্শনেরই প্রধান বা চরম লক্ষ্য—দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তি, এবং তাহার উপায় হইতেছে—তত্ত্বজ্ঞান। এবিষয়েও উভয়েই একমত। বিশেষ এই যে, ন্যায়দর্শনের মতে ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান, আর বৈশেষিক দর্শনের মতে ষট্ পদার্থের

(১) ন্যায় দর্শনোক্ত সংশয় প্রয়োজন প্রভৃতি পদার্থনিচয়ের মধ্যে, কতকগুলি প্রমাণের অন্তর্ভূত, আর অধিকাংশই দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের গুণ বা ধর্ম্মরূপে অন্তর্ভুক্ত হইবে। প্রমাণের মধ্যে উপমান প্রমাণটীকে বিশ্লেষণ করিয়া, উহার কতক প্রত্যক্ষে, কতক শব্দে ও কতক অনুমানের অন্তর্ভূত করিয়া লইতে হইবে।

তত্ত্বজ্ঞান, নিঃশ্রেয়স লাভের প্রকৃষ্ট উপায়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিষয়ের কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও, বচনভঙ্গী প্রায় উভয়েরই সমান। গোতম বলিয়াছেন—।

"প্রমাণ-প্রমেয় * * * নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।"

সে স্থলে কণাদ বলিতেছেন—

"ধর্ম্মবিশেষ-প্রসূতাদ্ দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ॥"

এখানে 'ধর্ম্মবিশেষ' অর্থ—নিবৃত্তি-ধর্ম্ম বা নিষ্কাম কর্ম্ম। তাদৃশ ধর্ম্মবিশেষের অনুশীলনের ফলে যে, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়, এই সমুদয় পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য বিচার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়।

এ কথার অভিপ্রায় এই যে, নিবৃত্তি পথে থাকিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্ত নির্ম্মল হয়; নির্ম্মল চিত্তে বস্তুর যথার্থস্বরূপ জানিবার যোগ্যতা উপস্থিত হয়। তখন তত্ত্বজ্ঞানের জন্য প্রথমতঃ পদার্থ সমূহের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের বিচার করা আবশ্যক হয়; অর্থাৎ কোন কোন পদার্থ সম-ধর্ম্মাবলম্বী, আর কোন কোন পদার্থ তদ্বিপরীত অর্থাৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী; এই প্রকারে সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য বিচার করিতে করিতে মনোমধ্যে যে, পরিগণিত ষট্ পদার্থ সম্বন্ধে বিমল তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তাহাই মুক্তিপ্রাপ্তির প্রশস্ত উপায়।

উল্লিখিত উদ্দেশ-সূত্রে মহামুনি কণাদ ছয়টীমাত্র পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সে সমুদয়ের তত্ত্বজ্ঞানকেই মুক্তিলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু 'অভাব' বলিয়া কোন পদার্থের নাম গন্ধও করেন নাই; অথচ স্থানে স্থানে অভাবের সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিয়াছেন। ইহা হইতে সন্দেহ হয় যে, কণাদ কি ষট্ পদার্থবাদী ছিলেন, না সপ্ত পদার্থবাদী ছিলেন?—এ কথার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, কণাদ অভাবেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন সত্য, কিন্তু 'অভাব' মাত্রই ভাব-সাপেক্ষ; অগ্রে ভাব পদার্থ না জানিলে অভাব বুঝিতেই পারা যায় না; এই কারণে, তিনি উক্ত সূত্রমধ্যে অন্য-নিরপেক্ষ ছয়টীমাত্র ভাব পদার্থেরই নামোল্লেখ করিয়াছেন; অভাবের আর স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেন নাই। প্রসিদ্ধ বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও স্বকৃত গ্রন্থমধ্যে কণাদকে স্পষ্টাক্ষরেই সপ্তপদার্থবাদী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং ষণ্ণাং পদার্থানাম্ 'অভাব'-সপ্তমানাং" ইত্যাদি।

কণাদের সূত্রমধ্যে কেবল ষট্ পদার্থের উল্লেখ থাকিলেও, তিনি 'অভাব-সপ্তমানাম্' বলিয়া অভাবকেও সপ্তম পদার্থরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পরে, প্রসিদ্ধ বল্লভাচার্য্যও "অভাবশ্চ বক্তব্যঃ, নিঃশ্রেয়সোপযোগিত্বাৎ ভাবপ্রপঞ্চবৎ" ইত্যাদি বাক্যে দ্রব্যাদি ছয়টী ভাবপদার্থের ন্যায় অভাবেরও উল্লেখ থাকা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন; কারণ, ভাবপদার্থের ন্যায় অভাবও

নিঃশ্রেয়স লাভের একান্ত উপযোগী। কেন না, কারণের অভাবে যে, কার্য্যের অভাব হয়, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত সিদ্ধান্ত এবং মৃত্তিকার-অভাবে যে, ঘটের অভাব হয়, ইহাও সকলের প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ; সুতরাং দুঃখের কারণীভূত অজ্ঞানের অভাবে যে, তন্মূলক দুঃখেরও অভাব বা নিবৃত্তি হয়, একথায় কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। অতএব তত্ত্বজ্ঞানে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে, নিশ্চয়ই তন্মূলক দুঃখেরও অভাব হইবে। দুঃখাভাবই মোক্ষ। অতএব মুক্তিলাভে অভাবেরও সম্পূর্ণ উপযোগিতা আছে। উপযোগিতা আছে বলিয়াই অভাবকেও পদার্থ-শ্রেণীর মধ্যে গ্রহণ করা আবশ্যক হইতেছে। এইজন্য তিনি 'অভাবশ্চ বক্তব্যঃ' বলিয়া আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যও পদার্থধর্ম্মসংগ্রহনামক গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকা—কিরণাবলী গ্রন্থে অভাবকেও সপ্তম পদার্থরূপে স্বীকার করিয়াছেন, এবং স্বমত-সমর্থনচ্ছলে, সূত্রে ছয়টীমাত্র পদার্থ-নির্দ্দেশের তাৎপর্য্য-প্রকাশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"এতে চ পদার্থাঃ প্রধানতয়া উদ্দিষ্টাঃ অভাবস্তু স্বরূপবানপি নোদ্দিষ্টঃ, প্রতিযোগিনিরূপণাধীন-নিরূপণত্বাৎ, নতু তুচ্ছত্বাৎ" ইতি।

অভিপ্রায় এই যে, কণাদ স্বকৃত সূত্রমধ্যে প্রধান ছয়টীমাত্র পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু অভাব স্বরূপতঃ সত্য হইলেও, তাহার উল্লেখ করেন নাই। ইহার কারণ এই যে, অভাব স্বরূপতঃ তুচ্ছ—অলীক না হইলেও, স্বপ্রধান নহে,—প্রতিযোগি-জ্ঞান-সাপেক্ষ, অর্থাৎ যাহার অভাব বুঝিতে হইবে, অগ্রে সেই পদার্থটী

জানিতে হয়, পরে তাহার অভাব বুঝিতে হয়, নচেৎ শুধু অভাব কাহারই বুদ্ধিগম্য হয় না; এইজন্য সূত্রমধ্যে প্রধানভূত ষড়্বিধ প্রতিযোগী পদার্থমাত্র নিরূপিত হইয়াছে; তাহা দ্বারাই তদধীন অভাবের প্রতীতি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী নব্য নৈয়ায়িকগণ একবাক্যে অভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং যথেচ্ছরূপে অভাবের ব্যবহার করিয়াছেন; সুতরাং আধুনিক ব্যবহারক্ষেত্রে অভাবের অস্তিত্ব অপলাপ করিবার উপায় নাই।

কেহ কেহ একথায় পরিতুষ্ট হইতে পারেন নাই। কণাদকে তাহারা ষট্পদার্থবাদী বলিয়াই মনে করেন। অনেকানেক শাস্ত্রবচন এবং প্রসিদ্ধ প্রবচনও তাঁহাদের মতের সমর্থন করিয়া থাকে। সাংখ্যদর্শনপ্রণেতা কপিলদেবও কণাদকে ষট্পদার্থবাদী বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন—

"ন বয়ং ষট্পদার্থবাদিনো বৈশেষিকাদিবৎ॥" সাংখ্যদর্শন ১।২৫।

এখানে তিনি কণাদকৃত বৈশেষিক দর্শনকে ষট্পদার্থবাদী বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার পর—

"ধর্ম্মং ব্যাখ্যাতুকামস্ত ষট্পদার্থোপবর্ণনম্।
সাগরং গন্তুকামস্ত হিমবদ্গমনোপমম্।" (প্রবচন বাক্য)।

এই প্রসিদ্ধ প্রবচন বাক্যে ধর্ম্ম-ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত কণাদের ষট্পদার্থ নিরূপণে উত্তম দেখিয়া উপহাস করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু কণাদ ষট্পদার্থবাদী, কি সপ্তপদার্থবাদী ছিলেন, তাহা ঠিক করিয়া বলা বড়ই কঠিন।

সে যাহা হউক, এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে যে, মহামুনি কণাদ দীর্ঘকালব্যাপী আরাধনায় ভগবান্ মহেশ্বরের সন্তোষ সম্পাদন করেন; এবং তাঁহারই আদেশক্রমে এই বৈশেষিক দর্শন রচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি 'বিশেষ' নামে একটী অভিনব পদার্থের আবিষ্কার করেন, এবং তৎসমর্থনোপযোগী বহুতর যুক্তি তর্ক গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করেন; এইজন্য তদীয় দর্শনশাস্ত্র 'বৈশেষিক' নামে পরিচিত ও সমাদৃত হইয়াছে।

কণাদকৃত বৈশেষিক দর্শন দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটী করিয়া আহ্নিক আছে। আহ্নিক শব্দটী পরিচ্ছেদ কথার সমানার্থক। সমস্ত বৈশেষিক দর্শনে তিনশত সত্তরটী (৩৭০) সূত্র বর্ত্তমান আছে। উহার যতগুলি সূত্র এক দিনে রচিত হইয়াছিল, সেই সমুদয় সূত্র লইয়া এক একটী আহ্নিক কল্পিত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সম্পূর্ণ বৈশেষিক দর্শন রচনা করিতে মহামুনি কণাদের বিশ দিন মাত্র সময় ব্যয়িত হইয়াছিল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁহার বিশ দিনের গ্রন্থখানি উত্তমরূপে বুঝিয়া পড়িতে এখন বিশ মাস সময়ও বেশী বলিয়া মনে হয় না।

এই দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, এই তিনটী জাতিবিশিষ্ট পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় আহ্নিকে জাতি ও বিশেষ নামক দুইটী পদার্থ বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চভূত, এবং দ্বিতীয় আহ্নিকে কেবল কাল ও

দিক্ পদার্থদ্বয় নিরূপিত হইয়াছে। তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় আহ্নিকে আত্মা ও মনের কথা বলা হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে জগতের মূল কারণানুসন্ধান ও প্রত্যক্ষের কারণ নির্ণয়, এবং দ্বিতীয় আহ্নিকে শরীর সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে। পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে দৈহিক কর্ম্মসমূহ, আর দ্বিতীয়াহ্নিকে মানসিক ব্যাপারনিচয় নিরূপিত হইয়াছে। ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে দান ও প্রতিগ্রহ এবং দ্বিতীয়াহ্নিকে আশ্রমচতুষ্টয় ও তদুপযোগী ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। সপ্তমাধ্যায়ের উভয় আহ্নিকে রূপরসাদি চতুর্ব্বিংশতি গুণ ও সমবায় 'সম্বন্ধ' বর্ণিত হইয়াছে। আর অষ্টমাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, ও দ্বিতীয় আহ্নিকে জ্ঞান সাধন ইন্দ্রিয়বর্গ নিরূপিত হইয়াছে। নবমাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে অভাব ও প্রত্যক্ষের কয়েকটী কারণ, আর দ্বিতীয় আহ্নিকে অনুমান ও স্মৃতিজ্ঞান প্রভৃতি এবং দশমাধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে সুখ-দুঃখের কথা, ও দ্বিতীয়াহ্নিকে সমবায়ী কারণ প্রভৃতি ত্রিবিধ কারণ ও প্রসঙ্গাগত অন্যান্য বিষয় বিবেচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। বলা আবশ্যক যে, এ প্রবন্ধে আমরা উল্লিখিত পদার্থগুলির যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করিতে যত্ন করিব।

ন্যায়দর্শনের ন্যায় বৈশেষিক দর্শনেরও চরম লক্ষ্য নিঃশ্রেয়সলাভ। মুক্তি ও নিঃশ্রেয়স একই পদার্থ। সেই নিঃশ্রেয়সলাভের একমাত্র উপায় হইতেছে তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত কাহারও পক্ষেই নিঃশ্রেয়স লাভ করা সম্ভবপর হয় না। গোতম ষোড়শ পদার্থবাদী; সুতরাং তাঁহার মতে তত্ত্বজ্ঞান বলিলে, ষোড়শ

পদার্থেরই তত্ত্ববোধ বুঝিতে হইবে; আর কণাদ ষট্‌পদার্থবাদী; সুতরাং তাঁহার মতে ষট্‌পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকেই নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির উপায়রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। লৌকিক চেষ্টায়ও ষট্‌পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহাদ্বারা নিঃশ্রেয়সলাভ সম্ভবপর হয় না; পরন্তু সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানই নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির একমাত্র উপায়, যাহা ধর্ম্ম বিশেষ-প্রসূত, অর্থাৎ নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুশীলনে সমুৎপন্ন, এবং যাহা সংশয়-বিপর্য্যয়-রহিতভাবে নিখিল বস্তুর তত্ত্ব করামলকবৎ প্রত্যক্ষগোচর করিয়া দেয়। এইরূপ অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কণাদ ঋষি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য তৎসিদ্ধির উপায় ও অভিমত পদার্থের সংখ্যা নির্দ্দেশপূর্ব্বক গ্রন্থারম্ভ (সূত্রারম্ভ) করিতেছেন—

"ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাৎ দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সম্। (১।১।৪ সূত্র।)

এই বিশাল বিশ্বভাণ্ডারে যত রকম পদার্থ আছে, সে সমুদয় পদার্থ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত—১। দ্রব্য, ২। গুণ, ৩। কর্ম্ম, ৪। সামান্য বা জাতি, ৫। বিশেষ ও ৬। সমবায় (একপ্রকার সম্বন্ধ)। কণাদের মতে জাগতিক পদার্থসংখ্যা এতদপেক্ষা ন্যূন বা অধিক সম্ভবপর হয় না। অবশ্য 'অভাব' নামে এতদতিরিক্ত সপ্তম পদার্থ আছে সত্য, কিন্তু ভাবপদার্থ যতপ্রকার আছে, সে সমুদয়কে ইহারই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হইবে। এই ষড়্‌বিধ পদার্থের মধ্যে কোন কোন অংশে পরস্পর সাধর্ম্ম্যও (সমান ধর্ম্মও) আছে, আবার তদ্বিরুদ্ধ বৈধর্ম্ম্য (পরস্পর

বিপরীত ধর্ম্মও) আছে। সেই সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য সহকারে যে, উক্ত ষড়্‌বিধ পদার্থের (অভাবেরও) যথাযথ জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান), সেই তত্ত্বজ্ঞান হইতে জীবগণের নিঃশ্রেয়স বা দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি সিদ্ধ হয়।

এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে হয়। দীর্ঘকাল নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে করিতে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ চিত্ত স্বতই বিমল জ্ঞান-প্রকাশে প্রস্ফুরিত হয়। সেই বিমল জ্ঞানালোকে অজ্ঞান-তিমির অন্তর্হিত হইয়া যায়; তখন বস্তুতত্ত্ব আপনা হইতেই যথাযথভাবে তাহার নিকট স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব মুমুক্ষুর পক্ষে যেমন তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন, তেমনই নিষ্কামভাবে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুশীলন করাও একান্ত আবশ্যক। সেই ধর্ম্ম কি?

"যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ। (১।১।২।)

—অভ্যুদয় অর্থ—কল্যাণ; নিঃশ্রেয়স অর্থ—নিশ্চিত বা নিঃশেষ —সর্ব্বোৎকৃষ্ট কল্যাণ। ধর্ম্ম দ্বারা যেমন নানাপ্রকার আপেক্ষিক কল্যাণময় স্বর্গাদিলাভ করা যায়, তেমনি সর্ব্ব কল্যাণের সারভূত বা সমাপ্তিস্থান মুক্তিও লাভ করা যায়। সমস্ত জলরাশি যেরূপ মহাসমুদ্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ জাগতিক সর্ব্ব-প্রকার কল্যাণই (আনন্দই) মুক্তিতে ডুবিয়া যায়। জগতে যত প্রকার সুখ ও সুখসাধন আছে, সে সমস্তই ক্ষয়াতিশয়শালী অর্থাৎ তারতম্য বা ন্যূনাধিকভাবাপন্ন; জগতের লোক তাহা হইতে আপনার অভিমত ভোগসম্পদ্ পাইয়াও পূর্ণ তৃপ্তি লাভ

করে না, করিতেও পারে না। কারণ, যেখানে ভোগের তারতম্য, সেখানে দ্বেষ হিংসাবিজড়িত দুঃখসম্পর্কও অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—

"পরসম্পদুৎকর্ষো হীনসম্পদং পুরুষং দুঃখাকরোতি" ইতি।

অর্থাৎ পরের অধিক সম্পদ্ দেখিলে, তদপেক্ষা ন্যূন সম্পত্তিশালী লোকের হৃদয়ে স্বতই দুঃখ হইয়া থাকে। আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন—

"মনুষ্যত্বাদারভ্য ব্রহ্মান্তেষু দেহবৎসু সুখতারতম্যমনুশ্রূয়তে। ততশ্চ তদ্ধেতোর্ধর্ম্মস্য তারতম্যং গম্যতে। ধর্ম্মতারতম্যাদধিকারিতারতম্যম্। প্রসিদ্ধং চ অর্থিত্ব-সামর্থ্যাদিকৃতমধিকারিতারতম্যম্" ইত্যাদি।

(ব্রহ্মসূত্র শাঙ্কর ভাষ্য ১।১।৪)।

অভিপ্রায় এই যে, জগতে সকল লোকের অধিকার (কর্ম্মানুষ্ঠানের শক্তি) সমান নহে; সুতরাং সকল লোকের কর্ম্মানুষ্ঠানও একরকম হয় না; অনুষ্ঠানের তারতম্যানুসারে কর্ম্মফলেও যথেষ্ট তারতম্য ঘটে; ফলের তারতম্যে ভোগের বৈষম্য—ন্যূনাধিকভাব ঘটিয়া থাকে; এই ন্যূনাধিকভাবই অনাবিল সুখানুভূতির প্রবল প্রতিপক্ষ। এই নিয়ম সকল দেশে সকল কালে ও সকল জীবের পক্ষেই সমান—অব্যভিচারী। কিন্তু মুক্তিতে এ দোষের সম্ভাবনা নাই; কারণ, মুক্তি চিরকালই একরূপ—তারতম্যবিবর্জ্জিত এবং সকলের পক্ষেই সমান; সুতরাং সেখানে কোন প্রকার দুঃখ-সম্বন্ধ থাকিবার কোন কারণই নাই। এই কারণে মুক্তিকে 'নিঃশ্রেয়স' বলা হইয়া থাকে।

উল্লিখিত অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স, উভয়ই ধর্ম্মের ফল। লোকসমূহ নিজ নিজ রুচি, প্রবৃত্তি ও শক্তি অনুসারে যথাবিধি ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা অভ্যুদয়ও লাভ করিতে পারে, অথবা নিঃশ্রেয়সও পাইতে পারে। বিশেষ এই যে, যে সকল লোক ভোগপরায়ণ, কামনার দাস, তাহারা স্বতই ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; সুতরাং তাহাদের কর্ম্ম ঈশ্বর-প্রীতির জন্য না হইয়া আত্মতৃপ্তির জন্য হয়; কাজেই তাহারা স্বকৃত কর্ম্মের ফলেই জন্ম-মরণময় এই সংসারচক্রে নিরন্তর বিবর্ত্তিত হইতে থাকে। কিন্তু যাহারা কামনার দাসত্ব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরমেশ্বরের সেবায় দেহ মন সমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই সকল মহাত্মার অনুষ্ঠিত কর্ম্মে ভোগবাসনার কোনপ্রকার সম্পর্ক থাকে না। নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত সেই সমুদয় কর্ম্ম তাহাদের জন্ম-মরণপ্রবাহের কারণ না হইয়া, বরং চিত্তশুদ্ধি ও পরমেশ্বরের প্রসাদ সমুৎপাদন করত পরম কল্যাণকর মুক্তিমার্গের সম্পূর্ণ সহায় হয়।

ভগবান্ বলিয়াছেন—

"যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্ম-শুদ্ধয়ে।" [গীতা।]

যোগিরা ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্যে (নিষ্কামভাবে) কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বস্তুতই চিত্ত বিশুদ্ধ না হইলে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না; পবিত্রভাবে ধর্ম্মানুশীলন না করিলেও চিত্তের বিশুদ্ধতা জন্মে না; চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানও হয় না; এবং প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে মুক্তিলাভও

জীবের ভাগ্যে সম্ভবপর হয় না; এই কারণেই সূত্রকার গ্রন্থারম্ভের প্রথমেই মুমুক্ষুর পরম সুহৃদ্ ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—

"অথাতো (১) ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ" ॥ ১।১।১ ॥

যেহেতু ধর্ম্মই মুক্তি-সাধন তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিদান, সেই হেতু আমি ধর্ম্মতত্ত্ব বর্ণনা করিব। তাঁহার অন্তর্নিহিত পূর্ব্বোক্ত গূঢ় অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কৌতুকপ্রিয় কোন লোক কণাদকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মং ব্যাখ্যাতুকামস্য ষট্পদার্থোপবর্ণনম্।
সাগরং গন্তুকামস্য হিমবদ্গমনোপমম ॥"

অর্থাৎ সাগর-গমনার্থী লোকের হিমালয়াভিমুখে গমন যেরূপ হাস্যজনক, ধর্ম্মব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত কণাদ মুনির দ্রব্যাদি ষট্পদার্থ বর্ণনার প্রয়াসও ঠিক সেইরূপই উপহাসের বিষয়। বস্তুতঃ কণাদের সম্বন্ধে এরূপ পরিহাসোক্তি যে, কেবল কৌতুকপ্রিয়তারই পরিচায়ক, তাহা নহে, পরন্তু বিষম অনভিজ্ঞতারও

(১) সূত্রস্থ 'অথ' শব্দটী আনন্তর্য্যার্থক; সমবেত শিষ্যগণের জিজ্ঞাসার অনন্তর। 'অতঃ'—এই হেতু; যে হেতু ধর্ম্মই শিষ্যজিজ্ঞাস্য দুঃখনিবৃত্তির বা মুক্তির একমাত্র উপায়, সেই হেতু। অভিপ্রায় এই যে, সমাগত শিষ্যগণ দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তির উপায় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে পর, কণাদ ঋষি ধর্ম্মকেই দুঃখনিবৃত্তির পরম কারণ জানিয়া, সেই ধর্ম্মতত্ত্ব বলিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন।

নিদর্শন। কণাদকে তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণের অনুরোধে বাধ্য হইয়াই যে, ষট্‌পদার্থ-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে, এ কথা প্রথমেই বলা হইয়াছে; সুতরাং সে কথার পুনরুক্তি না করিয়া এখন প্রকৃত বিষয়ে অগ্রসর হওয়া হউক—

[দ্রব্য ও তাহার বিভাগ।]

তত্ত্বজ্ঞানোপযোগী যে ষট্‌পদার্থের উল্লেখ করা হইয়াছে, যে সমুদয় পদার্থের নাম যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম সামান্য (জাতি), সমবায়, বিশেষ ও অভাব। তন্মধ্যে যে পদার্থে গুণ ও ক্রিয়া সমবেত থাকে, অর্থাৎ যাহা কস্মিন্ কালেও গুণ বা ক্রিয়ার সহিত বিযুক্ত হয় না, গুণ ও ক্রিয়া সহযোগে থাকাই যাহার স্বভাব, এবং যাহা সমবায়ী কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট, তাহার নাম দ্রব্য (১)।

কথিত দ্রব্য-পদার্থ নয়ভাগে বিভক্ত,—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। পৃথিবী কি?

— "রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শবতী পৃথিবী" ॥ ২।১।১ ॥

রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শগুণবিশিষ্ট দ্রব্যের নাম পৃথিবী। পৃথিবীর নিজস্ব রূপ কৃষ্ণবর্ণ, রস মধুরাম্লাদিভেদে ষড়্‌বিধ, গন্ধ দুই প্রকার (সদ্‌গন্ধ ও অসদ্‌গন্ধ) এবং স্পর্শ অনুষ্ণাশীত অর্থাৎ উষ্ণও নয়, শীতলও নয়, এরূপ একপ্রকার স্পর্শগুণ। নব্য নৈয়ায়িকগণ এরূপ পরিচয়ে পরিতুষ্ট না হইয়া, তাঁহারা বলেন—

'গন্ধসমবায়ি কারণত্বং—পৃথিবীত্বম্।'

---

(১) "ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্" ॥ ১।১।১৫ সূত্র ॥ দ্রব্যমাত্রই গুণ ও ক্রিয়াবিশিষ্ট ও সমবায়ী কারণ হইবে। ইহাই দ্রব্যের সাধারণ লক্ষণ।

অর্থাৎ নয়প্রকার দ্রব্যের মধ্যে, যে দ্রব্যটী গন্ধের সমবায়ী কারণ, গন্ধ যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে চিরকাল আছে ও থাকিবে; যাহা কখনও গন্ধবিযুক্ত হয় নাই বা হইবে না, তাহার নাম পৃথিবী। গন্ধই পৃথিবীর নিজস্ব গুণ; সুতরাং উহাই পৃথিবীর পরিচায়ক। রূপ রসাদি গুণগুলি অপরাপর ভূত হইতে প্রাপ্ত; সুতরাং সেগুলি পৃথিবীর প্রকৃষ্ট পরিচায়ক নহে। অতএব, যে সমুদয় বস্তুতে গন্ধ থাকা প্রমাণিত হয়, সে সমুদয় বস্তুকে পৃথিবী বা পার্থিব বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই অবিসংবাদিত নিয়ম (১)।

(১) সাংখ্য ও বেদান্ত মতে আকাশাদি পঞ্চভূতেরই উৎপত্তি সমর্থিত হইয়াছে; এবং আকাশাদি ক্রমে পর পর পঞ্চভূতের উৎপত্তিকথাও বর্ণিত আছে। পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে প্রথমে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে আকাশের শব্দ, বায়ুর স্পর্শ, তেজের রূপ, জলের রস ও পৃথিবীর গন্ধ হইতেছে নিজস্ব গুণ। বায়ু প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয় আবার কারণগত ঐ সমুদয় গুণও পাইয়াছে; তদনুসারে সর্ব্ব কনিষ্ঠ পৃথিবীর গুণ পাঁচ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ; জলের গুণ চার—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস; তেজের গুণ তিন—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; বায়ুর গুণ দুই—শব্দ ও স্পর্শ; আকাশের একমাত্র গুণ—শব্দ। সূত্রকার কণাদও সেই অভিপ্রায়েই পৃথিবীর চারিটী গুণের উল্লেখ করিয়াছেন কি না, তাহা নির্ণয় করা কিছু কঠিন। তবে তিনি যে যুক্তিতে পৃথিবীর চারিটী মাত্র গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই যুক্তিতেই শব্দ-গুণেরও উল্লেখ করা উচিত ছিল; অন্ততঃ তাহা ধরিয়া লইতে হইবে।

তদনুসারে পাষাণ (১) বৃক্ষ লতা প্রভৃতি গন্ধযুক্ত পদার্থসমূহ পার্থিব পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইবে। সুবর্ণেও গন্ধ আছে; সুতরাং উহা তৈজস হইলেও পার্থিব সম্বন্ধ রহিত নহে। জলে ও বায়ুতে যে, গন্ধ পাওয়া যায়, তাহা জল ও বায়ুর স্বাভাবিক গুণ নহে; উহা পৃথিবী বা পার্থিব পদার্থের সংসর্গজনিত আগন্তুক (২)। এই কারণেই অতি দুর্গন্ধ জলকেও দ্রব্য ও যন্ত্রবিশেষ দ্বারা পরিষ্কৃত করিলে, তাহাতে আর কোন গন্ধই পাওয়া যায় না। বায়ুর অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। ফল কথা, কণাদের মতে গন্ধই পৃথিবী ও পার্থিব পদার্থের একমাত্র পরিচায়ক বিশেষ গুণ;

---

(১) আপাততঃ যদিও পাষাণে কোন প্রকার গন্ধের উপলব্ধি হয় না সত্য, তথাপি পাষাণকে ঘর্ষণ করিলে কিংবা ভস্মে পরিণত করিলে নিশ্চয়ই গন্ধের উপলব্ধি হয়। প্রকৃতপক্ষে পাষাণে মূলতঃ গন্ধ না থাকিলে কখনই ঘর্ষণ করিলে বা পাষাণ-ভস্মে গন্ধের উপলব্ধি হইতে পারিত না। যখন ঐ দুই অবস্থায় গন্ধ পাওয়া যায়, তখন নিশ্চয়ই পাষাণে গন্ধ আছে স্বীকার করিতে হইবে। গন্ধ থাকায় উহাও পৃথিবীমধ্যে পরিগণিত না হইবে কেন।

(২) সাংখ্যাচার্যেরা বলিয়াছেন—

"উপলভ্যাপ্সু চেদ্গন্ধং কেচিদ্ ব্রূয়ুরনৈপুণাঃ।
পৃথিব্যামেব তং বিদ্যাদাপো বায়ুং চ সংশ্রিতম্॥"

অর্থাৎ বিচারবিমুখ কোন লোক যদি জলে ও বায়ুতে গন্ধ পাইয়া ঐ গন্ধ জল ও বায়ুর স্বাভাবিক গুণ বলিয়া মনে করে, তাহা ভুল; বুঝিতে হইবে, ঐ গন্ধ পৃথিবীরই গুণ; কেবল সংস্পর্শ বশতঃ জল ও বায়ুতে প্রতীত হইতেছে মাত্র।

আর রূপ, রস ও স্পর্শ, এই তিনটী উহার সাধারণ গুণমাত্র ; কারণ, ঐ গুণত্রয় যথাসম্ভব অপরাপর ভূতেও বিদ্যমান আছে। অতএব পূর্ব্বকথিত 'গন্ধসমবায়িকারণত্বং পৃথিবীত্বম্' ইহাই পৃথিবীর পরিচায়ক চূড়ান্ত লক্ষণ বুঝিতে হইবে। দ্রব্যের দ্বিতীয় বিভাগ— জল। জলের লক্ষণ—

"রূপ-রস-স্পর্শবত্য আপোঽদ্রবাঃ স্নিগ্ধাঃ ॥" ২।১।২ ॥

অর্থাৎ জলের স্বাভাবিক রূপ (বর্ণ) শুক্ল, রস—মধুর, ও স্পর্শ—শীতল। দ্রব্যান্তরে সংযোগ বশতঃ জলেও সাময়িকভাবে বর্ণান্তর, রসান্তর ও উষ্ণস্পর্শাদি সংঘটিত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু দ্রব্যান্তরের সাহায্যে পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতে পারিলে, সেই জলই আবার স্বচ্ছ শুভ্র, মধুর ও শীতল স্পর্শে প্রকটিত হয়।

উল্লিখিত সূত্র মধ্যে যে, রূপ, রস ও স্পর্শগুণের উল্লেখ আছে, উহা জলের পরিচায়ক মাত্র, প্রকৃত লক্ষণ নহে ; কারণ, ঐ সমুদয় গুণ জল ভিন্ন অন্য পদার্থেও (পৃথিব্যাদিতেও) বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই ঐ সমুদয় গুণ কখনই জলের প্রকৃত লক্ষণ বা স্বরূপ-প্রকাশক হইতে পারে না। উহার প্রকৃত লক্ষণ হইতেছে—'স্নিগ্ধত্ব'। নব্য নৈয়ায়িকগণও বলিয়া থাকেন—'সমবায়েন স্নেহবত্ত্বং জলত্বম্'। অর্থাৎ স্নেহনামক গুণটী যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে, তাহার নাম জল। শুষ্ক শক্তু (ছাতু) প্রভৃতি পদার্থকে যাহা দ্বারা পিণ্ডাকারে পরিণত করা যায়, তাহার নাম স্নেহ। জলই উক্ত স্নেহ-

গুণের একমাত্র আশ্রয়। ঘৃত তৈল প্রভৃতিতে যে, স্নেহ-গুণের সত্তা প্রতীতি হয়, তাহা উহাদের নিজস্ব গুণ নহে; পরন্তু উহাদের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে যে জলীয় অংশ বিদ্যমান আছে, ঐ স্নেহ-গুণ সেই জলীয় ভাগেরই স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম; কেবল একত্র সংস্থিতি নিবন্ধন ঐরূপ ভ্রান্তি হয় মাত্র (১)। অতঃপর তৃতীয় দ্রব্য তেজের বিষয় আলোচনা করা যাউক। তেজের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া কণাদ বলিয়াছেন—

তেজো রূপ-স্পর্শবৎ।” ২।১।৩।

---

(১) উপরে যে জলের লক্ষণ বলা হইল, উহা সূত্রানুগত লক্ষণ মাত্র। নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ ইহা ছাড়া আরও অনেক প্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পাঠকবর্গের অনুপযোগী ও অরুচিকর হইবে মনে করিয়া এখানে আর সে সকলের উল্লেখ করা হইল না।

ন্যায়মতে জল একটী মৌলিক পদার্থ—যৌগিক পদার্থ নহে। ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যে, জলকে যৌগিক পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, মনে হয়, তাহাদ্বারাও উক্ত সিদ্ধান্তের ক্ষতি হয় না; কেন না, জল দুই প্রকার—নিত্য ও অনিত্য। তন্মধ্যে অনিত্য জলই অন্য পদার্থের সংযোগজ হইতে পারে, নিত্য জল নহে। নিত্য জল পরমাণুস্বরূপ, অতি সূক্ষ্ম, ব্যবহারের অনুপযোগী; সেই নিত্য জলীয় পরমাণুর সংযোগে স্থূল জলের অভিব্যক্তি হওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়; এবং ঐ যে, জলীয় উপাদান অতি সূক্ষ্ম পরমাণু তাহাই বৈজ্ঞানিকের অভিমত উপাদান—দ্বিবিধ বাষ্প। যদিও ঐ দুই প্রকার বাষ্পে আপাত-দৃষ্টিতে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায় সত্য, তথাপি এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, যাহাতে যাহা নাই, তাহা হইতে কখনও তাহার উৎপত্তি হয় না, ও হইতে পারে না; সুতরাং ঐ দ্বিবিধ বাষ্পই জলোপাদান নিত্য পরমাণু-সংসৃষ্ট, নচেৎ উহা হইতে জল আসিতেই পারে না।

তেজঃ কাহাকে বলে? না, যে দ্রব্য রূপ ও স্পর্শ গুণবান্, তাহাই তেজঃপদার্থ। তেজের রূপ (বর্ণ) শুক্ল-ভাস্বর, অর্থাৎ ঈষৎ লোহিত এবং উহার স্পর্শ উষ্ণ। পৃথিবী এবং জলেও রূপ ও স্পর্শ গুণ আছে সত্য, কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ উষ্ণতা ও লোহিত রূপ তেজঃ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থেই নাই। জল ও পৃথিব্যাদিতেও উক্ত গুণদ্বয় কারণান্তর-সংযোগে সাময়িকভাবে আবির্ভূত হয় বটে, কিন্তু উহা স্বাভাবিক নহে। উক্ত গুণদ্বয়ের মধ্যে একমাত্র রূপই তেজের নিজস্ব গুণ, অন্য গুণটী (স্পর্শ) স্বকারণ হইতে প্রাপ্ত—আগন্তুক। এই নিয়মে তেজেও আকাশীয় শব্দগুণের অনুবৃত্তি থাকা অবশ্য স্বীকার্য্য; কিন্তু তেজে উহা অভিব্যক্ত—সাধারণের অনুভবযোগ্য নয় বলিয়া কণাদ স্বীয় সূত্রমধ্যে উহার উল্লেখ করেন নাই (১); বস্তুতঃ তেজেতে

(১) তেজের গুণ, রূপ ও স্পর্শ দুই প্রকার—উদ্ভূত (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) ও অনুদ্ভূত (ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য—অনভিব্যক্ত)। কোথাও কেবল রূপমাত্র উদ্ভূত, আর স্পর্শ অনুদ্ভূত, কোথাও বা কেবল স্পর্শই উদ্ভূত, আর রূপ অনুদ্ভূত। কোথাও বা ঐ উভয় গুণই সমানভাবে উদ্ভূত বা অনুদ্ভূত হইয়া থাকে। সুতরাং গুণানুসারে তেজঃ চারি অবস্থায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই জন্য সুবর্ণে (সুবর্ণ তেজঃ-পদার্থ মধ্যে পরিগণিত,) কেবল শুক্লভাস্বর রূপটী মাত্র উদ্ভূত, কিন্তু উষ্ণতা গুণ অনুদ্ভূত; তপ্ত লৌহেও তেজঃ (অগ্নি) আছে, কিন্তু সেখানে রূপটী মাত্র অনুদ্ভূত থাকিয়া স্পর্শমাত্র উদ্ভূত হয়; আবার চক্ষুঃও তৈজস পদার্থ; সেখানে তেজের রূপ ও স্পর্শ দুই-ই অনুদ্ভূত অবস্থায় থাকে। অগ্নি প্রভৃতিতে আবার ঐ উভয় গুণই তুল্যভাবে বিদ্যমান থাকিয়া কার্য্য করিয়া থাকে।

উহারও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। বিদ্যুৎ, অগ্নি, সুবর্ণ ও চন্দ্র-সূর্য্যের কিরণ, এ সমুদয় পদার্থ উক্ত তেজেরই অন্তর্ভূত। তেজের পর বায়ুর লক্ষণ বলিতে যাইয়া সূত্রকার বলিয়াছেন, বায়ু কি ?—না,—

"স্পর্শবান্ বায়ুঃ।" ২।১।৪ ॥

রূপহীন অথচ স্পর্শগুণযুক্ত দ্রব্যের নাম বায়ু। বায়ুতে স্পর্শগুণ আছে সত্য, কিন্তু সে স্পর্শ উষ্ণ বা শীতল নহে—অনুষ্ণাশীত; সুতরাং উহাকে এক বিজাতীয় স্পর্শ বলিতে হয়। পৃথিব্যাদি দ্রব্যত্রয়েও স্পর্শগুণ আছে সত্য, কিন্তু তাহা শীত বা উষ্ণ স্পর্শ, অনুষ্ণাশীত নহে; অধিকন্তু সে সকল দ্রব্যে স্পর্শের সহচরভাবে কোন একটী রূপও বিদ্যমান থাকে; এই কারণে পৃথিবী, জল ও তেজে বায়ুর লক্ষণ অতিব্যাপ্ত হইল না, এবং স্পর্শ-সম্বন্ধ না থাকায় আকাশেও সে লক্ষণ প্রশক্ত হইল না। কোন প্রকার রূপ (উদ্ভূত) না থাকায় বায়ু কাহারো চক্ষুগ্রাহ্য হয় না; কেবল ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা উহার স্পর্শানুভব হয় মাত্র। এই স্পর্শের দ্বারাই বায়ুর স্বরূপ ও অবস্থাবিশেষ অনুমান করিয়া লইতে হয় (১)।

উপরিলিখিত চারিটী দ্রব্যে যে সমুদয় গুণের সদ্ভাব কথিত

---

(১) বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—"জ্ঞেয়ঃ স্পর্শাদিলিঙ্গকঃ।"

অর্থাৎ স্পর্শ প্রভৃতি হেতুদ্বারা বায়ুকে জানিতে হয়; প্রত্যক্ষ দ্বারা নহে; ইত্যাদি।

হইল, পঞ্চম দ্রব্য আকাশে তাহার কোন একটী গুণও নাই (১)। আকাশের একমাত্র বিশেষ গুণ হইতেছে শব্দ। সেই শব্দ-গুণের সাহায্যেই আকাশের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। এই জন্য শব্দই আকাশের বিশেষ লক্ষণ বা পরিচায়ক। কেন না,—

"শব্দঃ স্পর্শবতামগুণঃ ॥" ২।১।২৫ ॥

অর্থাৎ যে সকল দ্রব্যে স্পর্শগুণ আছে, যুক্তিদ্বারা জানা যায় যে, শব্দ কখনই সে সকলের গুণ নহে; সুতরাং স্বীকার করিতে হয়—

"পরিশেষাৎ লিঙ্গমাকাশস্য ॥" ২।১।২৭ ॥

শব্দমাত্রই আকাশাশ্রিত এবং শব্দই আকাশের অনুমাপক হেতু (২); এইজন্য পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণ আকাশের লক্ষণ বলেন

---

(১) গোতম বলিয়াছেন—"ত আকাশে ন বিদ্যন্তে ॥" ২।১।৫ ॥ অর্থাৎ পৃথিবীগত গুণসমূহ, আকাশে বিদ্যমান নাই।

(২) এখানে দেখিতে হইবে যে, শব্দ একটী গুণ; গুণ কখনই কোন দ্রব্য আশ্রয় না করিয়া স্বাধীনভাবে থাকিতে পারে না; অথচ দেখিতে পাওয়া যায়, স্পর্শযোগ্য যত পদার্থ আছে,—পৃথিবী হইতে বায়ু পর্য্যন্ত কোন দ্রব্যই শব্দের আশ্রয় নহে। বায়ু শব্দবহ সত্য, কিন্তু শব্দের আশ্রয় বা সমবায়ী কারণ নহে। শব্দ যদি স্পর্শের ন্যায় বায়ুরও গুণ হইত, তাহা হইলে, স্পর্শের ন্যায় শব্দও চিরকাল বায়ুর সহচর হইত। বায়ু যেমন স্পর্শহীন হইয়া থাকে না,—বায়ু যত অল্পই হউক না কেন, তদুপযুক্ত স্পর্শগুণ তাহাতে থাকেই; তেমনি শব্দেরও তাহাতে থাকা উচিত হইত; অথচ তাহা হয় না; এই কারণে বায়ুকে শব্দের আশ্রয় বলা যায় না।

—"শব্দ-সমবায়িকারণম্ আকাশম্," যাহা শব্দের সমবায়ী কারণ, অর্থাৎ যাহা হইতে শব্দের সমবায় সম্বন্ধে উৎপত্তি হয়, তাহার নাম আকাশ। এই আকাশ এক অখণ্ড নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী দ্রব্যপদার্থ।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, বায়ু ও আকাশ উভয়ই লোক-

এই অভিপ্রায়ে সূত্রকার বলিলেন—"শব্দঃ স্পর্শবতামগুণঃ" (২।১।২৫); অর্থাৎ যে সকল পদার্থে স্পর্শগুণ বিদ্যমান আছে, শব্দ সে সকলের গুণ নহে। বায়ুবিহীন অবরুদ্ধ কাঁচপত্রের মধ্যে ঘণ্টা বাজাইলেও নিকটস্থ লোকেরা যে, শব্দ শুনিতে পায় না, তাহার কারণ—সেখানে শব্দবহ বায়ুর অভাব। বায়ু তখন ঐ শব্দ বহন করিয়া শ্রোতার কর্ণমূলে আনয়ন করে না; এই জন্য নিকটস্থ লোকেরাও শব্দ শুনিতে পায় না, কিন্তু শব্দের অভাব নিবন্ধন নহে। সেখানে আকাশ যখন আছে, তখন নিশ্চয়ই সেখানে শব্দেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই শব্দই আকাশের বিশেষ গুণ এবং তাহাদ্বারাই আকাশের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। বৌদ্ধ সম্প্রদায় বলেন—আকাশ কোনও বস্তু নহে; উহা অবস্তু—আবরণের অভাব মাত্র; অর্থাৎ কোন প্রকার আবরণ না থাকারই নাম আকাশ। বস্তুতঃ তাহাদের এ সিদ্ধান্ত সমীচীন মনে হয় না। কারণ, অভাবের কোনও অংশ বা বিভাগ নাই; উহা এক ও অখণ্ড। এখন বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, কোন প্রকার আবরণ না থাকার (আবরণ সামান্যাভাবের) নামই যদি আকাশ হয়, তবে প্রচলিত আকাশে যখন একটা মাত্র পক্ষীও উড়িতে থাকে, তখনই আবরণের অভাব নষ্ট হইয়া যায়। কারণ, সেই পক্ষীদ্বারাই তখন উর্দ্ধে আবরণ ঘটিয়াছে, কাজেই আবরণাভাবরূপী অখণ্ড আকাশেরও বিলোপ হইয়াছে; সুতরাং প্রচলিত আকাশে আর দ্বিতীয় পক্ষী উড়িবার অবকাশ থাকিতে পারে না। অথচ সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে একই সময়ে বহু পক্ষী আকাশে উড়িয়া থাকে; সুতরাং বৌদ্ধমত সুসঙ্গত মনে করিতে পারা যায় না। এ সম্বন্ধে আরও অনেক প্রকার তর্ক বিতর্ক আছে; বাহুল্য ও নীরস বোধে এখানে আর সে সকলের আলোচনা করা হইল না।

চক্ষুর অগোচর—অপ্রত্যক্ষ। নানা কারণে ইহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও, ইহাদের দ্রব্যত্ব স্বীকারে যুক্তি কি ? এবং আকাশের নিত্যত্ব পক্ষেরই বা সাধক কি ? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

"দ্রব্যত্ব-নিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে ॥" ২।১।২৮ ॥

গুণ কখনও দ্রব্য ছাড়িয়া থাকিতে পারে না ; এবং দ্রব্যও গুণ ছাড়িয়া থাকিতে পারে না ; গুণ ও দ্রব্যের পরস্পর অনুচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এই কারণে কেহ কেহ গুণসমষ্টিকেই দ্রব্যনামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ফলতঃ গুণই দ্রব্যের প্রধান পরিচায়ক। এখন দেখিতে হইবে, স্পর্শ ও শব্দ, এই উভয়ই যখন গুণ ; এবং ঐ উভয় গুণই যখন যথাক্রমে বায়ু ও আকাশে আশ্রিত, তখন ঐ উভয় গুণের আশ্রয় বায়ু ও আকাশের দ্রব্যত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কাজেই বায়ু ও আকাশকে দ্রব্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হয়।

তাহার পর, আমরা সকলেই অনুভবগোচর সকল দ্রব্যেরই ন্যূনাধিক্য অনুভব করিয়া থাকি ; অবয়বের অল্পাধিক্য না হইলে কোন বস্তুরই অল্পাধিক্য হয় না ও হইতে পারে না ; সুতরাং বলিতে হইবে, বায়ুর যে, অল্পাধিক্য, তাহা তাহার অবয়ব-সংযোগের অল্পাধিক্যেরই ফল। ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, বায়ু নিরবয়ব পদার্থ নহে সাবয়ব ; এবং তাহারও উৎপাদক অবয়ব (দ্রব্য) আছে। সাবয়ব পদার্থমাত্রই অনিত্য ; সুতরাং যদিও বায়বীয় পরমাণু (যাহা স্থূল বায়ুর উৎপাদক,) নিত্য হউক, তথাপি আমাদের অনুভবগম্য বায়ুকে নিত্য বলিতে পারা যায় না। অবশ্য, আকাশের

সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। কারণ, আকাশের অল্পাধিক্য কখনও দেখা যায় না; কাজেই তাহার অংশ বা অবয়বের অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না; এবং নিরবয়ব পদার্থের উৎপত্তি বা বিনাশকল্পনাও সম্ভব হয় না; কাজেই আকাশকে বায়ুর ন্যায় অনিত্যও বলিতে পারা যায় না; এই জন্যই আকাশের নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয় (১)।

অতঃপর কালের কথা। বৈশেষিক মতে কালও একটী দ্রব্য পদার্থ, এবং আকাশের ন্যায় অপ্রত্যক্ষ (২)। কিন্তু অপ্রত্যক্ষ হইলেও উহার অস্তিত্ব অনুমানসিদ্ধ ও লোকব্যবহার-সম্মত। স্বয়ং সূত্রকার এইরূপেই কালের পরিচয় দিয়াছেন—

"অপরস্মিন্নপরং যুগপৎ, চিরং, ক্ষিপ্রমিতি কাল-লিঙ্গানি ॥ ২।২।৬ ॥

---

(১) সূত্রকার নিত্যের লক্ষণ বলিয়াছেন এইরূপ—
"সদকারণবৎ নিত্যম্ ॥" ৪।১।১ ॥

যে পদার্থ সৎ (অভাব নহে,) ও কারণবিশিষ্ট (সকারণক) নয়, তাহাই নিত্য। অভিপ্রায় এই যে, অবয়বসমষ্টি দ্বারা এক একটী অবয়বী (জন্য পদার্থ) নির্ম্মিত হইয়া থাকে; এইজন্য অবয়বই প্রধানতঃ জন্য দ্রব্যমাত্রের কারণ, এবং সেই কারণভূত অবয়ব দ্রব্যগুলি স্বকার্য্য অবয়বীর অঙ্গে লাগিয়া থাকে। যাহা নিজে সৎ—অভাব নয়, অথচ ঐরূপ কারণবান্ নহে—অকারণবৎ—নিরবয়ব, তাহাই নিত্য পদার্থ। আকাশও সৎপদার্থ, অথচ অবয়বযুক্ত নহে, সুতরাং নিত্য মধ্যে পরিগণিত।

(২) কোন কোন মীমাংসকের মতে কালও ষড়িন্দ্রিয়-গ্রাহ্য; সুতরাং অপ্রত্যক্ষ নহে। ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্রও "নীরূপস্যাপি কালস্য ইন্দ্রিয়-বেদ্যত্বাভ্যুপগমেন" ইত্যাদি বাক্যে কালের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষণ-যোগে অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় কালেরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; সুতরাং কাল অপ্রত্যক্ষ নহে।

যাহাদ্বারা পরত্ব ও অপরত্ব বা জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব-ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, এবং বস্তুর নব-পুরাতনভাব বুঝিতে পারা যায়, তাহার নাম কাল। জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব, এবং নূতনত্ব ও পুরাণত্ব, এ সমস্ত ব্যবহার আপেক্ষিক। যাহা একের অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ বা পুরাতন, তাহাই আবার অন্যের অপেক্ষায় কনিষ্ঠ বা নূতন বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই যে, আপেক্ষিক জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাদিভাব, ইহার মূলে একমাত্র সূর্য্যকিরণ-সংস্পর্শের ন্যূনাধিক্য ছাড়া আর কারণ নাই। যাহার সঙ্গে সূর্য্যকিরণের কিংবা সূর্য্যদেবের উদয়াস্তের অধিক পরিমাণে সম্বন্ধ ঘটিয়াছে তাহাকেই জ্যেষ্ঠ, আর যাহার সঙ্গে অল্প পরিমাণে সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, তাহাকেই কনিষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। সূর্য্যদেবই মহাকালের ঘটীযন্ত্র। তাঁহারই ক্রিয়া-সাহায্যে লোকে ক্ষণ, দণ্ড, দিন, মাস, ঋতু, বৎসরাদি অবধারণ করিয়া লয়; এবং তদনুসারেই জ্যেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্বাদি ব্যবহার পরিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কাজেই ঐ জাতীয় ব্যবহারকে কালের অনুমাপক বলা যাইতে পারে। তা'ছাড়া, যুগপৎ (এক সঙ্গে উৎপন্ন হইল), চির (বিলম্ব, চির-জীবী), ও ক্ষিপ্র (শীঘ্রগামী) ইত্যাদি প্রতীতিও আলোচ্য কালেরই সদ্ভাব সূচনা করিয়া থাকে।

কাল স্বরূপতঃ এক অখণ্ড নিত্য পদার্থ; ক্রিয়াদ্বারা তাহার বিভাগ কল্পিত হয় এবং ঐ বিভাগই লোকব্যবহারের সহায়ক। ঐ জাতীয় ক্রিয়ার আশ্রয় বলিয়াই কালকে একটী স্বতন্ত্র দ্রব্য পদার্থ বলিয়া পরিগণনা করা হইয়াছে। কাল এক

অখণ্ড হইলেও বিভিন্ন ক্রিয়া সহযোগে তাহার দিন মাসাদি খণ্ড বা বিভাগ কল্পিত হইয়া থাকে (১)।

কালের পরই দিকের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। দিকের অস্তিত্বে প্রমাণ কি?

"ইত ইদমিতি যতস্তদ্দিশ্যং লিঙ্গম্॥ ২।২।১০॥

অর্থাৎ 'এখান হইতে উহা দূর' এইরূপ ব্যবহার যাহা হইতে নিষ্পন্ন হয়, তাহার নাম দিক্। অভিপ্রায় এই যে, পরত্ব ও অপরত্ব দুই প্রকার; এক কালিক অপর দৈশিক।" জ্যেষ্ঠত্ব. কনিষ্ঠত্বকে বলে কালিক, আর দূরত্ব ও নিকটত্বকে বলে দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব। দিক্ই এই দূরত্ব ও নিকটত্ব ব্যবহারের মূল; সুতরাং ঐরূপ ব্যবহার হইতেই দিকের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

কালের ন্যায় দিক্ও এক অখণ্ড পদার্থ; কেবল বিভিন্ন উপাধিসংযোগে উহার ভেদ কল্পিত হয়। উদীয়মান সূর্য্য-সংযুক্ত দেশকে সম্মুখে করিয়া পূর্ব্বদিক্, তাহার বিপরীত-ভাগ লইয়া পশ্চিম দিক্, এবং ঐ সূর্য্যকে সম্মুখস্থ রাখিলে নিজের দক্ষিণভাগ হয় দক্ষিণ দিক্, আর বামভাগ হয়

---

(১) বিভিন্ন বস্তুর ক্রিয়া দ্বারাই কালের বিভাগাদি প্রতীত হয়; এই জন্যই প্রতীয়মান কালকে ক্রিয়োপাধিক কহে। ক্রিয়াই কাল ব্যবহারের প্রবর্ত্তক। কেহ কেহ বলেন—"ক্রিয়ৈব কালঃ" অর্থাৎ ক্রিয়ারই নাম কাল, তদতিরিক্ত কাল বলিয়া কোন দ্রব্য নাই, সাধারণতঃ অখণ্ড কালের কোন প্রতীতিও দেখা যায় না। সে যাহা হউক, কণাদের মতে কাল একটী স্বতন্ত্র নিত্য দ্রব্য।

উত্তর দিক্। এইরূপ উপাধির বিভাগানুসারে দিগ্‌বিভাগ পরিকল্পিত হইয়া থাকে (১)।

নির্দ্দেশের ক্রমানুসারে দিকের পরই আত্মার স্বরূপ-পরিচয়াদি পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক হইতেছে; কিন্তু আবশ্যক হইলেও, আত্ম-নিরূপণ বড়ই জটিল ও বিঘ্নসংকুল। প্রথমতঃ আত্মার অস্তিত্ব আপামর সাধারণ সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ হইলেও সকলেই তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে অনিশ্চিত বোধ পোষণ করিয়া থাকে। 'আমি, আমার' ইত্যাদি প্রতীতি স্বতঃসিদ্ধ হইলেও, সেই প্রতীতির বিষয়ীভূত বস্তুটী যে, কি, বা কেমন, প্রায় সকলেই তাহা জানেও না, জানিবার চেষ্টাও করে না; কাজেই লোকসিদ্ধ প্রতীতি ঐ জটিলতার অবসান করিতে পারে না, বরং দুর্ব্বিজ্ঞেয়তা আরও বৃদ্ধি করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ অনুভূয়মান শরীরাদি যেরূপ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ নিঃসন্দিগ্ধ বস্তু, আত্মা সেরূপ নহে; সুধীর বুদ্ধিসম্পন্ন লোকও সহজে উহার স্বরূপ আপনার অনুভবে—অনুভবে দূরে থাকুক, ধারণায়ও—আনিতে পারে না; প্রায় সকলেই যেন দিগ্‌ভ্রান্ত লোকের ন্যায় অপথে ঘুরিয়া বেড়ায়।

---

(১) বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—

"দূরান্তিকাদিধীহেতুরেকা নিত্যা দিগুচ্যতে।
উপাধিভেদাদেকাপি প্রাচ্যাদিব্যপদেশভাক্॥"।

দিক্‌ই দূরত্ব নিকটত্ব প্রতীতির হেতু, এবং নিত্য ও এক। সেই দিক্‌ই বিশেষ বিশেষ উপাধিযোগে প্রাচী, প্রতীচী, দক্ষিণ ও উত্তর প্রভৃতি ব্যবহার নির্ব্বাহক হয়।

তৃতীয়তঃ যাঁহারা আমাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশক, হিতাহিত পথের প্রদর্শক, এবং তত্ত্ব-বিজ্ঞানের পরম সহায় ঋষি; দুঃখের বিষয়, তাঁহারাও এবিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই; সকলেই যেন বিভিন্ন মতস্থাপনে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা পোষণ করিয়াছেন। কেহ কেহ দেহাদির অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছেন; কেহ কেহ আবার অতিরিক্ত অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়াও তাহার স্বরূপ, ও গুণাদি সম্বন্ধে অত্যন্ত বিরুদ্ধ মত সমর্থন করিয়াছেন। এই সকল কারণেই আত্মনিরূপণ সর্ব্বাপেক্ষা জটিলভাব ধারণ করিয়াছে। এইজন্য সূত্রকার কণাদ ঋষি প্রথমেই আত্মার লক্ষণাদি আলোচনা না করিয়া, তাহার অস্তিত্বসাধক প্রমাণের মাত্র উপন্যাস করিয়াছেন—

"প্রসিদ্ধা ইন্দ্রিয়ার্থাঃ॥" ৩।১।১ ॥

এখানে লোকপ্রসিদ্ধ পদার্থের সাহায্যে অপ্রত্যক্ষ আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করা হইতেছে। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ রূপাদি বিষয় যে বিদ্যমান আছে, তদ্বিষয়ে কাহারো সংশয় বা বিপ্রতিপত্তি নাই; উহারা সর্ব্বসম্মত লোকপ্রসিদ্ধ বস্তু। লোকপ্রসিদ্ধ এই ইন্দ্রিয় ও রূপাদি-বিষয়ক জ্ঞানই তদতিরিক্ত পদার্থের—আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া দিতেছে। সূত্রকার বলিতেছেন—

"ইন্দ্রিয়ার্থ-সিদ্ধিরিন্দ্রিয়ার্থেভ্যোঽর্থান্তরস্য হেতুঃ॥" ৩।১।২ ॥

অভিপ্রায় এই যে, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপরসাদি বিষয়ে, যে জ্ঞান হয়, তাহা গুণপদার্থ; গুণমাত্রই

দ্রব্যাশ্রিত—কোন একটী দ্রব্যকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না; সুতরাং রূপরসাদি বিষয়ক জ্ঞানও নিশ্চয়ই কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে। সেই জ্ঞান, যে দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাই আত্মা। এইজন্য নৈয়ায়িকগণ বলিয়া থাকেন—"জ্ঞানাশ্রয়ত্বং আত্মত্বম্"। অর্থাৎ যে দ্রব্য জ্ঞানের আশ্রয় বা সমবায়ী কারণ, তাহার নাম আত্মা।

উক্ত জ্ঞান দৃশ্যমান স্থূল দেহের গুণ হইতে পারে না; তাহার কারণ—"কারণাজ্ঞানাৎ" (৩।১।৪), স্থূল দেহের উপাদান-কারণ পৃথিব্যাদি পদার্থে কিংবা দেহাবয়বে জ্ঞানসত্তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে কারণে, যে গুণের অত্যন্ত অভাব থাকে, তৎকার্য্যে (দেহাদিতে) সে গুণের উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি হইতে পারে না; ইহাই অব্যভিচারী নিয়ম; সুতরাং দেহাবয়বাদি কারণের মধ্যে জ্ঞান না থাকায় তৎকার্য্য দেহেও জ্ঞানের সদ্ভাব অনুমান করা যাইতে পারে না। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কেও ঐ জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত বিভিন্ন বিষয়ে একের কর্ত্তৃত্ব (জ্ঞাতৃত্ব) প্রতীত হইত না। মনে করুন, চক্ষুঃ এক বস্তুর রূপ দর্শন করিল, পরে ত্বগিন্দ্রিয় তাহা স্পর্শ করিল, এবং রসনাও তাহার রস আস্বাদন করিল। এই যে, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপ রসাদি বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান হইল, সেই জ্ঞান, জ্ঞানের বিষয় ও জ্ঞানসাধন ইন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, অনুভব কালে, এই রূপই অনুভব হয় যে, 'একই আমি রূপ রসাদি বিষয়গুলি

অনুভব করিয়াছি'; কিন্তু ইন্দ্রিয়ই জ্ঞানের আশ্রয় হইলে অনুভব হইত—'আমার চক্ষুঃ রূপ দেখিয়াছে, জিহ্বা রস আস্বাদন করিয়াছে এবং ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শ বোধ'করিয়াছে' ইত্যাদি। দুঃখের বিষয়; সেরূপ বোধ কাহারও হয় না। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে,—

"আত্মেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদ্ যন্নিষ্পদ্যতে, তদন্যৎ ॥" ৩।১।১৭ ॥

অর্থাৎ আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধ বশতঃ যাহা নিষ্পন্ন হয়, তাহাই জ্ঞান, এবং সেই জ্ঞান কখনও দেহ বা ইন্দ্রিয়াশ্রিত হইতে পারে না; পক্ষান্তরে, সেই জ্ঞানই আপনার আশ্রয়ভূত আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করিয়া দেয় (১); এইজন্য 'জ্ঞানাশ্রয়ত্বই' আত্মার সম্পূর্ণ লক্ষণ বা পরিচায়ক বুঝিতে হইবে। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি গুণ ও ক্রিয়া শরীরমধ্যে দৃষ্ট হয়, যাহাদের দ্বারা দেহমধ্যগত ইন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত চেতন আত্মার সদ্ভাব অনুমিত হয়। সে সকল গুণ ও ক্রিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

"প্রাণাপান-নিমেষোন্মেষ-জীবন-মনোগতীন্দ্রিয়ান্তরবিকারাঃ
সুখ-দুঃখেচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্নাশ্চাত্মনো লিঙ্গানি ॥" ১।২।৪ ॥

অর্থাৎ প্রাণ, অপান, চক্ষুর নিমেষ ও উন্মেষ, জীবন, মনের গতি (ক্রিয়া), ইন্দ্রিয়ান্তরবিকার, এবং আত্মগত সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন, ইহারা আত্মার অস্তিত্বানুমাপক। এখানে

---

(১) জ্ঞানোৎপত্তির সাধারণ নিয়ম এই যে "আত্মা মনসা সংযুজ্যতে, মনশ্চেন্দ্রিয়েণ, ইন্দ্রিয়াণ্যর্থৈঃ", প্রথমতঃ আত্মার সহিত মনের সংযোগ হয়, ক্রমে মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের, ও ইন্দ্রিয়ের সহিত রূপাদি বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটে, পরে সন্নিহিত রূপাদি বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রাণ অর্থ শরীরমধ্যস্থ ঊর্দ্ধগামী বায়ু, আর অপান অর্থ অধোগামী বায়ু। নিমেষ ও উন্মেষ অর্থ—অক্ষিপত্রদ্বয়ের উন্মীলন ও নিমীলন (মুদ্রণ), জীবন অর্থ শরীররক্ষার অনুকূল দৈহিক বায়ু-সম্বন্ধ (বাঁচিয়া থাকা); মনোগতি অর্থ—মনের এক প্রকার ক্রিয়া—যাহা দ্বারা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ নিষ্পন্ন হয়। ইন্দ্রিয়ান্তরবিকার অর্থ—এক ইন্দ্রিয়ের কার্য্য দ্বারা অপর ইন্দ্রিয়ের কার্য্যোৎপত্তি; যেমন উৎকৃষ্ট চাটনী প্রভৃতি সুস্বাদু বস্তুদর্শনে জিহ্বায় রসসঞ্চার হওয়া প্রভৃতি।

এখানে বুঝিতে হইবে যে, অচেতন প্রাণবায়ুর যে, প্রাণাপান-রূপে নিয়মিত ভাবে ঊর্দ্ধাধোগমন, তাহা নিশ্চয়ই কোন চেতনের সাহায্যে হয়; এইরূপ চক্ষুর উন্মেষ, নিমেষ, জীবনধারণ, মনের গতি ও ইন্দ্রিয়ান্তর-বিক্ষোভ প্রভৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ কার্য্যগুলি কখনই একটী চেতনের সাহায্য ব্যতীত হয় না, বা হইতে পারে না; যে চেতনের সাহায্যে ঐ সকল কার্য্য যথানিয়মে সংঘটিত হয়, তাহারই নাম আত্মা। এই সমুদয় বৈচিত্র্যময় ব্যপার সন্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষ হইয়া কেনোপনিষদ্ জিজ্ঞাসার অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন—

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ, কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি, চক্ষুঃ-শ্রোত্রে ক উ দেবো যুনক্তি। ১ ॥

মন, প্রাণ, বাক্য, চক্ষুঃ ও শ্রোত্র কোন্ অবিজ্ঞাত-মহিমা দেবতার প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে? এই প্রশ্নের সমাধানপ্রসঙ্গে সর্ব্বনিয়ন্তা স্বতন্ত্র এক

বস্তুর সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে এবং সেই বস্তু যে, নিতান্ত দুর্বিবজ্ঞেয়, তাহা বুঝাইবার উদ্দেশে ঐ উপনিষদ্‌ই তারস্বরে বলিয়াছেন--

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি নো বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।"

অর্থাৎ যাহা দ্বারা ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ প্রেরিত হইতেছে, সাধারণ চক্ষুঃ বাক্য ও মন তাহাকে দেখিতে বা প্রকাশ করিতে পারে না। সেই বস্তুটী প্রাকৃত প্রত্যক্ষের অবিষয় (১)। এই প্রসঙ্গে কঠোপনিষদ্ আরও স্পষ্টস্বরে বলিয়াছেন—

"ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥" (কঠ ৫—৫।৫)

এই দেহ যে, প্রাণ ও অপান বায়ুর সাহায্যেই জীবিত আছে, তাহা নহে; পরন্তু এই প্রাণ ও অপান বায়ু যাহাকে আশ্রয় করিয়া আত্মলাভ করিয়াছে, তাহার দ্বারাই সমস্ত দেহ জীবিত আছে। উল্লিখিত সূত্রমধ্যে উক্তপ্রকার উপনিষদের উপদেশাবলীই যেন প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

প্রাণ ও অপানাদির ন্যায় সূত্রোল্লিখিত সুখ দুঃখাদি গুণগুলিও

---

(১) উপনিষদে এই সব কথা সাধারণ ভাবে আত্মার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলেও, সম্প্রদায়ভেদে উহাদের তাৎপর্য্যার্থ বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। তাহার ফলে, ন্যায়মতে ইহা কেবল আত্মার অস্তিত্ব-সাধক; কারণ, তাঁহাদের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা পৃথক্ পদার্থ। অদ্বৈতবাদে আবার এই কথাই জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ-সাধন পক্ষে প্রমাণ রূপে গৃহীত হইয়াছে; কারণ, তাহাদের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা বস্তুতঃ এক অভিন্ন পদার্থ।

আত্মার অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকে ; কেন না, সুখ দুঃখের অনুভূতি ও ইচ্ছা দ্বেষাদির প্রয়োগ, চেতন ভিন্ন জড়স্বভাব কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি বস্তুতে কেহ কখনও উপলব্ধি করে না, এবং তাহা সম্ভবও হয় না। এসব কথা ন্যায়দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে।

এই সূত্রোল্লিখিত গুণাবলী ছাড়া আরও কতকগুলি গুণ আত্মাতে আছে, সে সমুদয় লইয়া আত্মগত গুণসংখ্যা সমষ্টিতে চতুর্দ্দশ,—বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, ভাবনাখ্য সংস্কার, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম (১)। এপর্য্যন্ত যে সমস্ত গুণের কথা বলা হইল, সে সমস্তই জীবাত্মার সম্বন্ধে প্রযোজ্য, পরমাত্মার পক্ষে নহে।

ন্যায়মতে আত্মা দুইপ্রকার, পরমাত্মা ও জীবাত্মা। উভয় আত্মাই নিত্য ও পরম মহৎ বা অসীম এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তন্মধ্যে পরমাত্মা এক, আর জীবাত্মা অনেক—প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন। পরমাত্মা অনুমানগম্য—বিশ্বকার্য্য দর্শনে কর্ত্তা ও নিয়ন্তারূপে তাঁহার অনুমান হয় (২), কিন্তু জীবাত্মা প্রত্যক্ষ-

(১) বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—

"বুদ্ধ্যাদি ষট্‌কং সংখ্যাদি পঞ্চকং ভাবনা তথা।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ গুণা এতে আত্মনঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

বুদ্ধি—জ্ঞান, সংখ্যা—একত্ব দ্বিত্বাদি। মহৎ পরিমাণ, যেরূপ সংস্কারের ফলে পূর্ব্বজ্ঞাত বিষয়ের পশ্চাৎ স্মরণ হয়, তাহার নাম ভাবনাখ্য সংস্কার।

(২) অনুমানের প্রণালী—ক্ষিত্যঙ্কুরাদি জগৎ সকর্ত্তৃকং, কার্য্যত্বাৎ, ঘটাদিবৎ। অর্থাৎ ক্ষিতিও অঙ্কুরাদি যে সমুদয় পদার্থ উৎপত্তিশীল, উহারা সকর্ত্তৃক, অর্থাৎ নিশ্চয়ই উহাদের কেহ কর্ত্তা আছে ; যেহেতু উহারা জন্য পদার্থ। সেই কর্ত্তাই পরমেশ্বর।

পৃশ্যও বটে; 'আমি সুখী, দুঃখী, জ্ঞানী' ইত্যাদি ভাবে জ্ঞান-সুখাদি বিশেষণের যোগে জীবাত্মার অনুভূতি হইয়া থাকে। জীবাত্মার ন্যায় পরমাত্মাও গুণবান্। তাঁহার গুণসংখ্যা সমষ্টিতে আট প্রকার। একত্ব সংখ্যা, মহৎ পরিমাণ, সর্ব্বপদার্থ হইতে পার্থক্য, সর্ব্ববস্তুর সহিত সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও যত্ন (১)। এইরূপে আচার্য্যগণ এক আত্মাশব্দ হইতেই জীব ও পরমাত্মার স্বরূপ, বিভাগ ও গুণাদিভেদ পরিকল্পনা করিয়া শাস্ত্রের অসম্পূর্ণতা দোষ অপনয়ন করিয়াছেন।

আত্মার ন্যায় মনও একটী দ্রব্য পদার্থ। মনই আত্ম-প্রত্যক্ষের ও সুখ-দুঃখাদি প্রত্যক্ষের প্রধান উপায় বা করণ। এই জন্যই সূত্রকার সর্ব্বপ্রথমে মনের সদ্ভাবসাধক অনুমানের উল্লেখ করিয়াছেন—

"আত্মেন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষে জ্ঞানস্য ভাবাভাবশ্চ মনসো লিঙ্গম্॥" ৩।২।১॥

প্রত্যেক ক্রিয়ার জন্যই কর্ত্তা, করণ ও বিষয় থাকা আবশ্যক হয়। এই জন্যই রূপাদি পাঁচটী বিষয়ে দর্শনাদিরূপ পাঁচ প্রকার ক্রিয়া নির্ব্বাহের জন্য চক্ষুঃ প্রভৃতি পাঁচটী ইন্দ্রিয় (করণ) স্বীকার করিতে হয়। আত্মার প্রত্যক্ষ ('আমি আছি' অহমস্মি ইত্যাদি) এবং সুখ দুঃখের অনুভূতিও ('আমার সুখ দুঃখ,

(১) বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—"সংখ্যাদয়ঃ পঞ্চ বুদ্ধিরিচ্ছা যত্নোঽপিচেশ্বরে॥" অবশ্য, এসমস্ত কথা কণাদের সূত্রমধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত নাই, তথাপি ন্যায়াচার্য্যগণ আত্মার ও পরমাত্মার বিভাগ ও তদুভয়ের স্বরূপ ও গুণাদিগত পার্থক্য বিশেষ ঘটাপূর্ব্বক নিরূপণ করিয়াছেন।

কিংবা আমি সুখী দুঃখী' ইত্যাদি জ্ঞানও) ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে ; সুতরাং ঐ সমুদয় জ্ঞানের জন্যও একটী করণ (ক্রিয়া-সাধন) স্বীকার করা আবশ্যক হয় ; কারণ, অতি নিপুণ ব্যক্তিও বিনা সাধনে কোন ক্রিয়া সম্পাদনে সমর্থ হয় না। অথচ চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারাও ঐ সমুদয় জ্ঞান সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ একই সময়ে সন্নিহিত পাঁচপ্রকার বিষয়ে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ সত্ত্বেও (১) একাধিক জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে দেখা যায় না। আরও দেখা যায়, আত্মাও (জ্ঞাতাও) আছে, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধও আছে, তথাপি সেই বিষয়ে কখনও জ্ঞান হয়, আবার কখনও হয় না। কেন এমন অব্যবস্থা হয় ? না, মনঃসংযোগের ভাবাভাবেই এমন হয়, অর্থাৎ যখন যে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ ঘটে, তখন সেই ইন্দ্রিয় হইতেই জ্ঞানোৎপত্তি হয়, কিন্তু মনঃ-সংযোগবিহীন অপরাপর ইন্দ্রিয়গণ তখন জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ হয় না। এই জন্যই আত্মা ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানসাধন মনের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হয়, এবং ঐরূপ অব্যবস্থাই মনের সদ্ভাব অনুমিত করিয়া দেয় ; উল্লিখিত প্রত্যেক শরীরে মনঃ এক একটী স্বতন্ত্র, এবং উহা নিত্য দ্রব্য ও অণুপরিমাণ—অত্যন্ত সূক্ষ্ম ; এক সঙ্গে দুইটী ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হইবার শক্তি বা যোগ্যতা উহার আদৌ নাই ; কাজেই—

"প্রযত্নাযৌগপদ্যাজ্‌ জ্ঞানাযৌগপদ্যাচ্চৈকম্ ॥", ৩।২।৩ ॥

(১) বিষয় সন্নিহিত থাকিলে, এবং অপর কোনও বাধা না ঘটিলে একই সময়ে পঞ্চেন্দ্রিয়েরই বিষয়-সম্বন্ধ হইয়া থাকে। কেবল মনঃসংযোগের অভাবই ইন্দ্রিয়সম্বদ্ধ সমুদয় বিষয়ে যুগপৎ জ্ঞান না হওয়ার কারণ।

মন একই সময়ে দুইটী ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা করিতে পারে না; এবং যুগপৎ জ্ঞানদ্বয়-সমুৎপাদনেও সমর্থ হয় না। ইহা দ্বারাও মনের একত্ব সমর্থিত হইল। এক শরীরে একাধিক মনঃ থাকিলে, তাহাদের দ্বারা এক সময়েই সমুদয় ইন্দ্রিয়ের পরিচালন ও বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানোৎপাদন করা সম্ভব হইত। যখন তাহা হয় না; তখন বুঝিতে হইবে, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত মনঃ নামে আরও একটী জ্ঞান-সাধন আছে, এবং উহা এক শরীরে একাধিক নহে।

কোন কোন দার্শনিক, জ্ঞানের যৌগপদ্য স্বীকার করেন। একথা সমর্থনের জন্য তাঁহারা বলেন—ঈষদুষ্ণ, সুগন্ধি, সুস্বাদু, কোমলস্বভাব কোন খাদ্যদ্রব্য ভোজনকালে, ভোক্তা সেই বস্তুর ঐ সমুদয় গুণ একই কালে অনুভব করিয়া থাকে; সুতরাং জ্ঞানের যৌগপদ্য অস্বীকার করা যায় না। তদুত্তরে বলিতে হয় যে, বস্তুতঃ সেখানেও জ্ঞানের যৌগপদ্য নাই, ক্রমোৎপন্ন জ্ঞান-সমষ্টিতে যৌগপদ্য ভ্রম হয় মাত্র। যেমন একশত পদ্মপত্র সূচী-বিদ্ধ করিলে আপাততঃ মনে হয় যে, ঐ একশত পত্র যেন একবারেই বিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যায় যে, ঐ পত্রগুলি পর-পর এক একটী করিয়াই বিদ্ধ হইয়াছে; কেবল শীঘ্রতার দরুণ পারম্পর্য্য প্রতীত না হওয়ায় ঐরূপ ভ্রান্তি হয় মাত্র। এইরূপ উক্ত স্থলেও, মনের ক্ষিপ্র-কারিতা নিবন্ধন কালব্যবধান প্রতীত না হওয়ায় লোকের মনে যৌগপদ্য-ভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকে মাত্র; সুতরাং সূত্রকারের উক্তি অসঙ্গত বা দৃষ্টবিরুদ্ধ হয় নাই।

আলোচনা।

কণাদের মতে উক্ত পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া মনঃ পর্য্যন্ত পদার্থগুলি দ্রব্য নামে অভিহিত ; দ্রব্য কাহাকে বলে, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (১)। উক্ত দ্রব্য নয়প্রকার—ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, দিক্, কাল, আত্মা ও মনঃ। উক্ত নয়টী দ্রব্যের মধ্যে প্রথমোক্ত পাঁচটী দ্রব্য 'ভূত' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে (২)। ব্যবহারের সৌকর্য্যসম্পাদনই ঐরূপ নামকরণের উদ্দেশ্য। পঞ্চ ভূতের মধ্যে আকাশ নিত্য পদার্থ ; অপর চারিটী—ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ু, সকলেই স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে দুই ভাগে বিভক্ত। স্থূলভাগ উৎপত্তি-বিনাশশীল—অনিত্য, এবং উহা লোকের উপভোগ্যযোগ্য ঘট-পটাদি নামে পরিচিত, আর সূক্ষ্মভাগ উৎপত্তি-বিনাশবিহীন—নিত্য এবং অনুপভোগ্য পরমাণু নামে অভিহিত।

---

(১) গুণ-ক্রিয়ার আশ্রয় বা সমবায়ীকারণ পদার্থমাত্রই দ্রব্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মতে দ্রব্য ভিন্ন অপর কোন পদার্থই সমবায়ী কারণ (জন্য দ্রব্যের আরম্ভক) হইতে পারে না। সমবায়ী কারণের লক্ষণ পরে যথাস্থানে কথিত হইবে।

(২) কণাদের সূত্রমধ্যে 'ভূত' সংজ্ঞা স্পষ্টাক্ষরে কথিত না থাকিলেও পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ উহা বিশদ ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—"ক্ষিত্যাদিপঞ্চ ভূতানি"। (ভাষা পরিচ্ছেদ)। বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য শব্দাদি বিশেষ গুণের সহিত সম্বন্ধই 'ভূত' দ্রব্যের লক্ষণ।

কথিত পরমাণুপুঞ্জ জন্য না হইয়া নিত্য হয় কেন? তদুত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন—

"সদকারণবৎ নিত্যম্ ॥" ৪।১।১ ॥

অর্থাৎ যাহা সৎ অর্থাৎ—অভাব নহে; অথচ কোনপ্রকার কারণসম্বদ্ধও (সাবয়বও) নহে, তাহাই নিত্য। ঘটপট ও হিম করকাদি জন্য দ্রব্যগুলি যেরূপ স্বকারণ অবয়বের সহিত ঘনিষ্ট-ভাবে সম্বদ্ধ, কিন্তু পরমাণুপুঞ্জ সেরূপ নহে। কোন পরমাণুই অপর পরমাণু বা অবয়বের সহিত সমবায় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ নহে; কারণ, উহারা নিরবয়ব ও স্বতঃসিদ্ধ; কাজেই কোন পরমাণুকেই অপর পরমাণুতে ভর করিয়া থাকিবার আবশ্যক হয় না (১)। পক্ষান্তরে—

"কারণভাবাৎ কার্য্যভাবোঽনিত্যঃ ইতি" ॥ ৪।১।৩॥

কার্য্যমাত্রই কারণ-সাপেক্ষ; কারণমাত্রই পূর্ব্ববর্ত্তী, ও কার্য্য মাত্রেই পরবর্ত্তী; সুতরাং কার্য্যমাত্রেই নিজ নিজ কারণাপেক্ষায় অনিত্য। সেই অনিত্য ঘট-পটাদি কার্য্যদর্শনে তৎকারণ পরমাণুর

---

(১) জন্য পদার্থই নিজ নিজ উপাদান কারণকে আশ্রয় করিয়া থাকে; যেমন ঘট একটা জন্য পদার্থ; সে তাহার কারণীভূত—অবয়ব সমূহকে অবলম্বন না করিয়া থাকিতেই পারে না; কিন্তু পরমাণু যখন চরম কারণ—পরমাণুর অপর কোনও কারণ থাকা সম্ভব হয় না, তখন কারণকে আশ্রয় করিয়া থাকাও তাহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না।

অস্তিত্ব অনুমিত হয়; সুতরাং সূক্ষ্ম—অদৃশ্য হইলেও উহার সত্তার অস্বীকার করিতে পারা যায় না (১)।

পরমাণু সৎপদার্থ হইলেও ঘটাদির ন্যায় প্রত্যক্ষ-গোচর হয় না। তাহার কারণ এই যে, সাধারণতঃ দ্রব্য-প্রত্যক্ষের প্রতি প্রধান কারণ দুইটী—প্রথম দৃশ্য বস্তুর মহত্ত্ব বা স্থূলত্ব, দ্বিতীয় উদ্ভূত (অভিব্যক্ত) রূপ (২)। কেবল রূপ বা মহত্ত্ব থাকাই দ্রব্য-প্রত্যক্ষের কারণ নহে; পরন্তু উক্ত উভয়ই তুল্য কারণ;

(১) ইহার তাৎপর্য্য—সাধারণ নিয়ম এই যে, অত্যন্ত অসৎ—অবস্তু হইতে কখনও কোনও সৎ বস্তুর উৎপত্তি হয় না, হইতেও পারে না; অর্থাৎ আকাশ কুসুম হইতে কখনও ফল জন্মে না। তাহার পর, কার্য্য অপেক্ষা সূক্ষ্ম হওয়াই কারণের স্বভাব। (এ নিয়ম কেবল কার্য্য-কারণভাবাপন্ন দ্রব্যের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।) ঘট একটী স্থূল কার্য্য বা জন্য পদার্থ, তৎকারণ অবয়বসমূহ ঘটাপেক্ষা সূক্ষ্ম; এইরূপ ঘটাবয়ব অপেক্ষাও তৎকারণ অবয়ব-সমূহ অতি সূক্ষ্ম। এই যে, কার্য্য-কারণের আপেক্ষিক সূক্ষ্মতা, নিশ্চয়ই তাহার এক স্থানে পরিসমাপ্তি স্বীকার করিতে হইবে; নচেৎ 'অনবস্থা' দোষ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ ঐরূপ একটা বিশ্রামস্থান স্বীকার না করিলে, অনন্তকালেও ঐ কল্পনার শেষ হইবে না, এবং তাহার ফলে মূল কারণ নির্দ্ধারণ করাও সম্ভবপর হইতে পারে না। এই জন্যই সর্ব্বশেষে এমন একটী কারণ কল্পনা করিতে হইবে, যাহার কোন অবয়ব বা অংশ নাই। সেই নিরবয়ব চরমকারণেরই নাম পরমাণু। পরমাণুরও অপর অবয়ব স্বীকার করিলে, ঘটাদির ন্যায় উহারও স্থূলত্ব, সাবয়বত্ব ও অনিত্যত্ব আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। তাহা হইলে উহার পরমাণুত্ব ও নিত্যত্ব কিছুতেই রক্ষা করা যায় না। এই কারণেই স্থূলকার্য্য দর্শনে পরমাণুর অস্তিত্ব অনুমিত হয়, এবং উহাকে নিত্য ও সৎপদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

(২) সূত্রকার বলিয়াছেন—

"মহত্যনেকদ্রব্যবত্ত্বাৎ রূপাচ্চোপলব্ধিঃ" ॥ ৪।১।৬ সূত্র।

সুতরাং দৃশ্য বস্তুতে দুইই থাকা আবশ্যক। পরমাণুতে মহত্ত্বও নাই এবং উদ্ভূত রূপও (নীল পীতাদি বর্ণও) নাই; কাজেই উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এই জন্যই বায়ুর প্রত্যক্ষ না হইবার কারণ-নির্দ্দেশপ্রসঙ্গে সূত্রকার বলিয়াছেন—

"সত্যপি দ্রব্যত্বে মহত্ত্বে রূপসংস্কারাভাবাদ্বায়োরনুপলব্ধিঃ" ॥৪।১।৭॥

অর্থাৎ যদিও বায়ু মহৎ দ্রব্য হউক, তথাপি তাহার রূপ-সংস্কার অর্থাৎ উদ্ভূত রূপ না থাকায় প্রত্যক্ষ হয় না (১)। এই কারণেই পরমাণুরও প্রত্যক্ষ হওয়া সম্ভব হয় না; যেহেতু পরমাণু মহৎ (স্থূল) ও উদ্ভূত রূপবান্ নহে।

উক্ত চতুর্বিবধ পরমাণুর পরস্পর সম্মিশ্রণে দ্ব্যণুকাদিক্রমে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। জীবগণের শুভাশুভ কর্ম্মজনিত প্রাক্তন অদৃষ্টের (পুণ্য পাপের) প্রেরণায় সর্ববপ্রথমে বায়বীয় পরমাণুতে ক্রিয়া (স্পন্দন) উপস্থিত হয়; তাহার ফলে অপরাপর (পার্থিবাদি) পরমাণুতেও বিক্ষোভ উৎপন্ন হইয়া একটী পরমাণুকে আর একটী পরমাণুর সঙ্গে সংযোজিত করিয়া এক একটী

স্থূল জগতের উৎপত্তি।

(১) দ্রব্য-প্রত্যক্ষের সাধারণ নিয়ম এই যে,—দ্রব্যটী যদি পরিমাণে মহৎ (স্থূল) হয়, এবং উদ্ভূত রূপবিশিষ্ট হয়, তবেই সেই দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা দ্রব্য প্রত্যক্ষেও রূপের ন্যায় উদ্ভূত স্পর্শ থাকা আবশ্যক হয়। যাহাতে রূপ আছে, মহৎ পরিমাণও আছে, কেবল উদ্ভূত স্পর্শ নাই, সেরূপ দ্রব্য কখনও ত্বগিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয় না। পরমাণুতে উক্ত তিনটী কারণেরই অভাব আছে; কাজেই প্রত্যক্ষের বাধা ঘটে।

দ্ব্যণুক সমুৎপাদন করে; সেই দ্ব্যণুকও আবার বিক্ষুব্ধ হইয়া দুই দুইটী মিলিয়া এক একটী ত্রসরেণুর সৃষ্টি করে। এই ত্রসরেণুই সমস্ত স্থূল জগতের প্রথম। সূক্ষ্মের চরম পরমাণু স্বভাবতই অণুপরিমাণ; দ্ব্যণুক তদপেক্ষা বৃহৎ হইলেও স্থূল নহে—পরমাণুরই মত অণুপরিমাণ। ত্রসরেণুতেই সর্ব্বপ্রথমে স্থূলতা বা মহৎ পরিমাণের অভিব্যক্তি হয় (১)। ত্রসরেণুর মহত্ত্ব বা স্থূলতা তদুপাদান দ্ব্যণুক বা পরমাণুর পরিমাণ হইতে আসে না; উহা উপাদানগত বহুত্ব সংখ্যা হইতে আইসে (২)। আকাশ

(১) ত্রসরেণু স্থূল এবং মহৎ হইলেও সাধারণ চক্ষুর গ্রাহ্য নহে। গবাক্ষ-রন্ধ্রে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে, তন্মধ্যে যে, অতি সূক্ষ্মাকার ধূলিরেণু বায়ু-সঞ্চালিত হয়, তাহাই ত্রসরেণু।

(২) সাধারণ নিয়ম এই যে, "কারণগুণাঃ কার্য্য-গুণমারভন্তে" অর্থাৎ কারণের গুণই কার্য্যেতে সমানজাতীয় গুণান্তর জন্মায়। এই জন্য লোহিত সূতায় নির্ম্মিত বস্ত্র ও লোহিত হইয়া থাকে। ত্রসরেণু স্থলে কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়; কারণ, ত্রসরেণুর মহৎপরিমাণ তৎকারণ দ্ব্যণুকের পরিমাণ হইতে উৎপন্ন হয় না। যুক্তি এই যে, পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, দ্ব্যণুকের পরিমাণ—অণু; সুতরাং দ্ব্যণুকের পরিমাণই যদি দ্ব্যণুকসম্ভূত ত্রসরেণুর পরিমাণ জন্মাইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা দ্ব্যণুকের মত অণুপরিমাণবিশিষ্ট হইত, কখনই মহৎ হইত না; কেন না, কার্য্যে সজাতীয় গুণান্তরোৎপাদন করাই কারণ-গুণের স্বভাব। এখন দ্ব্যণুকের অণুপরিমাণই যদি ত্রসরেণুর পরিমাণ জন্মাইত, তবে নিশ্চয়ই ত্রসরেণুর পক্ষে মহত্ত্ব বা স্থূলত্ব লাভ অসম্ভব হইয়া পড়িত। অতএব বলিতে হয় যে, যে কয়েকটী দ্ব্যণুক হইতে

নিত্য ও নিরবয়ব পদার্থ, এবং কোন প্রকার পরমাণুদ্বারাও আরব্ধ নহে; সুতরাং উহার সম্বন্ধে নিত্যানিত্য বিভাগ সম্ভব হয় না।

পূর্ব্বোক্ত অনিত্য বা স্থূল কার্য্যদ্রব্য পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু, এই ভূত-চতুষ্টয়ের বিশেষ বিভাগ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সূত্রকার বলিয়াছেন—

"তৎ পুনঃ পৃথিব্যাদি কার্য্যদ্রব্যং ত্রিবিধং শরীরেন্দ্রিয়বিষয়-সংজ্ঞকম্" ॥ ৪।২।১॥

দ্ব্যণুকাদিক্রমে স্থূলভাবে পরিণত উক্ত পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য)। শরীর শব্দে ভোগায়তন বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ জীবগণ যাহা আশ্রয় করিয়া ভোগ সম্পাদনে সমর্থ হয়, তাহাই এখানে শরীর-পদবাচ্য; আর যাহাদ্বারা সেই ভোগ নির্ব্বাহিত হয়, সেই ভোগসাধনের নাম ইন্দ্রিয়, এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সমুদয় বস্তু ভোগ করা হয়, সে সমুদয়ের নাম বিষয়।

ত্রসরেণুর উৎপত্তি, সেই কারণগত যে, বহুত্ব সংখ্যা (উহা গুণ পদার্থ), সেই বহুত্ব সংখ্যাই ত্রসরেণুর মহত্ত্ব সমুৎপাদন করিয়া থাকে। এই জন্য সূত্রকার বলিয়াছেন :—

"কারণবহুত্বাৎ কারণমহত্ত্বাৎ প্রচয়বিশেষাচ্চ মহৎ ॥" ৭।১।৯।

অর্থাৎ কারণগত বহুত্ব সংখ্যা, মহত্ত্ব ও 'প্রচয়' নামক শিথিল সংযোগ, এই ত্রিবিধ কারণ হইতে কার্য্যে মহত্ত্ব উৎপন্ন হয়। প্রচয় অর্থ শিথিল সংযোগ, যেমন তুলা প্রভৃতির সংযোগ।

"প্রচয়ঃ শিথিলাখ্যো যঃ সংযোগস্তেন জন্যতে। পরিমাণং তূলকাদৌ" ॥

(ভাষাপরিচ্ছেদ)

উক্ত পার্থিব শরীর জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ভেদে চতুর্বিধ। তন্মধ্যে, শুক্রশোণিত-সংযোগজন্য মনুষ্যাদির শরীর জরায়ুজ ; অণ্ড হইতে উৎপন্ন পক্ষী সর্পাদির শরীর অণ্ডজ, এই উভয়বিধ শরীরই যোনিজ ; আর স্বেদ—ঘর্ম্মাদি হইতে জাত মশক মক্ষিকাদির শরীর স্বেদজ ; এবং ভূমিভেদ করিয়া উৎপন্ন বৃক্ষ লতা প্রভৃতির শরীর উদ্ভিজ্জ, এই দুই প্রকার শরীর 'অযোনিজ' নামে অভিহিত (১)। পার্থিব ইন্দ্রিয়ের নাম নাসিকা বা ঘ্রাণ। ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব বলিয়াই পৃথিবীর গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ উপাদানের গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে ; সুতরাং পার্থিব গন্ধগ্রাহক ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে পার্থিবই বলিতে হইবে। শরীর ও ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত সমস্ত পার্থিব পদার্থই বিষয়-পদবাচ্য।

পার্থিব শরীরের ন্যায় জলীয় শরীর থাকাও অনুমেয়। বরুণ-লোক ও চন্দ্রলোকবাসী প্রাণিগণের শরীর জলীয় ; ইহা শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ (২)। পূর্ব্ব নিয়মানুসারে রসগ্রাহী রসনাই জলীয় ইন্দ্রিয়। এবং তদ্ভিন্ন সমস্ত জলীয় পদার্থই বিষয় মধ্যে পরিগণিত।

তৈজস শরীর সূর্য্যমণ্ডলে বিদ্যমান আছে ; ইহা শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ

---

(১) যাহারা স্বকৃত কর্ম্মফলে নরকে গমন করে, তাহাদেরও যাতনা-ভোগের জন্য বিভিন্নাকার শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে ; কিন্তু সে সকল শরীর জরায়ুজ বা অণ্ডজ নহে ; পরন্তু স্বেদজমধ্যে পরিগণিত।

(২) ছান্দোগ্যোপনিষদে চন্দ্রমণ্ডলস্থিত কর্ম্মীদিগের জলময় দেহের কথা উক্ত আছে। যথা—"তেষাং যদম্ময়ং শরীরং চন্দ্রমস্যুপভোগায়ারব্ধম্, তদুপভোগক্ষয়দর্শনশোকাগ্নিসম্পর্কাৎ প্রবিলীয়তে" (শাঙ্কর ভাষ্য)।

এবং অনুমানগম্যও বটে। রূপগ্রাহী চক্ষুঃ তৈজস ইন্দ্রিয়; এই কারণেই চক্ষুঃ প্রধানতঃ তেজের গুণ রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে। উক্ত শরীর ও ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত তৈজস পদার্থই বিষয় শ্রেণীভুক্ত। তৈজস শরীরের ন্যায় বায়বীয় শরীরও বায়ুলোকে প্রসিদ্ধ। স্পর্শগ্রাহক ত্বক্ হইতেছে বায়বীয় ইন্দ্রিয়; এবং এতদুভয়ের অতিরিক্ত বায়বীয় সমস্ত পদার্থই বিষয় মধ্যে ধর্ত্তব্য। এইরূপে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই ভূত-চতুষ্টয়ই শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপে পরিণত হইয়া জীবগণের সর্ব্ববিধ উপভোগ সম্পাদন করিতেছে।

সূত্রকার কণাদের মতে এক একটী ভূতই এক এক প্রকার শরীরের উপাদান; ভূতান্তরগুলি তাহার সহায়রূপে কার্য্য করিয়া থাকে মাত্র। পৃথিবীই পার্থিব শরীরের উপাদান, অপর সমস্ত ভূত কেবল তাহার কার্য্যে সহায়তা করে মাত্র। জলীয় প্রভৃতি দেহের অবস্থাও এই প্রকারই বটে। কিন্তু, কোন কোন দার্শনিক একথা সহজে স্বীকার করিতে চাহেন না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন,—কোন শরীরই এক ভূতে সৃষ্ট হয় না, বা হইতে পারে না; পরন্তু প্রত্যেক শরীরই পঞ্চভূতের সমবায়ে উৎপন্ন; সুতরাং পাঞ্চভৌতিক। অন্য সম্প্রদায় আবার এ কথায় পরিতুষ্ট না হইয়া বলেন যে, না, এই স্থূল শরীর পাঞ্চভৌতিক নহে—ত্রৈভৌতিক অর্থাৎ পৃথিবী, জল ও তেজঃ, এই ভূতত্রয়ই উহার উপাদান; এই কারণেই শরীরে ভূতত্রয়ের গুণ—গন্ধ, রস ও উষ্ণতার উপলব্ধি হইয়া থাকে। শরীর সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আরও

অনেক প্রকার মতভেদ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে সূত্রকার প্রথমোক্ত দুইটী মতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বলিয়াছেন—

"প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাণাং সংযোগস্যাপ্রত্যক্ষত্বাৎ পঞ্চাত্মকত্বং ন বিদ্যতে ॥"
৪॥২।২ ॥

অর্থাৎ 'সংযোগ' এক প্রকার সম্বন্ধ; উহা দ্রব্যের ধর্ম্ম—গুণ। দ্রব্য-প্রত্যক্ষের সঙ্গেই উহার প্রত্যক্ষ হয়, স্বতন্ত্রভাবে কখনও উহার প্রত্যক্ষ হয় না; কিন্তু যে দ্রব্য নিজে প্রত্যক্ষযোগ্য নহে; তাহার সংযোগও চির দিনই অপ্রত্যক্ষ থাকে, ইহাই বাস্তব নিয়ম। এই জন্যই সর্ব্বব্যাপী আকাশের সহিত যে, আমাদের যাঁ কোন বস্তুর সংযোগ আছে, তাহা অনুমানগম্য হইলেও প্রত্যক্ষ-গোচর হয় না। এখন দেখিতে হইবে যে, জীবের স্থূল শরীর যদি পাঞ্চভৌতিক—আকাশাদি পঞ্চ ভূতের সংযোগফল হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই স্থূল শরীর প্রত্যক্ষগোচর হইত না; কারণ, আকাশ ও বায়ু, এই দুইটী কারণ-দ্রব্যই প্রত্যক্ষের অবিষয়; সুতরাং তদুভয়ের সংযোগ কখনই প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না; কাজেই তদুভয়ের সংযোগারব্ধ স্থূল দেহও চিরদিনই প্রত্যক্ষের অতীত—অপ্রত্যক্ষ থাকিতে পারে; এই জন্যই স্থূল দেহকে পঞ্চভূতে আরব্ধ - পাঞ্চভৌতিক বলিতে পারা যায় না। পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য জগতেও তত্তৎ স্থানের উপযোগী স্থূল দেহ বিদ্যমান আছে; এবং সেই সমুদয় দেহও এই জগতেরই মত ঐকভৌতিক; অপর ভূত-চতুষ্টয় তাহাতে যথাসম্ভব সম্মিলিত থাকে মাত্র, কিন্তু উহাদের সঙ্গে উপাদান-উপাদেয়ভাব কখনও

থাকে না, ইহা একপ্রকার সর্ব্বদর্শন-সম্মত সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিতে হইবে। এই সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা স্থাপনার্থ সূত্রকার পুনশ্চ বলিতেছেন—

"গুণান্তরাপ্রাদুর্ভাবাচ্চ ন ত্র্যাত্মকম্॥" ৪।২।৩॥

অভিপ্রায় এই যে, যে কোন স্থূল শরীর যদি পৃথিবী, জল ও তেজঃ এই তিনটী ভূতের সমবায়ে সমুৎপন্ন হইত, তাহা হইলে, পীতবর্ণ হরিদ্রা ও শুভ্রবর্ণ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিলে যেমন তৃতীয় আর একটী লোহিত বর্ণের আবির্ভাব হয়, ঠিক তেমনই ভূতত্রয়ারব্ধ স্থূল শরীরে কোন ভূতেরই কোনও বিশেষ গুণ ব্যক্ত না থাকিয়া, অভিনব আর একপ্রকার বিচিত্র গুণের আবির্ভাব হইত; তাহা যখন হয় না, তখন কোন স্থূল শরীরকেই ভূতত্রয়ারব্ধ 'ত্র্যাত্মক' বলিতে পারা যায় না (১)। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্থূল শরীর এক একটী ভূতের সাহায্যে সমুৎপন্ন হইলেও ভূতান্তরের সহিত উহার সংযোগ সম্বন্ধ থাকা প্রত্যাখ্যাত হয় নাই, পরন্তু ভূতান্তরের সমবায়িকারণভাব মাত্র

(১) বেদান্তের মতে প্রত্যেক বস্তুই পঞ্চাত্মক বা পঞ্চীকৃত, পঞ্চভূতের সম্মিশ্রণেই ভূতসমূহের স্থূলভাব আসিয়াছে। কাজেই ঐ মতে—সর্ব্ব প্রকার স্থূল শরীরই পাঞ্চভৌতিক হইয়া পড়ে। শরীর পাঞ্চভৌতিক হইলেও, "ভূয়স্ত্বাত্তু তদ্বাদঃ" অর্থাৎ যেখানে যে ভূতের আধিক্য থাকে, সেই নামেই তাহার পরিচয় বা প্রসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে; সুতরাং পাঞ্চভৌতিক দেহসমূহকেও পার্থিব, জলীয়, তৈজস বা বায়বীয় প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নামে ব্যবহার করা দোষাবহ হয় না।

নিষিদ্ধ হইয়াছে। মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘটে যেমন মৃত্তিকাই উপাদান-কারণ, জল তেজঃ প্রভৃতি দ্রব্যগুলি মৃত্তিকার সহযোগীভাবে কার্য্য করে, ঠিক তেমনই আলোচ্য দেহ স্থলেও একটীমাত্র প্রধান ভূতের সহযোগীরূপে অপরাপর ভূতসমূহও উৎপাদনের সাহায্য করিয়া থাকে; এই জন্যই আমরা আমাদের এই পার্থিব শরীরে পার্থিব গুণ গন্ধের ন্যায়, জলের শীতলতা, তেজের উষ্ণতা ও বায়ুর স্পর্শ গুণের সদ্ভাব উপলব্ধি করিয়া থাকি; সুতরাং একত্ব-পক্ষেও লোক-ব্যবহার কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না।

কণাদের পরিভাষিত নয় প্রকার দ্রব্যের নাম, লক্ষণ ও পরিচয়াদি সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ যাহা বলিবার বলা হইল; অতঃপর উদ্দেশ-সূত্রোক্ত গুণ ও কর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থের আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে (১)। উদ্দেশসূত্রে প্রথমেই গুণের নির্দ্দেশ থাকায়, এখন প্রথমেই গুণের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

[গুণ]

সূত্রকার কণাদমুনি গুণের লক্ষণ বলিয়াছেন—

"দ্রব্যাশ্রয্যগুণবান্ সংযোগ-বিভাগেষকারণমনপেক্ষ ইতি গুণলক্ষণম্॥"
১।১।১৬॥

যাহা নিজে গুণবিশিষ্ট নয়, অথচ কোন একটী দ্রব্য পদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে; পক্ষান্তরে, দ্রব্যকে আশ্রয় না করিয়া

(১) এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা ন্যায়দর্শনের আলোচনা-প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আবশ্যক হইলে সেই সকল স্থান দ্রষ্টব্য।

থাকিতে পারে না; এবং অন্য-নিরপেক্ষভাবে সংযোগ ও বিভাগের সমুৎপাদনে অসমর্থ, তাহার নাম গুণ। অভিপ্রায় এই যে, দ্রব্যপদার্থ সাধারণতঃ গুণরহিত হইয়া থাকে না, এবং অপর দ্রব্যে সমবেত না হইয়াও থাকিতে পারে, এবং কর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থগুলি দ্রব্যাশ্রিত ও গুণরহিত হইয়াও, এবং অন্যের অপেক্ষা না করিয়াও বস্তুর সংযোগ বিভাগ জন্মাইতে পারে, কিন্তু আলোচ্য গুণপদার্থ তাহা করিতে পারে না; ইহাই গুণের বিশেষত্ব বা লক্ষণ। বস্তুতঃ গুণত্ব একপ্রকার জাতি বা সাধারণ ধর্ম্ম; তদ্বিশিষ্ট পদার্থই গুণ। ইহাই গুণের প্রকৃত পরিচায়ক। কণাদের অভিপ্রেত গুণের সংখ্যা ও বিভাগ নিম্নোদ্ধৃত সূত্রে বিবৃত হইয়াছে—

"রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক্ত্বং সংযোগ-বিভাগৌ বুদ্ধয়ঃ সুখ-দুঃখে ইচ্ছা-দ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ॥" ১।১।৬॥

অর্থ সহজ। উদ্ধৃত সূত্রে যদিও গুণের সমষ্টিসংখ্যা পঞ্চদশের অধিক হয় না; তথাপি কণাদের পরবর্ত্তী সূত্রসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এতদতিরিক্ত আরও কতকগুলি গুণ আছে, যাহা পূর্ব্বকথিত গুণ-লক্ষণের বিষয়ীভূত; সুতরাং সেগুলিও কণাদের অভিপ্রেত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। এইজন্য পরবর্ত্তী বিশ্বনাথপ্রভৃতি নৈয়ায়িক-গণ গুণের সমষ্টি সংখ্যা চতুর্ব্বিংশতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং সে সকল অনুক্ত গুণও যে, সূত্রকার কণাদের অভিপ্রেত,

তাহা তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়াছেন (১)। তাঁহাদের মতে সূত্রলিখিত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন, এই পঞ্চদশটী গুণের অতিরিক্ত আরও নয়টী গুণ আছে—শব্দ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। এই নয়টী পদার্থও উক্ত পরিভাষিত গুণশ্রেণীর অন্তর্গত। এইরূপে গুণের সূত্রোক্ত পঞ্চদশ সংখ্যাই চতুর্বিংশতিতে পরিণত হইয়াছে।

তন্মধ্যে রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য; এবং নীল পীতাদি ভেদে অনেক প্রকার। অবস্থাভেদে সমস্ত রূপই পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে; কিন্তু জলে কেবল শুক্ল রূপ, আর তেজে কেবল শুক্ল-ভাস্বর (ঈষৎ লোহিত) রূপমাত্র বিদ্যমান আছে (২)।

(১) প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন ভাষাপরিচ্ছেদ নামক গ্রন্থে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং পাছে কেহ মনে করে যে, ইহা কণাদের অনভিমত—সূত্রবিরুদ্ধ, সেই জন্য ব্যাখ্যাস্থলে বলিয়াছেন—"এতে গুণাশ্চতুর্ব্বিংশতি-সংখ্যকাঃ, কণাদেন কথিতাঃ 'চ' শব্দেন চ দর্শিতাঃ" ইতি (মুক্তাবলী)।

অর্থাৎ কণাদ মুনিও এই চতুর্ব্বিংশতিপ্রকার গুণই স্বীকার করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলি তিনি কথায় প্রকাশ করিয়াছেন, আর কতকগুলি সূত্রের 'চ' শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(২) জলে ও তেজে যে, সময় ও অবস্থাভেদে অন্যান্য রূপ দেখা যায়, তাহা উহাদের স্বাভাবিক নহে, আগন্তুক; কারণ-বিশেষের সংযোগে ঐ সমুদয় রূপ উপস্থিত হয়। আবার সেই সকল কারণের অভাবেই বিলুপ্ত হইয়া যায়।

দ্বিতীয় গুণের নাম রস। রস রসনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য একপ্রকার গুণ। উহা মধুর, অম্ল, তিক্ত, ক্ষার, কষায় ও কটু ভেদে ছয় প্রকার। উক্ত ছয়প্রকার রসই পৃথিবীতে বা পার্থিব পদার্থে আছে; কিন্তু জলে মধুর রস ভিন্ন অন্য কোনও রস নাই। দ্রব্যান্তর-সংযোগে জলেতে অপর রসেরও অভিব্যক্তি হইয়া থাকে; কিন্তু উহা জলের স্বাভাবিক গুণ রস নহে।

তৃতীয় গুণ গন্ধ। গন্ধ গুণটী কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, এবং সুরভি-অসুরভিভেদে দুই প্রকার। পঞ্চভূতের মধ্যে একমাত্র পৃথিবীই গন্ধের আশ্রয় (১)। চতুর্থ গুণ স্পর্শ। উহা কেবলই ত্বগিন্দ্রিয়ের গ্রহণ-যোগ্য, এবং আকাশ ভিন্ন ভূত-চতুষ্টয়েই বিদ্যমান থাকে। তন্মধ্যে তেজের উষ্ণস্পর্শ, জলের শীতস্পর্শ, বায়ুতে অনুষ্ণাশীতস্পর্শ এবং পৃথিবীতে কঠিনস্পর্শ অনুভূত হয়। হিম ও তেজঃসংস্পর্শে বায়ুতে শীত ও উষ্ণ-স্পর্শ অনুভূত হয়, এবং তেজঃসংস্পর্শে জলেও যে, উষ্ণতা প্রকটিত হয়, ঐ সমস্তই কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক। ইহা ছাড়া

(১) জল ও বায়ুতে যে, সময় সময় গন্ধ পাওয়া যায়, তাহা গন্ধযুক্ত অপর দ্রব্যের সহিত সংযোগের ফল। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন :—

"উপলভ্যাপ্সু চেদ্গন্ধং কেচিদ্ ব্রূয়ুরনৈপুণাঃ।
পৃথিব্যামেব তং গন্ধমাপো বায়ুং চ সংশ্রিতম্॥"

অর্থাৎ কোন কোন মন্দমতি লোক যদি জল ও বায়ুতে গন্ধোপলব্ধি করিয়া গন্ধকে উহাদেরই গুণ বলিয়া মনে করে, তবে তাহা ভুল। বুঝিতে হইবে পৃথিবীর গন্ধই জল ও বায়ুকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

আর এক প্রকার স্পর্শ আছে, তাহাকে বলে পাকজ স্পর্শ। যেমন অগ্নিপক্ক মৃন্ময় ঘটাদির স্পর্শ। পঞ্চম গুণের নাম সংখ্যা। গণনব্যবহার-নিষ্পাদক গুণের নাম সংখ্যা, যেমন একত্ব দ্বিত্বাদি। তন্মধ্যে দ্বিত্বাদি সংখ্যাগুলি অপেক্ষাবুদ্ধি-প্রসূত। সেই অপেক্ষাবুদ্ধিনাশের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিত্বাদি সংখ্যারও বিনাশ হইয়া যায়। একাধিক একত্ব জ্ঞানের নাম অপেক্ষাবুদ্ধি। প্রথমে এক একটী করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে একাধিক বস্তুর জ্ঞান হয়, পরে সেই অনেক একত্বের সংকলনের ফলে দ্বিত্ব-ত্রিত্বাদি সংখ্যার প্রতীতি ও ব্যবহার হইয়া থাকে; কাজেই দ্বিত্বাদি সংখ্যাসমূহকে অপেক্ষাবুদ্ধিজন্য বলা হইয়া থাকে। সেই অপেক্ষাবুদ্ধির বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিত্বাদি সংখ্যারও বিলোপ হইয়া যায়। অতঃপর ষষ্ঠ গুণ পরিমাণের কথা বলা যাইতেছে।

পরিমাণ চারিপ্রকার—মহৎ, অণু, দীর্ঘ ও হ্রস্ব। যাহার গুণ, ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহার পরিমাণ মহৎ; যেমন ঘটাদি বস্তুর পরিমাণ। তদ্বিপরীত পরিমাণই 'অণু' নামে অভিহিত। এই প্রকার লোকপ্রসিদ্ধ দীর্ঘ পরিমাণের বিপরীত পরিমাণই হ্রস্ব পরিমাণ নামে কথিত। কেহ কেহ বলেন, অণু ও হ্রস্ব এবং মহৎ ও দীর্ঘ পৃথক্ পরিমাণ নহে। একই পরিমাণ অবস্থাভেদে অণু ও হ্রস্ব নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপ একই পরিমাণ অবস্থাভেদে মহৎ ও দীর্ঘ নামে পরিচিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ মহৎ ও দীর্ঘ দুইটী স্বতন্ত্র পরিমাণ নহে, এবং অণু আর হ্রস্বও বিভিন্ন পরিমাণ নহে। তাহাদের

মতে, যেখানে হ্রস্বত্ব আছে, সেখানে অণুত্বও অবশ্যই আছে। মহত্ব ও দীর্ঘ সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে।

শঙ্করমিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন—ঐ দুইটী পরিমাণ পৃথক্ হইলেও, সমনিয়তবৃত্তি; সুতরাং যেখানে মহত্ত্ব থাকে, অণুত্ব সেখানে অবশ্যই থাকিবে, এবং মহত্ব যেখানে থাকে, দীর্ঘত্বও সেখানে নিশ্চয়ই থাকিবে।

পরিমাণের আরও এক প্রকার বিভাগ কল্পনা করা যাইতে পারে; এক পরম মহৎ, অপর পরম অণু। যেমন দিক্, কাল, আকাশ ও আত্মার পরিমাণ। উহাদের পরিমাণ যেমন পরম মহৎ, মনের ও পরমাণুর পরিমাণ আবার তেমনই পরম অণু, এতদপেক্ষা সূক্ষ্ম পরিমাণ জগতে আর কাহারও নাই (১)। পরিমাণ নিত্য ও অনিত্যভেদে দুই প্রকার। নিত্য পদার্থের পরিমাণ নিত্য, আর অনিত্য পদার্থের পরিমাণ অনিত্য (২)। সর্ব্বত্রই কারণগত পরিমাণদ্বারা কার্য্যবস্তুর পরিমাণ উৎপাদিত হয়, কেবল পরমাণুর পরিমাণ সম্বন্ধে এ নিয়ম ব্যাহত হয়। কেন না, কণাদের মতে পরমাণু-পরিমাণের কারণত্ব স্বীকৃত হয়

(১) কণাদ বলেন—"তদভাবাদণু মনঃ।" অর্থাৎ যেহেতু মনকে পরম মহৎ বলিতে পারা যায় না, এবং মধ্যম-পরিমাণ স্বীকার করিলেও জ্ঞানের যৌগপদ্য সম্ভাবনা হয়, সেই হেতু মনঃ বস্তুতঃ অণু পরিমাণ।

(২) পরিমাণ সম্বন্ধে কণাদ বলিয়াছেন—

"নিত্যে নিত্যম্।" ৭।১।১৯। "অনিত্যেঽনিত্যম্।" ৭।১।১৮।

নিত্য বস্তু পরমাণু ও আকাশ প্রভৃতির পরিমাণ নিত্য, আর অনিত্য ঘটপটাদির পরিমাণ অনিত্য।

নাই; পরমাণুগত বহুত্ব-সংখ্যা দ্বারাই সে কার্য্য (কার্য্যগত পরিমাণোৎপাদন) সম্পাদিত হইয়াছে (১)।

সপ্তম গুণ পৃথক্‌ত্ব। যাহা দ্বারা এক বস্তু হইতে অপর বস্তুর পার্থক্য প্রতীতি হয়, সেই গুণের নাম পৃথক্‌ত্ব। 'পট হইতে ঘট পৃথক্; জল হইতে অগ্নি পৃথক্', এইরূপ ব্যবহারই 'পৃথক্‌ত্ব' নামক স্বতন্ত্র গুণ স্বীকারের নিদান (২)। অষ্টম গুণ- সংযোগ। পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা বিভিন্ন স্থানবর্ত্তী একাধিক বস্তুর সম্মিলনের নাম সংযোগ। সংযোগ তিন প্রকার—

"অন্যতরকর্ম্মজ উভয়-কর্ম্মজঃ সংযোগজশ্চ সংযোগঃ" ॥ ৭।২।৯ ॥

অন্যতর-কর্ম্মজ, উভয়-কর্ম্মজ এবং সংযোগজ। পথিকের

(১) অভিপ্রায় এই যে, পরিমাণের স্বভাব এই যে, আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করা। এখানে উৎকৃষ্ট পরিমাণ অর্থ স্থূল হইতে স্থূলতর, আর সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর। এখন পরমাণুর পরিমাণ যদি স্বকার্য্যের পরিমাণ উৎপাদন করিত, তাহা হইলে, পরমাণু হইতে উৎপন্ন বস্তুমাত্রই তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর বা অণুতর হইত, অথচ তাহা অনুভববিরুদ্ধ। এইজন্য পরমাণুর পরিমাণকে কারণ না বলিয়া পরমাণুগত বহুত্বসংখ্যাকেই কারণ বলা হইয়াছে।

(২) কেহ কেহ বলেন—'পৃথক্‌ত্ব' একটা গুণ নহে; পরন্তু উহা বস্তুর ভেদমাত্র; সুতরাং অন্যোন্যাভাবদ্বারাই উহার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে। তদুত্তরে কণাদমতাবলম্বীরা বলেন যে,—"অস্মাৎ পৃথক্ ইদং নেতি প্রতীতিহি বিলক্ষণা" ইতি।

অর্থাৎ পৃথক্‌ত্ব ও ভেদ (অন্যোন্যাভাব) কখনই এক হইতে পারে না। প্রতীতিভেদই উহাদের পার্থক্য বুঝাইয়া দেয়। পৃথক্‌ত্বের প্রতীতি হয়—'অস্মাৎ পৃথক্' ইহা হইতে অমুক বস্তু পৃথক্, আর অন্যোন্যাভাবের প্রতীতি হয়—'ইদম্ ইদং ন' অর্থাৎ ইহা অমুক বস্তু নহে। এই প্রকার প্রতীতি-ভেদই পৃথক্‌ত্ব ও ভেদের পার্থক্য প্রমাণিত করিয়া দিতেছে।

নগরপ্রাপ্তি অন্যতর-কর্ম্মজ। এখানে একমাত্র পথিকই গমনরূপ কর্ম্ম করে, নগর নিশ্চেষ্টই থাকে। মেষদ্বয়ের সংযোগ উভয়-কর্ম্মজ; কারণ, সেস্থলে উভয় মেষই অগ্রসর হইয়া পরস্পর মিলিত হয়। হস্তের সহিত যে, বৃক্ষের সংযোগ, তাহা সংযোগজ সংযোগ; কেন না, সেখানে বৃক্ষের সহিত অগ্রে অঙ্গুলি-সংযোগ হয়; পশ্চাৎ তদ্দ্বারা হস্তের সংযোগ সিদ্ধ হয়। উক্ত সংযোগের বিপরীত বা বিনাশক গুণের নাম বিভাগ। বিভাগও সংযোগের ন্যায় তিন প্রকার।

বুদ্ধি ও তাহার বিভাগ।

অপর একটী গুণের নাম বুদ্ধি; বুদ্ধি অর্থ জ্ঞান। উহা আত্ম-সমবেত। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের ও মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইলে আত্মাতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। উক্ত জ্ঞান দুই প্রকার—সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক। বস্তুর বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাববিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা সবিকল্পক। যেমন 'রূপবান্ ঘট' ইত্যাদি জ্ঞান। আর যে জ্ঞানে জ্ঞেয় বিষয়ের কোন প্রকার বিশেষণ—গুণকর্ম্মাদি প্রকাশ না পায়,—কেবল বস্তুর স্বরূপমাত্র প্রকাশ পায়, সেই জ্ঞান নির্ব্বিকল্পক। আমরা সাধারণতঃ বিশেষ্য-বিশেষণভাবঘটিত শব্দব্যবহারেই অভ্যস্ত; কাজেই বিশেষ্য-বিশেষণভাবরহিত নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপটী বুঝিতে বা প্রকাশ করিতে পারি না।

বুদ্ধির আরও দুইটী বিভাগ আছে, তাহার একটী অনুভূতি, অপরটী স্মৃতি বা স্মরণ। অনুভূতি আবার দুই প্রকার—এক

প্রত্যক্ষ, অপর অনুমিতি বা লৈঙ্গিক। প্রত্যক্ষ ও অনুমিতি কণাদের অভিমত প্রমাণ সত্য, কিন্তু বৈশেষিকদর্শনে উহাদের পরিমার্জ্জিত লক্ষণ নাই বলিলেও দোষ হয় না। প্রথমে তিনি আত্মবিচারের প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষের একটী লক্ষণ করিয়াছেন—

"আত্মেন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষাদ্ যন্নিষ্পদ্যতে, তদন্যৎ॥" ৩।১।১৭॥

অর্থাৎ আত্মার সহিত ইন্দ্রিয়ের এবং সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত বিজ্ঞেয় বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা অন্য—অনুমান হইতে স্বতন্ত্র—প্রত্যক্ষ (১)।

প্রত্যক্ষ ও তাহার বিভাগ।

ইহার পর চতুর্থ অধ্যায়ে আরও কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন—

"মহত্যনেকদ্রব্যবত্ত্বাৎ রূপাচ্চোপলব্ধিঃ॥" ৪।১।৫॥

অর্থাৎ মহৎ পরিমাণযুক্ত দ্রব্য যদি অনেক দ্রব্যবিশিষ্ট (সাবয়ব) ও রূপবান্ হয়, তাহা হইলেই তাহার উপলব্ধি (প্রত্যক্ষ) হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, যে সাবয়ব বস্তুতে মহত্ত্ব ও উদ্ভূত রূপ বিদ্যমান থাকে, তাহাই প্রত্যক্ষের যোগ্য। এখানে মহত্ত্ব ও উদ্ভূত রূপকে সাবয়ব দ্রব্য-প্রত্যক্ষের কারণ বলা হইল। (২) কণাদ মুনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্বন্ধে এতদধিক আর

---

(১) ন্যায়দর্শনে প্রত্যক্ষের লক্ষণ এতদপেক্ষা অনেক বিশদ ও নির্দ্দোষ। সে লক্ষণ—"ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্"॥ ইত্যাদি

(২) প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে বলা হইয়াছে। সে সমুদয় একত্রিত করিলা প্রত্যক্ষের একটী পূর্ণ লক্ষণ পাওয়া যাইতে পারে। পাঠকগণ তাহা করিবেন।

কোন স্পষ্ট কথা বলেন নাই, এবং বলাও আবশ্যক মনে করেন নাই; বরং অষ্টমাধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে বুদ্ধি-পরীক্ষাপ্রসঙ্গে পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছেন—

"দ্রব্যে তু জ্ঞানং ব্যাখ্যাতম্ ॥" ৮।১।১ ॥

অর্থাৎ দ্রব্য নিরূপণের প্রসঙ্গেই আমি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ব্যাখ্যা করিয়াছি। তাহার পর জ্ঞানের উৎপত্তিপ্রণালী বা কার্য্য-কারণ নির্দ্দেশের অবসরে বলিয়াছেন—

"জ্ঞাননির্দ্দেশে জ্ঞাননিষ্পত্তিবিধিরুক্তঃ ॥" ৮।১।৩ ॥

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্বরূপ নির্দ্দেশের প্রসঙ্গেই জ্ঞানোৎপত্তির প্রণালীও উক্ত হইয়াছে। অথচ তিনি ইতঃপূর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট; ঐ লক্ষণ দ্বারা প্রত্যক্ষের যথার্থ পরিচয় সংগ্রহ করা অনেকের পক্ষেই কষ্টকর। যাহা হউক, এখানে আমাদিগকে এই সমস্ত কথায়ই পরিতুষ্ট থাকিয়া বুঝিতে হইবে যে, যে জ্ঞান গন্ধাদি বিষয়ের সহিত ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই যথার্থ প্রত্যক্ষজ্ঞান।

উক্ত প্রত্যক্ষজ্ঞান পঞ্চবিধ—ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, ত্বাচ ও শ্রাবণ। ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা গন্ধের প্রত্যক্ষ ঘ্রাণজ, রসনা দ্বারা রসের প্রত্যক্ষ রাসন, চক্ষু দ্বারা রূপাদির প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শানুভূতি ত্বাচ, আর শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ-গ্রহণ শ্রাবণ প্রত্যক্ষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রধানতঃ দ্রব্য ও দ্রব্যাশ্রিত গুণকর্ম্মাদিই প্রত্যক্ষের সাধারণ বিষয়। দ্রব্যের মধ্যে কেবল আত্মা, আকাশ, মন ও বায়ু প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, (অনুমানের বিষয় হয়) ; ইহা কণাদ মুনি দুইটী সূত্রদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন—

"তত্রাত্মা মনশ্চাপ্রত্যক্ষে ॥" ৮।১।২

"সত্যপি দ্রব্যত্বে মহত্ত্বে রূপসংস্কারাভাবাদ্বায়োরনুপলব্ধিঃ ॥"

৪।১।৬ ॥

দ্রব্য-প্রত্যক্ষে দ্রব্যাশ্রিত গুণকর্ম্মাদির সহিত চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক হয়; নচেৎ কোন দ্রব্যেরই প্রত্যক্ষ হয় না। এই অভিপ্রায়ে সূত্রকার বলিতেছেন—

"গুণকর্ম্মসু সন্নিকৃষ্টেষু জ্ঞাননিষ্পত্তেদ্রর্ব্যং কারণম্ ॥" ৮।১।৪ ॥

অর্থাৎ দ্রব্যের প্রত্যক্ষকালে, তাহার গুণ ও কর্ম্মের সহিত উপযুক্ত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ থাকা আবশ্যক, এবং সেইরূপ সন্নিকর্ষ থাকিলেই তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিষ্পন্ন হয়; এই জন্য, প্রত্যক্ষে দ্রব্যপদার্থ প্রধান কারণ হইলেও, গুণ ও কর্ম্ম তাহার সহায়তা করিয়া থাকে। প্রধানভূত দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইলে, দ্রব্য-সমবেত গুণ কর্ম্মাদিরও যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সেইজন্য সূত্রকার বলিয়াছেন—

"অনেকদ্রব্যসমবায়াৎ রূপবিশেষাচ্চ রূপোপলব্ধিঃ ॥" ৪।১।৭॥

"তৎসমবায়াৎ কর্ম্ম-গুণেষু" ॥৯।১।১৪॥

অর্থাৎ দ্রব্য প্রত্যক্ষে তৎসমবেত গুণ-কর্ম্মেরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই ভাবে দ্রব্যগত ও গুণ কর্ম্মগত জাতি প্রভৃতিরও

পরম্পরা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অধিকার অতিশয় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে; এবং এ সম্বন্ধে অন্যান্য দর্শনিকগণও নানাপ্রকার সূক্ষানুসূক্ষ্ম তর্ক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন।

অনুমান ও তদ্ভেদ।

প্রত্যক্ষ প্রমাণই অনুমিতির মুল। অগ্রে বহুল পরিমাণে প্রত্যক্ষ দর্শনের ফলে যে, লোকের হৃদয়ে একপ্রকার ব্যাপ্তিজ্ঞান বা ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চয় উৎপন্ন হয়; সেই লোকই কালান্তরে কোনপ্রকার হেতু দর্শনের পর উদ্বুদ্ধ সেই ব্যাপ্তিসংস্কারের সাহায্যে তজ্জাতীয় অদৃশ্য বস্তুর অস্তিত্ব বিষয়ে অনুমান করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষের সহিত অনুমানের এইরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য বা কার্য্য-কারণভাব নির্দ্দিষ্ট আছে বলিয়াই, প্রত্যক্ষের পর অনুমানের কথা বলা সুসঙ্গত হইতেছে। বৈশেষিক দর্শনে অনুমানের লক্ষণ বড়ই অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। বিশেষ প্রণিধান না করিলে এবং শাস্ত্রান্তরের সাহায্য না লইলে কেবল ঐ লক্ষণ হইতে অনুমান সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা হওয়া একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও অনুচিত হয় না। অনুমিতি সম্বন্ধে কণাদের লক্ষণটী এই—

"অস্যেদং কার্য্যং কারণং সংযোগি বিরোধি সমবায়ি চেতি
লৈঙ্গিকম্" ৯।২।১।

অর্থাৎ ইহা অমুকের কার্য্য (উৎপাদিত), কারণ, সংযোগী (সংযোগ-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ), অথবা বিরোধী (বিরুদ্ধস্বভাব), কিংবা সমবায়ী কারণ, এইরূপ ব্যবহারসিদ্ধ লিঙ্গ বা হেতু হইতে, যে

জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহার নাম লৈঙ্গিক বা অনুমিতি। ইহা দ্বারাই ন্যায়দর্শনোক্ত 'পূর্ব্ববৎ' (কারণলিঙ্গক), 'শেষবৎ' (কার্য্যলিঙ্গক), ও 'সামান্যতো দৃস্ট'—এই ত্রিবিধ অনুমিতির কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল, বুঝিতে হইবে(১)।

কিন্তু এ সূত্র দ্বারা অনুমিতি জ্ঞানের ও তৎসাধন অনুমানের বড় অধিক পরিচয় পাওয়া গেল না। সূত্রকার ইহার পরবর্ত্তী সূত্রে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা দ্বারাও অনুমিতির প্রকৃত ছবি পূর্ণমাত্রায় হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই কঠিন। পরবর্ত্তী সূত্রটী এই—

"অস্যেদং কার্য্য-কারণসম্বন্ধশ্চাবয়বাদ্ ভবতি॥" ৯।২।২॥

অর্থাৎ প্রথম সূত্রোক্ত লৈঙ্গিক (সামান্যতোদৃস্ট) ও কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ অর্থাৎ কার্য্যলিঙ্গক ও কারণলিঙ্গক অনুমিতি, এই উভয়ই প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন নামক পঞ্চবিধ অবয়ব হইতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে (২)। অনুমিতির সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ন্যায়দর্শনের প্রসঙ্গেই প্রদত্ত হইয়াছে;

---

(১) তাৎপর্য্য এই যে, ন্যায়দর্শনের ন্যায় এখানে অনুমিতির বিশেষ কিছু কথিত না থাকিলেও, ফলতঃ সেই বিভাগই সিদ্ধ হইতেছে। কেন না, ন্যায়োক্ত—"অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতোদৃষ্টং চ" এই সূত্রে যাহাকে 'পূর্ব্ববৎ' বলা হইয়াছে, এখানে তাহাই কারণলিঙ্গক, এবং যাহা শেষবৎ, তাহাই এখানে কার্য্যলিঙ্গক, আর যাহা সামান্যতোদৃষ্ট বলিয়া অভিহিত আছে, এখানে লক্ষণের অবশিষ্ট অংশে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে।

অতএব এখানে তাহার আর বিস্তৃতি বিধান অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক হয় (১)।

কণাদের মতে শব্দ একটী স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে; সুতরাং শাব্দ-জ্ঞান উক্ত অনুমিতিরই অন্তর্গত। সূত্রকার বলিয়াছেন—

"এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতম্।" ৯।২।৩।

অর্থাৎ কথিত অনুমিতি দ্বারাই শাব্দ জ্ঞানও বলা হইল। অর্থাৎ শব্দ যখন একটা স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে, অনুমানেরই অন্তর্গত, তখন শব্দজন্য জ্ঞানও অনুমিতিজ্ঞানেরই অন্তর্ভূত, তদতিরিক্ত নহে। বলা আবশ্যক যে, কণাদের মতে শব্দের ন্যায় উপমানও স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে; উহার কিয়দংশ অনুমানের, কিয়দংশ প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়।

(২) প্রতিজ্ঞা—সাধ্যনির্দ্দেশ, অর্থাৎ যাহার সাধন করিতে হইবে, তাঁহার উল্লেখ। হেতু—যাহা দ্বারা সাধ্য বিষয়টী প্রমাণিত করা হয়। উদাহরণ—দৃষ্টান্ত। উপনয়—পক্ষেতে ব্যাপ্য পদার্থের স্থিতি কথন। নিগমন—হেতুর সহিত প্রতিজ্ঞার পুনরুল্লেখ। যেমন, প্রতিজ্ঞা—পৃথিব্যাদিকং সকারণকং। হেতু—উৎপত্তিমত্ত্বাৎ। উদাহরণ—যথা ঘটাদিকং। উপনয়—উৎপত্তিমৎ চ পৃথিব্যাদিকং। নিগমন—তস্মাৎ তৎ সকারণকম্।

বৈশেষিক দর্শনে অনুমানের উল্লেখ আছে, কিন্তু বিশেষ লক্ষণাদি নাই; আবার অনুমানের কোন বিভাগও বর্ণিত হয় নাই, অথচ বিভাগের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, ন্যায়দর্শন অগ্রে, বৈশেষিক দর্শন পরে লিখিত হইয়াছে; সেই জন্যই কণাদ নিজের অভিমত ন্যায়দর্শনোক্ত বিষয়গুলির ব্যাখ্যা না করিয়া কেবল উল্লেখমাত্র করিয়া গিয়াছেন। এরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য কল্পনা না করিলে গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা দোষ ঘটে, গ্রন্থকারেরও অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

বুদ্ধির অপর বিভাগের নাম স্মৃতি বা স্মরণ। স্মৃতির লক্ষণ—

"আত্মমনসোঃ সংযোগবিশেষাৎ সংস্কারাচ্চ স্মৃতিঃ" ॥ ৯।২।৬ ॥

আত্মার সহিত মনের সংযোগ-বিশেষের ফলে, উদ্বুদ্ধ পূর্ব্ব-সঞ্চিত সংস্কার হইতে, যে জ্ঞানবিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম স্মৃতি। প্রকৃতপক্ষে কেবলই পূর্ব্বসংস্কার হইতে, যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই স্মৃতি বা স্মরণাত্মক জ্ঞান (১)। স্মৃতি দুই প্রকার—এক যথার্থা, অপর অযথার্থা। যে স্মৃতির বিষয়টী (স্মরণীয় বস্তুটী) সত্য, তাহা যথার্থা স্মৃতি, আর অসত্যবিষয়ক স্মৃতির নাম অযথার্থা স্মৃতি। স্মরণাত্মক জ্ঞান যখন পূর্ব্বতন সংস্কারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, তখন স্মৃতিকে স্বরূপতঃ ভ্রম বা প্রমা বলিয়া গণ্য করা সঙ্গত হয় না; এই জন্য কেহ কেহ স্মৃতিজ্ঞানের প্রমাত্ব (সত্য বিষয়গ্রাহিত্ব) বা অপ্রমাত্ব স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে স্মৃতির যথোক্ত বিভাগই সমীচীন ও যুক্তিসম্মত বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে।

উক্ত স্মরণাত্মক জ্ঞানের ন্যায় স্বপ্নদর্শন ও সুষুপ্তি, উভয়ই আত্ম-মনঃসংযোগ ও সংস্কার হইতে সমুৎপন্ন হয়; এই

---

(১) প্রত্যভিজ্ঞানামক আর এক প্রকার জ্ঞান আছে। যেমন 'এই সেই লোকটী'। এখানে পূর্ব্বদৃষ্ট লোকটীর পুনর্দর্শনে ঐরূপ প্রতীতি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 'সেই' পদটী অতীতের স্মৃতি বুঝাইতেছে, আর 'এই' পদটী অতীতের প্রত্যক্ষ দর্শন জানাইতেছে। এই জন্য উহার একাংশে স্মৃতি, অপর অংশে প্রত্যক্ষ, উহার সম্মিলিত নাম প্রত্যভিজ্ঞা।

জন্য কোন কোন আচার্য্য স্বপ্নদর্শনকে স্মরণের অন্তর্গত করিয়া থাকেন। কেন না, স্মরণও সংস্কারপ্রসূত, স্বাপ্নজ্ঞানও সংস্কার-প্রসূত; সুতরাং উভয়কে স্মরণের অন্তর্ভুক্ত বলিতে কিছুমাত্র বাধা দেখা যায় না। সূত্রকার কণাদ কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষভাবে কোন কথাই বলেন নাই। কেবল—

"তথা স্বপ্নঃ" ॥৯।২।৭॥

এইমাত্র বলিয়া,—স্বপ্নজ্ঞান যে, আত্ম-মনঃসংযোগ ও প্রাক্তন সংস্কারের ফল, কেবল এই কথা বলিয়াই অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

সূত্রকার কণাদ বিদ্যা ও অবিদ্যাভেদে বুদ্ধির আরও দুইটী বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে অবিদ্যা অর্থ মিথ্যাজ্ঞান, আর বিদ্যা অর্থ সত্য জ্ঞান। অবিদ্যার কারণ নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে কণাদ বলিয়াছেন—

"ইন্দ্রিয়দোষাৎ সংস্কারদোষাচ্চ অবিদ্যা" ॥ "তদ্ দুষ্টং জ্ঞানম্ ॥"
৯।২।১০—১১ ॥

দর্শনের উপায়ভূত ইন্দ্রিয়গত দোষ ও সংস্কারগত দোষ হইতে অবিদ্যা উৎপন্ন হয়। সেই অবিদ্যাই দুষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান। অভিপ্রায় এই যে, আমরা যে সমুদয় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান উপার্জ্জন করি, সেই সমুদয় ইন্দ্রিয়ে যদি কোন প্রকার দোষ (রোগাদি) থাকে, তাহা হইলে, সেই সেই ইন্দ্রিয়দ্বারা আমাদের যে সকল জ্ঞান হইবে, তাহাও নিশ্চিতই সদোষ ভিন্ন নির্দ্দোষ হইবে না। এই জন্যই 'কামলা' রোগে যাহার

চক্ষু দুষিত হয়, তাহার নিকট অতি শুভ্র স্ফটিক বা শঙ্খও পীত-বর্ণ প্রতীত হয়। ঐ চক্ষুরিন্দ্রিয়গত পিত্তদোষই তাহার কারণ; অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গত দোষ যেমন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের কারণ, সংস্কার-গত দোষও ঠিক তেমনই ভ্রান্ত স্মৃতি ও অনুমিতির উৎপাদক। কারণ, অনুভব যদি ভ্রমাত্মক হয়, তবে তজ্জনিত সংস্কারও ভ্রমময় হইবে, এবং সেই ভ্রান্তসংস্কার হইতে যে স্মৃতি বা অনুমিতি প্রভৃতি হইবে, তাহাও নিশ্চয়ই ভ্রমাত্মক হইতে বাধ্য; এই জন্য সংস্কারদোষকেও অবিদ্যার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই অবিদ্যার অপর নাম ভ্রম। (১) সংশয় ও

(১) নব্য নৈয়ায়িকগণ ভ্রম ও প্রমার এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন—"তদ্বতি তৎপ্রকারকং জ্ঞানং প্রমা"। আর "অতদ্বতি তৎ-প্রকারকং জ্ঞানং ভ্রমঃ"। অর্থাৎ যে বস্তুতে যেরূপ ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে, তাহাকে সেইরূপে জানার নাম 'প্রমা' বা বিদ্যা। আর যাহাতে যেরূপ ধর্ম্ম আদৌ বিদ্যমান নাই, সেই বস্তুকে সেই ধর্ম্ম দিয়া জানার নাম ভ্রম। ঘটে ঘটত্ব ধর্ম্ম আছে, সেই ধর্ম্ম সহযোগে ঘটের যে জ্ঞান, তাহা হয় প্রমা, আর ঘটে পটত্ব ধর্ম্ম নাই, সেই পটত্ব ধর্ম্ম সহযোগে ঘটকে জানার নাম হয় অপ্রমা, ভ্রম বা অবিদ্যা। এক বস্তুতে একাধিক প্রকারে জ্ঞানের নাম সংশয়। যেমন 'ইহা কি স্থাণু, না মানুষ, অথবা আর কিছু' ইত্যাদি। সূত্রকারও বলিয়াছেন—

"বিদ্যাবিদ্যাতশ্চ সংশয়ঃ" ॥ ২।২।২০ ॥

অর্থাৎ সাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞান ও বিশেষ ধর্ম্মের অজ্ঞান হইতে সংশয়ের উৎপত্তি হয়।

বিপর্য্যয় জ্ঞান এই অবিদ্যারই অন্তর্গত। এই অবিদ্যার বিপরীত জ্ঞানকেই সূত্রকার 'বিদ্যা' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন—

"অদুষ্টং বিদ্যা ॥" ৯।২।১২ ॥

যে জ্ঞান স্বরূপতঃ অদুষ্ট—কোনপ্রকার ইন্দ্রিয় বা সংস্কার-দোষপ্রসূত নহে; পরন্তু নির্দ্দোষ প্রমাণ হইতে উৎপন্ন, সেই জ্ঞানের নাম—বিদ্যা। বিদ্যার অপর নাম—প্রমা। বিদ্যার সহিত অবিদ্যার বিরোধ চিরন্তন; বিদ্যার উদয়ে অবিদ্যা পলায়ন করে। বুদ্ধিনামক গুণের কথা এখানেই শেষ করা গেল। অতঃপর সুখ ও দুঃখের আলোচনা করা আবশ্যক। কিন্তু সুখ দুঃখ আমাদের চিরপরিচিত হইলেও, লক্ষণ দ্বারা উহা বিশেষ ভাবে বুঝাইতে পারা যায় না বলিলেও অসঙ্গত হয় না। এই জন্য সুখ ও দুঃখের কোন লক্ষণ নির্দ্দেশ না করিয়া সুখ দুঃখ যে, পরস্পর স্বতন্ত্র দুইটী গুণ, মাত্র সেই কথা বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। ইচ্ছা ও দ্বেষের সম্বন্ধে বিশেষ বলিবার কিছু নাই। প্রবৃত্তির হেতুভূত গুণের নাম ইচ্ছা, আর নিবৃত্তির কারণীভূত গুণের নাম দ্বেষ। ইচ্ছার পরভাবী ক্রিয়ানিষ্পত্তির প্রযোজক এক প্রকার গুণের নাম প্রযত্ন। প্রযত্ন তিন প্রকার—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি (শ্বাস-প্রশ্বাসাদি)। বুদ্ধি হইতে প্রযত্ন পর্য্যন্ত ছয়টী ধর্ম্মই আত্মার বিশেষ গুণ।

যে গুণ থাকায় মৃত্তিকাদি দ্রব্য অধঃপতিত হয়, সেই পতনানুকূল গুণের নাম গুরুত্ব। এতদতিরিক্ত শব্দও একটী

স্বতন্ত্র গুণ। আকাশ উহার উপাদান, এবং শ্রবণেন্দ্রিয় উহার গ্রাহক। এই জন্য সূত্রকার শব্দের পরিচয় দিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

"শ্রোত্রগ্রহণো যোঽর্থঃ, স শব্দঃ॥" ২।২।২১॥

কেবল শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যে গুণ গ্রহণ করা যায়, সেই গুণের নাম শব্দ। শব্দমাত্রই উৎপত্তির পর তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়। কোন শব্দই উৎপত্তির পর দ্বিতীয় ক্ষণের অধিক সময় বিদ্যমান থাকে না (১)। শব্দ দুই প্রকার—বর্ণ ও ধ্বনি। অকারাদি অক্ষরের নাম বর্ণ, আর বাদ্যযন্ত্রাদির শব্দের নাম ধ্বনি। পরত্ব ও অপরত্ব পরস্পর বিপরীতস্বভাব স্বতন্ত্র দুইটী গুণ। পরত্ব অর্থ অধিক সূর্য্যসংযোগিত্ব (অধিক পরিমাণে সূর্য্যকিরণ পাওয়া), আর অপরত্ব অর্থ পরত্বের বিপরীত। আর যে গুণের প্রভাবে ঘৃত, তৈল ও জলাদি পদার্থের স্যন্দন (ক্ষরণ) হয়, তাহার নাম দ্রবত্ব। যে গুণের সাহায্যে শক্তু প্রভৃতি শুষ্ক বস্তু পিণ্ডাকারে পরিণত হয়, সেই গুণের নাম স্নেহ। স্নেহ গুণ প্রধানতঃ জলের ধর্ম্ম। সংস্কার নামক গুণটী তিনভাগে বিভক্ত—স্থিতিস্থাপক, ভাবনা ও বেগ। একটী বৃক্ষশাখা আকর্ষণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে, তাহা স্থিতিস্থাপক সংস্কারগুণে যথাস্থানে যাইয়া থাকে। কোন বিষয় অভ্যাস করিলে যে, মনে থাকে, তাহা ভাবনাখ্য সংস্কারের ফল।

---

(১) মীমাংসকের মতে প্রত্যেক শব্দই নিত্য,—উৎপত্তিবিনাশ-বিহীন। কণ্ঠতালু প্রভৃতি স্থানে অভিঘাতের ফলে সেই নিত্য শব্দেরই অভিব্যক্তি বা প্রকাশ হয় মাত্র—কিন্তু কোন শব্দই নূতন জন্মে না।

একটী তীর নিক্ষেপ করিলে, সেই তীর যে বহুদূরে যায়, তাহার কারণ—সেই বেগনামক সংস্কার। বেগ হইতেও আবার নূতন বেগের সৃষ্টি হইয়া থাকে (১)।

আত্মনিষ্ঠ আরও দুইটী গুণ আছে, উহারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামে পরিচিত। ধর্ম্মের লক্ষণ প্রথমেই বলা হইয়াছে।

"যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ, স ধর্ম্মঃ ॥" ১।১।২ ॥

যাহা হইতে অভ্যুদয় স্বর্গাদি ও মুক্তি লাভ হয়, তাহাই ধর্ম্ম। যাহা তদ্বিপরীত—নরক পতনের হেতু, তাহাই অধর্ম্ম। ফল কথা ধর্ম্ম স্বর্গাদি সুখের সাধন, আর অধর্ম্ম নরকাদি দুঃখের নিদান (২)।

---

(১) প্রাথমিক আঘাতের ফলে নিক্ষিপ্ত বস্তুতে একটী বেগাখ্য সংস্কার উৎপন্ন হয়, সেই বেগ অল্পক্ষণ পরেই নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু নষ্ট হইবার পূর্ব্বেই সেই বেগ অপর একটী বেগ উৎপাদন করিয়া থাকে, সেই বেগও আবার বিনাশের পূর্ব্বে আর একটী বেগ উৎপাদন করে, যতক্ষণ কোন প্রকার প্রবল বাধা প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ ক্রমোৎপন্ন সেই বেগপ্রবাহ নিক্ষিপ্ত বস্তুটীকে দূর দূরান্তরে লইয়া যায়। এই জন্যই নিক্ষিপ্ত বস্তুটী সহসা পড়িয়া যায় না।

(২) "ধর্ম্মাধর্ম্মাবদৃষ্টং স্যাৎ, ধর্ম্মঃ স্বর্গাদিসাধনম্।
অধর্ম্মো নরকাদীনাং হেতুর্নিন্দিত কর্ম্মজঃ ॥"

(ভাষাপরিচ্ছেদ ১০২।)

[কর্ম্ম ও তাহার বিভাগ]

আলোচ্য সপ্ত পদার্থের মধ্যে দ্রব্য ও গুণ সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ যাহা বলা যাইতে পারে, বলা হইল ; অতঃপর তৃতীয় পদার্থ কর্ম্মের আলোচনা করা যাইতেছে—যদিও ক্রিয়ামাত্রই 'কর্ম্ম' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য, তথাপি সূত্রকার কণাদ বিশেষ লক্ষণ দ্বারা তাহার পরিচয় দিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার লক্ষণটী এই—

"একদ্রব্যমগুণং সংযোগ-বিভাগেষ্বনপেক্ষঃ কারণমিতি
কর্ম্মলক্ষণম্" ॥১।১।১৭॥

অর্থাৎ যাহা এক একটীমাত্র দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং নিজে কোনপ্রকার গুণকে আশ্রয় প্রদান করে না (গুণহীন), অথচ অন্যনিরপেক্ষভাবে সংযোগ ও বিভাগ সমুৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহার নাম কর্ম্ম। ইহাই কর্ম্মের সাধারণ লক্ষণ বা পরিচায়ক। ইহা দ্বারাই কণাদের অভিমত নিখিল কর্ম্মপদার্থ বুঝিয়া লইতে হইবে। উক্ত লক্ষণাক্রান্ত কর্ম্ম সাধারণতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত—

"উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনং প্রসারণং গমনমিতি কর্ম্মাণি"। ॥ ১।১।৭ ॥

উৎক্ষেপণ অর্থ—ঊর্দ্ধদিকে ক্ষেপণ, কোন বস্তুর ঊর্দ্ধগতির অনুকূল চেষ্টা ; তদ্বিপরীত চেষ্টার নাম অবক্ষেপণ। আকুঞ্চন অর্থ—প্রসারিত দ্রব্যের সংকোচসাধনচেষ্টা। আকুঞ্চনের বিপরীত

চেষ্টার নাম প্রসারণ। গমন অর্থ—স্থানান্তর-প্রাপ্তির অনুকূল চেষ্টা; যেমন পদবিক্ষেপ প্রভৃতি। জগতে যত রকম কর্ম্ম সম্ভবপর হয়, সে সমস্তই উক্ত পঞ্চবিধ কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হইবে। বুঝিতে হইবে, এতদতিরিক্ত আর কর্ম্ম নাই ও থাকিতে পারে না (১)। অতঃপর সূত্রোক্ত চতুর্থ পদার্থ 'সামান্য' সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে—

[সামান্য বা জাতি]

সামান্য অর্থ—সমান বস্তুর ভাব, অর্থাৎ বিভিন্নপ্রকার অনেক পদার্থেতে যাহার সাহায্যে সাম্য বা সমতাবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম সামান্য। সূত্রকারও এইরূপ অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন যে,—

"সামান্যং বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্" ॥১।২।৩॥

অর্থাৎ 'এই সকল বস্তু সমান বা এক জাতীয়', এবং এতদ-

---

(১) কর্ম্মের যে পাঁচটী বিভাগ প্রদর্শিত হইল, ইহার কোনটীই দ্রব্য ছাড়িয়া থাকে না; এবং কোনটীতেই কোনপ্রকার গুণ (শ্বেত পীতাদি রূপ বা মধুরাম্লাদি রস, কিংবা অন্য কোনপ্রকার বিশেষ গুণ) থাকে না; অথচ উক্ত কর্ম্মদ্বারাই জাগতিক বস্তুরাশির সংযোগ বিভাগ সংঘটিত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই সংযোগ বিভাগ ঘটাইবার সময় কোন কর্ম্মই অপর কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা করে না, (নিজের উৎপত্তির জন্য অন্যের অপেক্ষা করে সত্য, কিন্তু সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করে না)। এই ভাবে সূত্রোক্ত বিশেষণগুলির সার্থকতা বুঝিতে হইবে। ভ্রমণ, রেচন, স্যন্দন, ঊর্দ্ধজ্বলন ও তির্য্যক্ গমন, এ সকলও উক্ত গমনেরই অন্তর্গত।

পেক্ষা অমুক পদার্থ বিশেষ বা ভিন্নপ্রকার,' এইরূপ বুদ্ধিই 'সামান্য' ও বিশেষের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া থাকে। সূত্রকার উদাহরণচ্ছলে এই কথারই সমর্থনের জন্য বলিয়াছেন যে,—

"দ্রব্যত্বং গুণত্বং কর্ম্মত্বং সামান্যানি বিশেষাশ্চ" ॥১।২।৫॥

দ্রব্যের ধর্ম্ম দ্রব্যত্ব, গুণের ধর্ম্ম গুণত্ব ও কর্ম্মের ধর্ম্ম কর্ম্মত্ব। পৃথিব্যাদি নয়প্রকার দ্রব্য বিভিন্নস্বভাব হইলেও, 'দ্রব্যত্ব' ধর্ম্মটী উহাদের সকলের উপরই সমানভাবে বিরাজ করিতেছে—উহা নব দ্রব্যেরই সমান ধর্ম্ম—সামান্য; এই দ্রব্যত্বরূপ সামান্য ধর্ম্ম থাকায়ই পৃথিব্যাদি নয়টী পদার্থকে এক 'দ্রব্য' শব্দে অভিহিত করা হয়। সামান্যের অপর নাম জাতি। যেমন মনুষ্যত্ব, গোত্ব, দ্রব্যত্ব ও গুণত্ব প্রভৃতি। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, ইহাদের প্রত্যেকেই যেমন দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্ম্মত্বরূপ পৃথক্ পৃথক্ এক একটী জাতি বা সামান্য আছে, তেমনি উহাদের তিনের (দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের) উপরেও আর একটী সামান্য বা জাতি আছে, তাহার নাম—'সত্তা'। এই সত্তা জাতি উক্ত তিন পদার্থেই সমভাবে পর্য্যাপ্ত আছে; সুতরাং একৈকমাত্রবৃত্তি দ্রব্যত্ব প্রভৃতি জাতি অপেক্ষা সত্তা জাতিটী ব্যাপক। ব্যাপক বলিয়াই উহা দ্রব্যাদি তিনটী পদার্থের সমান ধর্ম্ম—সামান্য; আর দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, এই প্রত্যেক-গত—দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্ম্মত্ব জাতি তিনটী 'সামান্য' হইয়াও 'সত্তা' জাতি অপেক্ষা বিশেষ। এইপ্রকার সামান্য-বিশেষভাব লইয়াই পরা ও অপরাভেদে সামান্যের দুইটী বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। যে সামান্যটী যাহা অপেক্ষা অধিক পদার্থে থাকে, তাহা 'পর-

সামান্য'; যেমন 'সত্তা' জাতি; আর যাহা, অপেক্ষাকৃত অল্প পদার্থে থাকে, তাহা হয় 'অপর সামান্য;' যেমন দ্রব্যত্ব ও গুণত্ব প্রভৃতি। দ্রব্যত্ব জাতিও আবার পৃথিবীত্ব, জলত্বাদি অপেক্ষায় অধিক স্থানে থাকে বলিয়া 'পরা' জাতি মধ্যে গণ্য। অপরাপর স্থানেও এইরূপ বুঝিতে হইবে (১)।

[বিশেষ]

এখানে যে, 'সামান্য' ও 'বিশেষ' বলা হইল, প্রকৃতপক্ষে উভয়ই সামান্য বা জাতিপদার্থ। কিন্তু কণাদাভিমত 'বিশেষ' পদার্থ স্বতন্ত্র। পাছে কেহ এই বিশেষকেই কণাদাভিমত 'বিশেষ' পদার্থ বলিয়া ভ্রম করে, সেই ভয়ে সূত্রকার নিজেই বলিয়া দিয়াছেন—

"অন্যত্রান্ত্যেভ্যো বিশেষেভ্যঃ" ॥ ১।২।৬ ॥

অর্থাৎ উপরে যে, 'বিশেষ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহা বৈশেষিকসম্মত 'অন্ত্য (নিত্য) বিশেষ পদার্থ নহে। উহা সেই 'বিশেষ' হইতে স্বতন্ত্র 'সামান্য'নামক পদার্থ। 'বিশেষ' পদার্থটী হইতেছে নিজে নিত্য ও পরমাণুগত এবং পরমাণুপুঞ্জের পরস্পর

---

(১) বস্তুতঃ এখানে যাহা বলা হইল, তাহা সামান্যের প্রকৃত লক্ষণ নহে; সাধারণ পরিচয় মাত্র। নব্য নৈয়ায়িকগণ উহার লক্ষণ বলেন— "নিত্যানেকসমবেতা জাতিঃ।" অর্থাৎ যাহা নিজে নিত্য এবং অনেক ব্যক্তিতে 'সমবায়' সম্বন্ধে থাকে, তাহার নাম জাতি বা সামান্য। দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্ম্মত্ব এবং ঘটত্ব পটত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি নিজেরা নিত্য, অথচ নয় প্রকার দ্রব্যে, চব্বিশ প্রকার গুণে ও পাঁচ প্রকার কর্ম্মে যথাক্রমে বর্ত্তমান থাকে; সুতরাং উহারা জাতি। এইরূপ একই ঘটত্ব ধর্ম্মটী নিখিল ঘটে, এবং একই পটত্ব নিখিল পটে বিদ্যমান আছে বলিয়া উহারাও জাতি।

পার্থক্যসাধক। এই 'বিশেষ পদার্থ'ই পরমাণুপুঞ্জের পার্থক্য রক্ষা করিয়া থাকে; একজাতীয় বিভিন্ন পরমাণুর বিভিন্ন প্রকার কার্য্যোৎপাদনে সহায়তা করে; নচেৎ সমস্ত পার্থিব পরমাণু হইতে একই প্রকার কার্য্য হইতে পারিত;—আম্রবৃক্ষ ও বিল্ববৃক্ষ, উভয়ই পার্থিব পরমাণু হইতে উৎপন্ন; সুতরাং উভয় বৃক্ষই একাকার ও এক প্রকার পুষ্প-ফলপ্রসূ হইতে পারিত; কেবল উক্ত 'বিশেষ' পদার্থ'ই তদুভয়ের স্বরূপগত ও ফলগত পার্থক্য সাধন করিয়া থাকে।

পূর্ব্ব কথিত সামান্য ও বিশেষের মধ্যে পার্থক্য এই যে, একই সামান্য অনেক বস্তুতে ব্যাপকভাবে থাকে; কিন্তু বিশেষ পদার্থ তাহার বিপরীত; একটী বিশেষ কখনও একাধিক বস্তুতে থাকে না। উহা প্রত্যেকে বিশ্রান্ত, অর্থাৎ একটী পরমাণুগত বিশেষ কখনও অপর কোন পরমাণুকেই আশ্রয় করিয়া থাকে না; এই জন্যই বিশেষকে ব্যাবর্ত্তক বা ব্যাবৃত্তির হেতুভূত পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে (১)।

---

(১) বিশেষের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে, নব্য নৈয়ায়িকগণ এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন যে,—"স্বতো ব্যাবর্ত্তত্বং বিশেষত্বম্" অর্থাৎ দ্রব্য ও গুণ প্রভৃতি পদার্থগুলি যেমন অপরের (সামান্য প্রভৃতির) সাহায্যে আপন আপন পার্থক্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, বিশেষকে তেমন পরাপেক্ষিতভাবে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হয় না; সে নিজেই নিজেকে অপর সমুদয় পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখে। বিশেষে জাতি, গুণ বা কর্ম্ম নাই; ইহাই তাহার বিশেষত্ব। বিশেষ দ্বারা প্রধানতঃ পরমাণুরাশিরই ভেদ রক্ষিত হয়; এইজন্য "পরমাণূনাং পরস্পরভেদকো ধর্ম্মো বিশেষঃ" এইরূপ সহজ লক্ষণদ্বারা উহার পরিচয় দেওয়া হয়। ন্যায়দর্শনে 'বিশেষ' বলিয়া স্বতন্ত্র কোন পদার্থ স্বীকৃত হয় নাই।

[সমবায়]

সূত্রোক্ত ষষ্ঠ পদার্থের নাম সমবায়। 'সমবায়' এক প্রকার সম্বন্ধ। ন্যায়মতে ইহার গুরুত্ব ও উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক।

"ইহেদমিতি যতঃ কার্য্য-কারণয়োঃ স সমবায়ঃ" ॥ ৭।২।২৬ ॥

যে সম্বন্ধ দ্বারা কার্য্য ও কারণের মধ্যে 'ইদম্+ইহ' এইরূপ প্রতীতি হয়, সেইরূপ সম্বন্ধের নাম সমবায়। অভিপ্রায় এই যে, একটী বস্তু অপর বস্তুতে থাকিতে হইলে, নিশ্চয়ই তদুভয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক হয়। অসম্বদ্ধ ভাবে কোন এক বস্তু অপর বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না; সুতরাং কারণেতে কার্য্যের (ঘটাবয়বে ঘটের), এবং দ্রব্যেতে গুণ, কর্ম্ম, সামান্য (জাতি), ও বিশেষ পদার্থের অবস্থিতির জন্যও কোন একটী সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে। এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে, সেই সম্বন্ধটীর নাম ও স্বরূপ কিরূপ? সূত্রকার বলিতেছেন—

"যুতসিদ্ধ্যভাবাৎ কার্য্য-কারণয়োঃ সংযোগ-বিভাগৌ ন বিদ্যেতে ॥" ৭।২।১৪ ॥

প্রথমতঃ কার্য্য ও কারণের যুতসিদ্ধতা নাই—উহারা অযুত-সিদ্ধ। যাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকার পর মিলিত হয়, তাহাদিগকে যুতসিদ্ধ বলা হয়, আর যাহাদের মধ্যে কখনও বিচ্ছিন্নতা নাই—বিচ্ছেদ হইলেই ধ্বংস সুনিশ্চিত, সে সকল পদার্থকে অযুতসিদ্ধ বলে। ঘটরূপ কার্য্যটী তৎকারণীভূত কপাল প্রভৃতি অবয়বের সহিত কখনও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে না, বা থাকিতে পারে না; গুণকর্ম্মাদির সম্বন্ধেও এ নিয়মের

ব্যতিক্রম হয় না; এই জন্য উহাদের পক্ষে সংযোগ বা বিভাগ কখনও সম্ভবপর হয় না। এই জন্যই সংযোগসম্বন্ধের অতিরিক্ত 'সমবায়' নামে একটী স্বতন্ত্র সম্বন্ধ কল্পনা করা আবশ্যক হয়। বৈশেষিকমতে যুতসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধ হয় সংযোগ, আর অযুতসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধ হয় 'সমবায়'। বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন কয়েকটী উদাহরণের সাহায্যে এইরূপ নিয়মই অতি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন—

"ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণ-কর্ম্মণোঃ।
তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ।)

যে দুইটী অবয়বের সংযোগে ঘট প্রস্তুত হয়, সেই অবয়ব দুইটীর নাম কপাল ও কপালিকা। ঘট অবয়বী, কপাল-কপালিকা তাহার অবয়ব। কপাল-কপালিকার সহিত ঘটের যে সম্বন্ধ, এবং দ্রব্যেতে গুণ, কর্ম্ম ও জাতির অথবা গুণ ও কর্ম্মের সহিত জাতির যে সম্বন্ধ, আর পরমাণুর সহিত বিশেষের যে সম্বন্ধ, তাহার নাম সমবায়। ফল কথা, অবয়বী মাত্রই (ঘট প্রভৃতি) স্বীয় অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে থাকে; সমস্ত গুণ কর্ম্ম ও জাতিই দ্রব্যেতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে; জাতিমাত্রই দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মেতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে; আর সমস্ত বিশেষই সমবায় সম্বন্ধে পরমাণুকে আশ্রয় করিয়া থাকে। নৈয়ায়িকগণ সমবায়ের লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন—"নিত্যৈকঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ।" অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধটী নিজে নিত্য ও এক; আশ্রয়ের বিনাশেও উহার বিনাশ হয় না, এবং আশ্রয়ের ভেদেও উহার ভেদ বা

পার্থক্য ঘটে না। ঘট নষ্ট হইলেও, উহার সমবায় সম্বন্ধ অক্ষতই থাকে। একে একে সমস্ত আশ্রয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও, উহাদের সমবায় সম্বন্ধ বিনষ্ট হইবে না; বরং মহাকালে যাইয়া বিশ্রাম লাভ করিবে।

[অভাব]

অতঃপর অভাবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাইতেছে। এখন কথা হইতেছে এই যে, সূত্রোক্ত ষট্পদার্থের অতিরিক্ত 'অভাব', নামে কোন পদার্থ আছে কি না, এবং থাকিলেও উহা সূত্রকারের অভিমত কি না? এ বিষয়ে ঘোরতর মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়।

কেহ কেহ বলেন; কণাদের সূত্রসিদ্ধান্ত পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে ষট্পদার্থের অতিরিক্ত অভাবও একটী স্বতন্ত্র পদার্থ। কণাদ মুনি, যে সূত্রে পদার্থ পরিগণনা করিয়াছেন, সেখানে তিনি স্পষ্ট কথায় অভাবের উল্লেখ না করিলেও, সম্পূর্ণ গ্রন্থমধ্যে বহুস্থানে 'অভাব' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন; সে সকল শব্দের অর্থান্তর কল্পনা করিবারও উপায় নাই; কাজেই অভাবকে অতিরিক্ত সপ্তম পদার্থ বলিয়া পরিগণনা করা আবশ্যক।

অন্য সম্প্রদায় বলেন; জগতে অভাব নামে স্বতন্ত্র কোন পদার্থই নাই; সুতরাং অসৎকল্প সেই অভাব বিষয়ে সূত্রকারের সম্মতি-কল্পনা করা নিতান্ত অসার ও অনুপাদেয়। কণাদের সূত্ররাশি আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, এই তিনটী পদার্থই প্রধান, তদতিরিক্ত সামান্য, বিশেষ প্রভৃতি শব্দগুলি ঐ পদার্থত্রয়েরই অবস্থাভেদকে লক্ষ্য করিয়া

ব্যবহৃত হয় মাত্র। এক অবস্থায় যাহা 'সামান্য' নামে পরিচিত, অবস্থান্তরে তাহাই আবার 'বিশেষ' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। সমবায় সম্বন্ধও গুণবিশেষ ছাড়া আর কিছুই নহে। অতএব সূত্রোক্ত সামান্যাদির অবস্থাই যখন এইরূপ, তখন অযুক্ত অভাবের স্বাতন্ত্র্যকল্পনার অবসর কোথায়? এই অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কেহ কেহ বলিয়াছেন—"ভাবান্তরমভাবো হি কয়াচিত্তু ব্যপেক্ষয়া।"

অর্থাৎ অবস্থাভেদকে লক্ষ্য করিয়া একটী ভাবপদার্থই অপর ভাবপদার্থের তুলনায় 'অভাব' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপ মতভেদ সত্ত্বেও অভাবের ব্যবহার কেহই রোধ করিতে পারেন নাই; সুতরাং এবিষয়ে আর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। উহার স্বরূপ ও বিভাগাদি নির্দ্দেশ করিয়াই এ প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাইতেছে।

অভাব কি? ভাবভিন্নই অভাব, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য বিশেষ ও সমবায়, এই ছয়টী পদার্থের অতিরিক্তরূপে যাহা প্রতীতিগম্য হয়, তাহাই অভাব। অভাব চারি প্রকার—প্রাগভাব, ধ্বংস, অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব। কার্য্য (জন্যবস্তু) উৎপন্ন হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী যে অভাব, তাহার নাম প্রাগভাব। যাহার প্রাগভাব নাই, তাহার উৎপত্তি হয় না; অথচ কার্য্যবস্তুটী উৎপন্ন হইলেই তদীয় প্রাগভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। মুদ্গরাদির প্রহারে ঘটাদি বস্তুর যে, অভাব (বিনাশ) জন্মে, সেই অভাবের নাম ধ্বংস। ধ্বংসের আর ধ্বংস নাই;

উহা অনন্তকালস্থায়ী। যে অভাব ত্রৈকালিক, অর্থাৎ অতীত, বর্ত্তমান ও সুদূর ভবিষ্যতেও যাহার অভাব নাই—নিত্য, সেই অভাবের নাম অত্যন্তাভাব। যেমন আকাশে রূপাভাব। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—কোন কালেই আকাশে কোন প্রকার রূপ ছিল না, থাকিবে না, এবং বর্ত্তমানেও নাই (১)। একাধিক পদার্থের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের যে, অভাব, তাহা অন্যোন্যাভাব। ইহার অপর নাম ভেদ। যেমন 'ঘট কখনও পট নহে'। এখানে ঘট হইতে পটের এবং পট হইতে ঘটের ভেদ প্রতীত হইতেছে। নব্য নৈয়ায়িকগণ অভাবের, বড় বিশেষ সমাদর করেন, এবং অভাবের সাহায্যেই তর্কশাস্ত্রের কলেবর সমধিক বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। আমরা এখানেই অভাবের কথা পরিসমাপ্ত করিলাম। অতঃপর বৈশেষিক দর্শনোক্ত বিষয়গুলির সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

[উপসংহার]

মহামুনি কণাদকৃত বৈশেষিক দর্শনের আরম্ভ হইয়াছে—ধর্ম্মব্যাখ্যানে, আর সমাপ্তি হইয়াছে—তত্ত্বজ্ঞানে; ধর্ম্মই তত্ত্বজ্ঞানের নিদান; সুতরাং উপক্রম ও উপসংহার খুবই সুসঙ্গত ও

(১) যে স্থানে পূর্ব্বে ঘট বর্ত্তমান ছিল না, পশ্চাৎ সেই স্থানে একটী ঘট স্থাপন করিলেও, প্রথম প্রতীত ঘটাভাব নষ্ট হয় না, বিদ্যমানই থাকে। কেবল প্রতীতিগোচর হয় না মাত্র। অভাব প্রতীতি না হইবার কারণ সেই আনীত ঘট। এই জন্য ঐ ঘটকে অভাব প্রতীতির প্রতিবন্ধক বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে।

সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়াছে। মধ্যস্থলেও যে, সামঞ্জস্যের অভাব আছে, তাহা নহে। যদিও আপাতজ্ঞানে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা রহিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয় সত্য, তথাপি প্রণিধানপূর্ব্বক আলোচনা করিলে সহজেই সে ভ্রম বিদূরিত হইতে পারে। কণাদের অভিপ্রায় চিন্তা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার কোন কথাই অপ্রাসঙ্গিক বা অসম্বন্ধ প্রলাপোক্তি নহে।

কণাদমুনির প্রধান লক্ষ্য হইতেছে—নিঃশ্রেয়স নিরূপণ। সেই নিঃশ্রেয়স লাভের পক্ষে প্রধান উপায় হইতেছে—ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বিষয়ে বেদই একমাত্র প্রমাণ; যাহা বেদবিহিত নয়, অথবা বেদবিরুদ্ধ, তাহা যতই রমণীয় বা লোভনীয় হউক না কেন, কখনই ধর্ম্মপদবাচ্য হইতে পারে না। ধর্ম্মের ফল দ্বিবিধ—অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স। অভ্যুদয় অর্থ—অভিলষিত ফল লাভ। ঐহিক স্রক্চন্দনাদি বিষয়-ভোগ ও পারলৌকিক স্বর্গাদি ভোগ, উভয়ই অভ্যুদয় পদবাচ্য। যথাবিধি অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম হইতে উক্ত উভয়প্রকার অভ্যুদয়ই আয়ত্ত করা যাইতে পারে; কিন্তু যাহারা ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ভোগে বীতরাগ—নিতান্ত নিঃস্পৃহ, তাঁহারা ধর্ম্মকে অভ্যুদয়ের দিকে নিয়োজিত না করিয়া নিঃশ্রেয়স-পথে পরিচালিত করেন। নিঃশ্রেয়স অর্থ—মুক্তি—সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি। প্রবল বৈরাগ্যের সাহায্য ব্যতীত কখনই মুক্তিপথে মতি হয় না; বৈরাগ্যই উহার প্রকৃত নিদান। উক্ত প্রকার বৈরাগ্য আবার বিবেকজ্ঞান-সাপেক্ষ,—লোকের হৃদয়মধ্যে যতক্ষণ বিবেক-বহ্নি প্রজ্বলিত না হয়, সৎ-অসৎ, নিত্য অনিত্য ও

আত্মা অনাত্মায় পার্থক্য বোধ উপস্থিত না হয়, তত্তক্ষণ মুগ্ধ মন কিছুতেই বিষয়ের দোষরাশি দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, এবং দোষদর্শন ব্যতীত ভোগ্য বিষয়ে কাহারো বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইতে পারে না; এই জন্য সাধকের পক্ষে বিবেকজ্ঞান লাভ করা সর্ব্বাদৌ প্রয়োজনীয়। বিবেকজ্ঞান বিচারসাপেক্ষ; সেই বিবেক সাধনের জন্য—আত্মা ও অনাত্মপদার্থের গুণ দোষ বিচারের নিমিত্ত জাগতিক সমস্ত পদার্থ সংকলনপূর্ব্বক উহাদের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যক হয় (১)। সেই পারম্পরিক উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য কণাদ মুনি ষট্‌পদার্থ সংকলন করিতে বাধ্য হইয়াছেন; যাহার জন্য তাঁহাকে কৌতুকপ্রিয় লোকের নিকট—

"ধর্ম্মং ব্যাখ্যাতুকামস্য ষট্‌পদার্থোপবর্ণনম্।
সাগরং গন্তুকামস্য হিমবদ্‌গমনোপমম্॥"

এইরূপ মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত হইতে হইয়াছে!

কণাদের অভিমত পদার্থ-সংখ্যা ছয়ই হউক বা সাতই হউক; তাহাতে অসন্তোষের কোন কারণ নাই; কিন্তু তাঁহার পদার্থ-সংকলনের প্রণালীটী বিশেষ সন্তোষকর হয় নাই। এই গ্রন্থে সাধারণতঃ ন্যায়দর্শনোক্ত—উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা, এই নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে। উদ্দেশে প্রতিপাদ্য বিষয়সমুহের নাম

---

(১) যোগবাশিষ্ঠ এ কথা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—
"মোক্ষদ্বারে দ্বারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শমোবিচারঃ সন্তোষশ্চতুর্থঃ সাধুসঙ্গমঃ॥" মুমুক্ষু, ।১১।৫৯।

নির্দ্দেশ. লক্ষণে—উদ্দিষ্ট পদার্থসমূহের যথাযথভাবে স্বরূপ পরিচয় প্রদান, পরীক্ষাতে সেই লক্ষণানুযায়ী পদার্থের সত্তাবাদি নিরূপণ ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই গ্রন্থে সে নিয়মের মর্য্যাদা যথাযথভাবে পরিপালিত হয় নাই। প্রথমে যে সকল পদার্থের উদ্দেশ বা নাম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, লক্ষণ নির্দ্দেশের স্থলে, তাহার কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত বা অস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উদাহরণরূপে—'বিশেষ' ও 'সমবায়ের' কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে 'বিশেষ' লইয়া বৈশেষিক দর্শনের বিশেষত্ব, সেই 'বিশেষের' বিস্পষ্ট লক্ষণ না থাকা বড়ই বিস্ময়কর মনে হয়। কোন কোন অংশ আবার লক্ষণ নির্দ্দেশের স্থলে অনুক্তই রহিয়াছে; কিন্তু পরীক্ষাপ্রকরণে বিচারিত হইয়াছে। এই সমুদয় কারণে বৈশেষিক দর্শনের সূত্রানুসারে সিদ্ধান্ত-সংকলন করা বড়ই বিঘ্নসংকুল হইয়া পড়ে।

বৈশেষিকমতে প্রমাণ দুই প্রকার—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। ন্যায়োক্ত শব্দ ও উপমান এখানে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকৃত হয় নাই; পরন্তু প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যে উহাদের অন্তর্ভাব করা হইয়াছে। পরিগণিত পদার্থের মধ্যে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, এই তিনটীই প্রধান। দ্রব্যের মধ্যেও আত্মার আসন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ, শাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য মুক্তি-লাভের পক্ষে আত্মজ্ঞান বা তদ্বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানই একমাত্র উপায়।

আত্মা নিত্য নিরবয়ব ও বিভু। দেহাবচ্ছেদে আত্মার সুখ দুঃখাদি ভোগ নিষ্পন্ন হয় বলিয়া, দেহেতে আত্ম-ভ্রম হইয়া থাকে।

সেই ভ্রম বশতঃই সুখানুসন্ধানে ও তদনুকূল বিষয়ে অনুরাগ বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে ; এবং সেই অনুরাগের প্রেরণায়ই আত্মার সহিত মন ও ইন্দ্রিয়বর্গের সংযোগ-পরম্পরা ঘটিয়া সুখ দুঃখ সমুৎপাদন করিয়া থাকে (১)। জীবের কর্ম্মরাশিই ঐপ্রকার সংযোগের মূল কারণ। সকাম কর্ম্মজন্য অদৃষ্টের তীব্র প্রেরণায় লোকে পুনরায় কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়, এবং সেই সমুদয় কর্ম্মের ফল ভোগের নিমিত্ত তাহার নূতন নূতন শরীর গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। সেই কর্ম্ম ও জন্ম-প্রবাহ বিচ্ছেদের জন্য নিয়মিতভাবে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুশীলন করিতে হয়। এই নিষ্কাম কর্ম্মই বিবেকবৈরাগ্যমূলক তত্ত্বজ্ঞানের নিদানক্ষেত্র। সূত্রকার বলিয়াছেন—

"দৃষ্টানাং দৃষ্টপ্রয়োজনানাং দৃষ্টাভাবে প্রয়োগোঽভ্যুদয়ায় ॥" ১০।২।৯ ॥

বেদবিহিত কর্ম্মমাত্রই সপ্রয়োজন বা সফল দেখা গিয়াছে। বেদবিহিত কোন কর্ম্মই বিফল দৃষ্ট হয় নাই ; অতএব যে সমুদয় কর্ম্মে কোনপ্রকার ফলের উল্লেখ নাই ; যেমন নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম ; সে সমুদয় কর্ম্মেরও অবশ্যই একটা ফল থাকা আবশ্যক।

---

(১) "সুখাৎরাগঃ ॥" ৬।২।১১ সূত্র।

অর্থাৎ সুখের উদ্দেশ্যে অনুরাগ জন্মে।

"আত্মেন্দ্রিয়-মনোঽর্থসন্নিকর্ষাৎ সুখ-দুঃখে ॥" ৫।২।১৬ সূত্র।

আত্মার সহিত ইন্দ্রিয়, মন ও বিষয়ের সম্বন্ধ হয়, তাহার ফলে সুখ দুঃখের প্রাদুর্ভাব হয়।

অথচ সে সমুদয় কর্ম্মানুষ্ঠানে যখন কোনপ্রকার ফলোল্লেখ দৃষ্ট হয় না, তখন অগত্যা চিত্তশুদ্ধি সমুৎপাদন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানাখ্য অভ্যুদয় লাভই সে সমুদয় কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলরূপে গ্রহণ করিতে হয়। সেই তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবেই জীবের সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি সাধিত হয়। তাই সূত্রকার বলিয়াছেন—

"তদনারম্ভ আত্মস্থে মনসি শরীরস্থ দুঃখাভাবঃ স যোগঃ ॥" ১।২।১৭ ॥

অর্থাৎ সমুদিত বিবেক-জ্ঞানের প্রভাবে যখন সর্ব্বতোভাবে সুখানুরাগ বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তখন মন পূর্ব্বতন বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মাভিমুখে ধাবিত হয়,—আত্মচিন্তায়ই নিত্য নিরত থাকে, এবং শুভাশুভ ফলপ্রদ সমস্ত কর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিরতি লাভ করে। কর্ম্মের অভাবে তদনুরূপ অদৃষ্টেরও অভাব ঘটে; অদৃষ্টের অভাবে শরীরপীড়ক দুঃখরাশিরও আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইয়া থাকে; তাদৃশ দুঃখনিবৃত্তিই এখানে 'যোগ' শব্দে অভিহিত হইয়াছে। এইরূপ যোগ-সাধনাই মুক্তি-পথের একটী প্রশস্ত দ্বার। মুমুক্ষুগণ এই যোগ-পথেই মোক্ষরাজ্যে প্রবেশ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। একথা সূত্রকার আরও বিশদ-ভাবে বলিয়াছেন—

"তদভাবে সংযোগাভাবোঽপ্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ ॥" ৫।২।১৯ ॥

পূর্ব্বকথিত যোগ প্রভাবে পুণ্য-পাপময় সমস্ত অদৃষ্ট বিলুপ্ত হইলে, শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধও বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং সুদূর ভবিষ্যতেও শরীর-সম্বন্ধের সম্ভাবনা থাকে না; সুতরাং তখন

দুঃখের সম্ভাবনাও তিরোহিত হইয়া যায়।" এই ভাবে যে, দুঃখনিকেতন শরীর-সম্বন্ধের নিবৃত্তি, তাহারই নাম মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স।

এই নিঃশ্রেয়সই জীবের পরম মঙ্গলময় শান্তিনিকেতন। জীব এই শান্তি-সুধাস্বাদে পরিতৃপ্ত হইয়া চির বিশ্রাম লাভ করে; আর সংসারে ফিরিয়া আইসে না। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্ততে।"

ইতি—

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।